বৈশাখ

১৩৬৬

লেখক

নববর্ষ সংখ্যা

সূচীপত্র

২৮শ বর্ষ ॥ বৈশাখ, ১৮৮১ ; ১৩৬৬ ॥ ১০ম সংখ্যা

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং 'পরিচয়' কার্যালয় ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

শ্রীচরণেষু কত্তাবাবু,

আজ সকালে ধর্মতলার মোড়ে আমারই বয়সী একটি ভদ্রলোকের ছেলে আমার জুতো পালিশ করবে বলে ধরেছিল। বল্লে—মশায়, আপনার জুতো পালিস করে দেব? এক পয়সা লাগবে।

গায়ে তার ময়লা খদ্দরের জামা, পরনে কালিমাখা ধুতি। দু'হাতে পালিসের সরঞ্জাম। আবার বল্লে—অন্য জায়গায় চার পয়সা লাগবে। দেখুন আমি এক পয়সায় কত চকচকে করে দিই।

প্রথমে পাগলা ভেবেছিলুম, তারপর মনে হল দীন। কিছু পয়সা দিতে গেলুম, বল্লে—ভিক্ষে নেব না মশায়। বলে সরে গিয়ে আরেকজনকে পাকড়াও করলে।

তিনিও দেখি আমার মতো বিপদে পড়েছেন।

ছেলেটি বলছে শুনলুম—দশ জোড়া জুতো পালিস করলে আমার এক পয়সা লাভ হয়।

আমি এগিয়ে গেলুম। বল্লুম—আপনি এ কাজ করছেন কেন?

—করছি কেন? তিনটি কারণ। ডিগনিটি অব লেবার। বেকার সমস্যা। পেটের ভাত। এ-বেলা চার পয়সা, ও-বেলা চার পয়সা, সবসুদ্ধ দু-আনার ভাত আমায় দৈনিক রোজগার করতে হয়।

আমি বল্লুম—অন্য কিছু করেন না কেন? তা ছাড়া, ধুতির কোঁচা দিয়ে কালি মুছছেন কেন? একটা ন্যাকড়া রাখলেই তো হয়। আপনার কিছু গোঁ আছে নাকি?

ছেলেটি চটে গিয়ে বল্লে—জুতো পালিস করাতে হয় করান। আপনাকে আর লেকচার দিতে হবে না।

আমি ট্রামে গিয়ে উঠলুম। ট্রাম থেকে দেখলুম ছেলেটি একটি মাড়োয়ারি খদ্দের পাকড়াও করেছে এবং তার ময়লা তালি-মারা জুতো কোলে নিয়ে ধুতির কোঁচা দিয়ে পূর্ণ উদ্যমে সতেজে ঘষছে।

ট্রামে যেতে যেতে ভারি গোলে পড়লুম। ছেলেটি যা করছে তা ভুল না ঠিক? আপনি কি বলেন?

প্রণাম নেবেন। ইতি—২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩:৮

মোহনলাল

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা এই চিঠি এবং তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের পত্রখানি মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের 'দেওয়াল' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

মার্কসীয় আর্টতত্ত্ব ও লেখকের স্বাধীনতা

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

একথা সুবিদিত যে, মার্কস ও এঙ্গেলস ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন যাতে করে প্রলেটারিয়েট-শ্রেণী সমাজবিকাশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা শক্তিশালী হয়ে পুঁজিবাদী সমাজের উচ্ছেদ করতে পারে এবং নতুন এক সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়তে পারে। সমাজের রূপান্তর ঘটলে তার আর্ট ও সাহিত্যেরও রূপান্তর ঘটতে বাধ্য। সুতরাং প্রলেটারিয়েটের অভ্যুদয়ের সঙ্গে যেমন আসবে এক নতুন প্রলেটারীয় সমাজ, তেমনই আসবে এক নতুন প্রলেটারীয় সাহিত্য। মার্কসের মতে এটাই ইতিহাসের নিয়ম। তাই প্রলেটারিয়েটের প্রথম অগ্রণী বাহিনী হিসাবে মার্কস ও এঙ্গেলস একদিকে যেমন আগামী সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনই তাঁরা আগামী প্রলেটারীয় সাহিত্য সম্বন্ধেও বহু সমাজবৈজ্ঞানিক ও নন্দনতাত্ত্বিক নির্দেশ ও উপদেশ প্রলেটারীয় সমাজের ভাবী লেখকদের ও নেতাদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্লেষণ ও নির্দেশের সঙ্গে লেনিনের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি ও সোভিয়েট ইউনিয়নের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা মিলিত হয়ে গড়ে উঠেছে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ।

ইতিহাসের দ্বারা আর্ট ও সাহিত্য প্রভাবিত হয়, এই ধারণাটা অবশ্য মার্কস ও এঙ্গেলসের পূর্বেই অঙ্কুরিত হয়েছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস সাহিত্যবিচারের ঐতিহাসিক পদ্ধতিটাকে নতুন করে ঢেলে সাজলেন। সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক সম্বন্ধে এম্পিরিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে তার জায়গায় তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করলেন মেটিরিয়ালিস্ট ও ডায়ালেকটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গিকে। নন্দনতত্ত্ব তাঁদের হাতে হয়ে উঠল কর্মজগতের একটা প্রেরণা, নীতি ও প্রোগ্রাম।

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের এই কর্মসূচীগত দিকটাই পরের যুগে হয়ে দাঁড়িয়েছে সাহিত্যের পার্টি লাইন। যা মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল তারই পূর্ণতর বিকাশ ঘটেছে লেনিনের পর। কর্মসূচীগত দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেই মার্কসীয় আর্টতত্ত্ব ও আর্টনীতির কয়েকটি মূল প্রশ্নকে আমি নিজে কিভাবে বুঝেছি, সংক্ষেপে সেই সম্বন্ধেই দু-চার কথা বলব। মতামত ব্যক্তিগতই হবে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো ভ্রমাত্মক বা একপেশেও হবে। মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিক নীতির ও কর্মসূচীর প্রামাণিক ব্যাখ্যা আচার্যস্থানীয় মার্কসীয় নেতারাই দিতে পারেন। তবু নিজে যা বুঝেছি, তা যত অকিঞ্চিৎকরই হোক, উপস্থিত করা যাক।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টি দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টিকে দেখলে সব চেয়ে বড় যে সত্যটা চোখে পড়ে তা এই যে, প্রতিটি সমাজব্যবস্থাকেই নিজের অনুরূপ ও অনুকূল এক বিশেষ ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করতে হয়। এটি তার ঐতিহাসিক কর্তব্য। এই কর্তব্যকে প্রলেটারীয় সমাজই শুধু নিজের একটি বিশেষ লাইন অনুসারে পালন করছে তা নয়। অন্যান্য সমাজও নিজ নিজ লাইন অনুসারে ওই একই ঐতিহাসিক কর্তব্যকে পালন করেছে। কর্তব্য এক কিন্তু লাইন আলাদা। লাইনের পার্থক্যটা আসে ঐতিহাসিক অবস্থার নূতনত্ব থেকে। এইভাবে সমস্ত ব্যাপারটিকে দেখাই বোধ হয় সুবুদ্ধির পরিচায়ক। তবে যে সব মহাপ্রাণ ব্যক্তির নিষ্পাপ ও নির্দোষ মনের উপর সমাজতান্ত্রিক সমাজের ঐতিহাসিক অস্তিত্বটাই এ পর্যন্ত কোনও দাগ কাটতে পারল না, তাঁদের মনে এই চিন্তাধারাটা নিশ্চয়ই খুব সন্দেহের উদ্রেক করবে। যে ধরনের মহাপ্রাণতা সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যকে শুধুমাত্র সাহিত্যের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্ররূপেই দেখে, তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই বোধ হয় মার্কসীয় আর্টতত্ত্বের প্রয়োজন ছিল!

যাই হোক, এক বিশেষ সমাজের পক্ষে নিজের উপযোগী সাহিত্যসৃষ্টির আবশ্যকতা কোথা থেকে আসছে এবং কেন আসছে? মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বে এ বিষয়ে দুটি প্রধান সূত্রের সাক্ষাৎ পাই: (১) মানুষের চৈতন্যলোকে সৃষ্ট ইডিয়লজিতে বাস্তব সামাজিক জীবনের প্রতিফলন; (২) সমাজের বিকাশের বা অগ্রগতির জন্য তার ভিত্তিস্থানীয় উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে তার উপরি-কাঠামোর সামঞ্জস্যবিধান। প্রথম সূত্রটি জোর দেয় এই সত্যটির উপর যে,

সমাজের অর্থনৈতিক জীবনপ্রবাহই নিয়ন্ত্রিত করে দেয় তার রাজনৈতিক জীবন-প্রবাহ ও ভাবগত জীবনপ্রবাহ। দ্বিতীয় সূত্রটি জোর দেয় এই সত্যের উপর যে, সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার ও অর্থনৈতিক জীবনের সচলতার বা অগ্রগতির উপর রাজনীতি ও ইডিয়লজি একটা প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং প্রতিটি সমাজই এই চেষ্টা করে যাতে উৎপাদনব্যবস্থার ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে ইডিয়লজির একটি সামঞ্জস্যবিধান সংঘটিত হয়।

এই দুই সূত্র অনুসারে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের পূর্বে ঐতিহাসিক যুগে যে-সকল সমাজব্যবস্থা আবির্ভূত হয়েছে তাদের প্রত্যেকটির ইডিয়লজি এক বিশেষ শ্রেণীচরিত্র লাভ করে বিকশিত হয়েছে। ইডিয়লজির অন্যতম শাখা হিসাবে আর্ট ও সাহিত্যও এই শ্রেণীচরিত্র থেকে মুক্তি পায়নি। অন্যান্য ইডিয়লজির মতো আর্টও মানব সমাজ ও মানবজীবন সম্বন্ধে একটা সামান্যীকৃত চেতনা বা বোধি। কিন্তু বহু বিশেষত্ব আছে আর্টের। আর্টকে পণ্ডিতরা বলেন একটা aesthetic cognition বা কান্ত বোধি। সৌন্দর্যসৃষ্টির বা রসসৃষ্টির দিক থেকে আর্টের বিশেষত্ব, স্বকীয়তা বা মূল্যকে মার্কসবাদীরা অস্বীকার করেন না। তাঁরা আর্টের শুধুমাত্র একটা সমাজবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই দিয়ে থাকেন, এই ধারণাটা মার্কসবাদ সম্বন্ধে প্রচলিত অনেক ধারণার মতোই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই যে, তা ইমেজের মাধ্যমে বিশেষের সহিত সামান্যের এমন সমন্বয়সাধন করে যার ফলে দেশকালের সীমানার দ্বারা চিহ্নিত যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজের মানবজীবনের একটা সামগ্রিক রূপ ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়। এই সঞ্চারণ প্রক্রিয়াটি রসসৃষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় বলেই যে আর্টের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং সমাজবিকাশে আর্টের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকাটা অপ্রমাণিত হল, এটা কোনও যুক্তিই নয়। যাঁরা এইভাবে চিন্তা করেন তাঁদের কাছে যে-বিশেষত্বের বলে আর্ট অন্যান্য ইডিয়লজি থেকে পৃথক সেটাই আর্টের সব, কিন্তু যে সকল দিক থেকে আর্ট অন্যান্য ইডিয়লজির সহিত সমজাতীয় সেগুলি আর্টবহির্ভূত। আর্ট সম্বন্ধে এই আংশিক দৃষ্টিকে গ্রহণ করতে না পারলেই শুনতে হয় যে, আর্টের সঙ্গে রাজনীতিকে ও অর্থনীতিকে এক করে ফেলে আর্টের ধর্মনাশ করা হল। এক করে ফেলা নিশ্চয়ই উচিত নয়। কিন্তু অবিকল রসসৃষ্টির ও রসাস্বাদনের মাধ্যমেই যে আর্ট প্রচলিত সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচণ্ড অনুরাগ-বিরাগ ও শক্তিশালী জনমত সৃষ্টি করতে পারে, আর্টের এই দিকটাকে মার্কসবাদের

সমালোচকরা দুর্ভাগ্যক্রমে আদৌ মানতে চান না। আর্টের এই কিছুটা প্রচ্ছন্ন ও কিছুটা প্রকাশ্য, কিছুটা প্রত্যক্ষ ও কিছুটা পরোক্ষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকাটা আছে বলেই সমাজের অধিপতিরা আর্ট সম্বন্ধে কোনওদিন উদাসীন থাকেননি এবং থাকতে পারেনও না।

আর্টের বিশেষত্বটা অবশ্য অবহেলার জিনিস নয়। অন্যান্য ইডিয়লজি বাস্তব জীবনকে নানারূপ abstract concept বা অমূর্ত ধারণার মাধ্যমে চৈতন্যলোকে প্রতিফলিত করে। সাহিত্যে ও আর্টে জীবনের যে প্রতিফলন সংঘটিত হয় তা পণ্ডিতদের মতে মূর্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। জীবন সম্বন্ধে অমূর্ত ধারণাবলী নয়, গোটা জীবনটাকেই আমরা আর্টের মধ্যে পাই। এঙ্গেলসের ভাষায় সাহিত্য হল "reproduction of life" বা জীবনের পুনঃসৃষ্টি। বিশেষ ঘটনা, বিশেষ বিশেষ মানুষের চরিত্র ও জীবন, তার বেদনা, দুঃখ ও শোক, তার আনন্দ ও গৌরব, তার কীর্তি ও অকীর্তি, জয় ও পরাজয় প্রভৃতির মূর্ত ও ব্যক্তিত্বধর্মী রূপ একদিক যেমন আমরা পাই বাস্তব জীবনে, অন্যদিকে তেমনই পাই আর্টের জগতে। এই বিশেষত্বের বলে আর্ট এমন একটা মাধ্যম যার ভিতর দিয়ে আর্টিস্ট সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে কিছুটা বাধা পান। এই কারণে দেখা যায় যে দার্শনিকরা ও নীতিবেত্তারা নিজেদের রচনায় যতটা সহজে ও যে পরিমাণে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতামত ব্যক্ত করে এসেছেন, আর্টিস্টরা ও সাহিত্যিকরা নিজেদের সৃষ্টির মাধ্যমে ততটা করেননি ও করতে পারেননি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আর্টিস্টকে সামাজিক জীবনের একজন নিরপেক্ষ দর্শক মনে করার কোনও কারণ নেই। আর্টিস্টের চৈতন্য এমন একটি নিষ্ক্রিয় দর্পণমাত্র নয় যার উপর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বাস্তব জীবনের সত্যনিষ্ঠ প্রতিফলন হয়। শুধুমাত্র বিশেষকে নিয়েই আর্টিস্টের কারবার নয়। সকল আর্টই নিজস্ব উপায়ে বিশেষের সামান্যীকরণ সাধিত করে। এই সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার ভিতরেই দেখা যায় আর্টিস্টের নিজ চৈতন্যের সক্রিয় ভূমিকা। এর ভিতর দিয়েই ফুটে ওঠে আর্টিস্টের শ্রেণীগত পক্ষপাত। বিশেষ বিশেষ সমাজের ও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোক হিসাবেই আর্টিস্টরা আর্ট সৃষ্টি করে এসেছেন। যখন যে সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন আর্টিস্টরা ও সাহিত্যিকরা মোটের উপর জীবন সম্বন্ধে সেই শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেই আর্ট সৃষ্টি করেছেন। তাই পূর্ব পূর্ব যুগের সাহিত্যে ও অন্যান্য ইডিয়লজিতে দেখি তদানীন্তন সামাজিক

জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বগুলির এমন আবৃত ও উল্টোপাল্টা প্রতিফলন যে, কেবলমাত্র কোনও অতীত যুগের চৈতন্যলোকের সাক্ষ্যর উপর নির্ভর করে সেই যুগের বাস্তব জীবন সম্বন্ধে কোনও সত্য ধারণায় উপনীত হওয়া খুবই দুরূহ, এমন কি, প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। মার্কস তাই সাবধান করে দিয়েছেন, আমরা যেমন কোনও ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে কি ভাবে তা দিয়ে তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারি না, তেমনই কোনও সমাজ নিজের সম্বন্ধে কি ভাবে তা দিয়ে সেই সমাজের স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারি না।

গোষ্ঠীসমাজের তিরোধানের পর হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বাস করে এসেছে। যে সকল মেহনতী মানুষের শ্রম ও সংগ্রাম মূলতঃ ইতিহাস সৃষ্টি করে এসেছে, তাদের জীবনসত্য শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অতীত সাহিত্যে কদাচিৎ একটুআধটু প্রতিফলিত হয়েছে। এ নিয়ে অতীত সাহিত্যের বা অতীত সমাজের সঙ্গে কলহ করতে মার্কসবাদীরা আদৌ চান না। স্বয়ং এঙ্গেলসই একথা বলেছেন যে, অতীত যুগের দাসপ্রথা বিনা আধুনিক সমাজতন্ত্রের উদ্ভব অসম্ভব। জানি না আমাদের অ-মার্কসবাদী বন্ধুরা এঙ্গেলসের এই উক্তিটিকে তাঁর মানবিকতার পরিচায়ক বলে মনে করেন কিংবা তাঁর demonic humour -এর অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসাবেই দেখেন। কিন্তু যাঁরা অহরহ বিশুদ্ধ সাহিত্যের ও মানবতার নামে মার্কসবাদকে অভিশাপ দেন তাঁদের অন্তত এই একটা কথা বলতে ইচ্ছা হয় যে. কোটি কোটি ও পরাধ পরার্ধ মেহনতী মানুষের অশ্রু, স্বেদ ও রক্ত দিয়ে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ইতিহাস যে পথ রচনা করেছে, মেহনতী মানুষের পক্ষ থেকে মার্কসবাদীরাই তাকে মানুষের জয়যাত্রার পথ বলে অভিনন্দন জানিয়ে থাকেন। শ্রেণীসত্য যতই আংশিক, যতই আপেক্ষিক ও যতই ইতিহাসনিয়ন্ত্রিত হোক না কেন, তবু তা মানবসত্য, এই কথাই মার্কসবাদীরা বলে থাকেন। একইভাবে বলা চলে যে অতীত যুগের সাহিত্যকে শ্রেণীসাহিত্য বলে অভিহিত করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদীরা তাকে যে মানবিক সাহিত্যের পর্যায় থেকে বহিষ্কৃত করে দিচ্ছেন, এই অদ্ভুত ধারণার কোনও ভিত্তি নেই। বিশুদ্ধ সাহিত্যবাদীরা প্রলেটারিয়েটের আধিপত্যের যুগে আসামাত্র শ্রেণী-সাহিত্যকে একেবারে বাতিল করে দেন। কিন্তু তার পূর্বেকার শ্রেণীসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের মন ঋষিজনের মনের মতো নির্মল ও নির্বিকার। এইখানটাতেই মার্কসবাদীরা আপত্তি তোলেন।

আর্ট ও সাহিত্য ইতিহাসের দ্বারা সৃষ্ট আবার ইতিহাসের বিকাশের উপর

তারা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে, এই সত্যটাকেই মার্কসবাদ তুলে ধরে। টেকনলজির বিকাশের সঙ্গে নতুন নতুন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বদলে গেছে উৎপাদন পদ্ধতি, মেটিরিয়াল উৎপাদনের অবস্থা এবং তৎসংক্রান্ত বাস্তব জীবনধারা। মেহনতী মানুষ শোষিত হয়ে এসেছে হয় একভাবে নয়তো অন্যভাবে। এক শোষক শ্রেণীর বদলে অন্য শোষক শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একদিকে টেকনলজির উন্নতি এবং অন্যদিকে সামাজিক-ঐতিহাসিক জীবনপ্রবাহের নতুন অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুইই সমাজের চৈতন্যলোকের উৎপাদনগুলিকে মধ্যে মধ্যে ঢেলে সেজেছে। ইডিয়লজিকে এই ঢেলে-সাজার প্রক্রিয়াটি ইতিহাসের অগ্রগতির পক্ষে আবশ্যক ছিল। ইডিয়লজির জগতে নতুন সমাজের অবস্থাগুলি জ্ঞাত, বিধৃত, আস্বাদিত ও অনুমোদিত না হলে নতুন সমাজব্যবস্থাটি চলতে পারে না, উৎপাদন শক্তির বিকাশ ঘটে না এবং ইতিহাসের অগ্রগতি সম্ভব হয় না। এটা পূর্ব যুগে যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনই সত্য। মার্কসবাদীরা যখন সাহিত্যের উদ্দেশ্যমূলকতার কথা বলেন, তখন তাঁরা সাহিত্যের এই ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যমূলকতার কথাই উল্লেখ করেন। সাহিত্যের এই ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যপ্রবণতা আর্টিস্ট ব্যক্তিদের শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণীগত পক্ষপাতের দ্বারাই সাধিত হয়েছে, এই হল মার্কসবাদীদের বক্তব্য।

তাই বলে একথা মনে করার কোনও হেতু নেই যে, আর্ট সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র প্রচারমূলক বা প্রাগমাটিক। ব্যক্তির ও ঘটনার সৎ ও সত্যনিষ্ঠ চিত্রণই আর্ট, এটাই মার্কসবাদী সাহিত্যবিচারের মূলসূত্র। এই মূলসূত্র ধরেই মার্কসবাদীরা ধাপে ধাপে গড়ে তুলেছেন আর্টের ক্ষেত্রে রিয়ালিজম বা বাস্তব-বাদের তত্ত্ব। রিয়ালিজমের মানদণ্ড দিয়েই মার্কসবাদীরা অতীত ও বর্তমান, সকল সাহিত্যের গুণবিচার ও উৎকর্ষবিচার করেন। বাস্তব সামাজিক সত্যের যথাযথ প্রতিফলন সাহিত্যে হয়েছে কি না, বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকার যথাযথ দেশগত ও কালগত চিত্রণ সাহিত্যে পাচ্ছি কি না, বিভিন্ন ব্যক্তিচরিত্রগুলি নিজ নিজ শ্রেণীর টিপিক্যাল বা প্রতিভূস্থানীয় চরিত্র কি না, চরিত্রগুলির জীবন্ত ব্যক্তিস্বায়ন সম্পন্ন হয়েছে কিনা এবং রিয়ালিটির সমগ্র প্রতিচিত্রায়ণটি যথার্থ শিল্পগত সার্থকতার সহিত সামান্যীকৃত হয়েছে কিনা, এই সকল বিচারের দ্বারাই সাহিত্যসৃষ্টির উৎকর্ষ মার্কসবাদীদের দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সমগ্র বিচারপদ্ধতিটিতে শ্রেণীগত পক্ষপাত ও উদ্দেশ্যমূলকতার স্থান কোথায়? তার উত্তর এই যে, পক্ষপাত ও উদ্দেশ্যমূলকতা সেখানে রিয়ালিটির উদ্‌ঘাটনে ও

যথাযথ প্রতিফলনে সহায়ক হয়েছে, সেখানে তা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেছে এবং সেই সাহিত্য ইতিহাসের অগ্রগতির স্বপক্ষে কাজ করেছে। অন্যদিকে পক্ষপাত ও উদ্দেশ্যপ্রবণতা যেখানে হয়েছে রিয়ালিটির যথাযথ প্রতিফলনের প্রতিবন্ধক, সেখানে সৃষ্ট হয়েছে অসার্থক ও প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য। ইতিহাসের প্রতি পক্ষপাতটাই আসল জিনিস। নতুন ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি পক্ষপাত সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা প্রধান সৃজনশীল শক্তি। শ্রেণীগত পক্ষপাত ইতিহাসের প্রতি পক্ষপাতের রূপ ধরেই এবং ইতিহাসের অগ্রগতির স্বপক্ষে থেকেই রিয়ালিস্ট সাহিত্য অথবা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে, নচেৎ নয়।

সাহিত্যে শ্রেণীগত পক্ষপাত ও উদ্দেশ্যমূলকতার ভূমিকা সম্বন্ধে প্রথম প্রামাণিক ব্যাখ্যা পাই মিন্না কাউটস্কিকে ও মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা এঙ্গেলসের দুটি চিঠিতে। চিঠি দুটির মর্মার্থ নিয়ে মতভেদ আছে। এঙ্গেলসের বক্তব্য কিন্তু সুস্পষ্ট। মিন্না কাউটস্কিকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস বলছেন যে, ঈসকাইলাস থেকে আরম্ভ করে আধুনিক নরওয়েজীয় উপন্যাস পর্যন্ত সকল উৎকৃষ্ট সাহিত্যই উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য। কিন্তু এঙ্গেলস পরিষ্কার-ভাবে বলেছেন যে সাহিত্যে সাহিত্যিকের নিজ উদ্দেশ্য যতটা গোপন থাকে ততই তা আর্টসৃষ্টির দিক থেকে ভাল। সাহিত্যের মধ্যে ঘটনাবলী ও চরিত্র এমনভাবে চিত্রিত হবে যে তার ভিতর দিয়ে বাস্তব জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য আপনা থেকেই ফুটে বেরুবে। রিয়ালিটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্বন্ধে লেখকের রচনায় তাঁর নিজস্ব মতামতের প্রবেশ এঙ্গেলসের মতে আর্টের দিকে ক্ষতিকর। মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস ওই একই কথা আরও জোরের সহিত বলেছেন। উপরন্তু তিনি বালজাকের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে দেখাচ্ছেন যে, নতুন ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি মহৎ শিল্পীর পক্ষপাত তাঁর নিজস্ব শ্রেণীসহানুভূতির বিপক্ষতাকে অতিক্রম করেও রিয়ালিস্ট সাহিত্যে প্রকাশিত হতে পারে। সুতরাং এই দুইটি বিখ্যাত চিঠিতে এঙ্গেলসের বক্তব্যকে এইভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, আর্টের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং রিয়ালিটি সম্বন্ধে লেখকের নিজস্ব ইডিয়লজি ও মতামত, এই দুয়ের aesthetic dissociation বা শিল্পগত বিচ্ছেদ সার্থক আর্টসৃষ্টির একটা সাধারণ নিয়ম। দ্বিতীয়তঃ, রিয়ালিস্ট সাহিত্যে নতুন ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি পক্ষপাত সাহিত্যিকের নিজস্ব শ্রেণীসহানুভূতির বিরুদ্ধে গিয়েও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এই সম্ভাবনা বিদ্যমান।

মার্কসীয় আর্টতত্ত্বের এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের সাহায্যে চিন্তা করা যাক, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা নিজ নিজ উৎপাদন-পদ্ধতির উপযোগী সাহিত্যসৃষ্টির ঐতিহাসিক কর্তব্য কিভাবে সম্পন্ন করে এসেছে। এই প্রক্রিয়াটা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে বুঝতে সুবিধা হবে নতুন প্রলেটারীয় সমাজ ওই একই ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে কি কি প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে এবং কিভাবে এইগুলির সমাধান সম্ভব।

সাহিত্যসৃষ্টির জন্য প্রতি সমাজকেই নিজের উপযোগী এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও লেখক সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে হয়। আমাদের অ-মার্কসবাদী বন্ধুরা সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে একজন তথাকথিত নিরপেক্ষ ব্যক্তিমানবের ভূমিকাটাকে এতই বড় করে দেখেন যে এ-ব্যাপারে অন্য কোনও সমস্যাই তাঁদের চোখে পড়ে না। কিন্তু যখনই সাহিত্যকে আমরা সমাজের মনোজাগতিক উৎপাদনের একটি শাখা হিসাবে দেখি, তখন প্রথম যে সমস্যাটা চোখে পড়ে তা হল সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও লেখক সম্প্রদায় সৃষ্টির সমস্যা। ঐতিহাসিক যুগে প্রতিটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজ নিজ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ও নিজের বিশিষ্ট ভাবগত মনোগঠন পদ্ধতির দ্বারা নিজের উপযুক্ত বুদ্ধি-জীবী সম্প্রদায় ও লেখক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে। যে শ্রমবিভাগের ফলে মানবসমাজে শ্রেণী সৃষ্ট হয়েছে, তারই এক প্রধান রূপ হল কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রম, উভয়ের মধ্যে বিভেদ। এই প্রকার শ্রমবিভাগের ফলে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সৃষ্ট হয় তাঁরা মেহনতী মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কোনও না কোনও শোষক-শ্রেণীর প্রতিই তাঁদের থাকে নাড়ির টান বা মনের টান। যখন এক শোষক-শ্রেণীর আধিপত্যে ভাঙন ধরেছে এবং অন্য শোষক-শ্রেণীর আধিপত্য শুরু হয়েছে, তখন বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ পুরাতন শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও নতুন শ্রেণীর অভ্যুদয়কে বুঝতে ও স্বীকার করতে পেরেছে। বালজাকের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এঙ্গেলস যা বলতে চেয়েছিলেন, আমার বিশ্বাস, এই রকম মধ্যবর্তীকালীন অবস্থাতেই তা বিশেষরূপে ঘটা সম্ভব। কিন্তু নিজের বিশিষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির জন্য প্রতিটি সমাজই যে নিজের ভাবাদর্শে শিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করেছে, এ বিষয়ে মোটামুটি নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে।

কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির জন্য সাহিত্যিক ব্যক্তিপ্রতিভার আবির্ভাবও আবশ্যক। বলা বাহুল্য, প্রতিভা কথাটিকে কোনও অলৌকিক অর্থে ব্যবহার করছি না।

সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকাকে অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না। পূর্বতন সমাজ উপযুক্ত সাহিত্যিক সৃষ্টি করেছে কি করে? এটিও একটি সামাজিক প্রক্রিয়া কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি যে নিয়মে কাজ করে তাকে বলা যেতে পারে প্রতিযোগিতার ও আকস্মিকতার নিয়ম। অর্থের প্ররোচনা, পুরস্কার প্রদান, সামাজিক সম্মান ও রাজসম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি এর একটা দিক। সাহিত্যের ঐতিহ্যগত উপাদান নিয়ে, আঙ্গিক ও স্টাইল নিয়ে, বাস্তব জীবনের কনটেন্টকে পর্যবেক্ষণ করার ও আত্মস্থ করার ব্যাপার নিয়ে, বিভিন্ন সাহিত্যিকদের মধ্যে অবিরাম পরীক্ষানিরীক্ষা ও প্রতিযোগিতা এর অন্য একটা দিক। জনমত, বুদ্ধিজীবীদের গুণগ্রাহিতা, সাহিত্যিকদের পারস্পরিক স্তুতিনিন্দা এবং রাজশক্তি কর্তৃক সমাদর বা অনাদর, সামাজিক রুচিনির্ণয়ের ও সাহিত্যের মাননির্ণয়ের এই সকল পদ্ধতি ব্যাপারটির তৃতীয় একটা দিক। সমগ্র প্রক্রিয়াটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অল্পবিস্তর দীর্ঘায়িত। মূলতঃ এটি সামাজিক প্রক্রিয়া। এর ভিতর দিয়েই তথাকথিত আকস্মিকভাবে পূর্বতন সমাজে উপযুক্ত সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে।

অন্যান্য সমাজকেও মতো প্রলেটারীয় সমাজেও সাহিত্যসৃষ্টির ও সাহিত্যিক-সৃষ্টির ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পন্ন করতে হচ্ছে। এই ব্যাপারে অন্যান্য সমাজ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল এবং যে পদ্ধতিতে সমস্যাগুলির সমাধান করেছিল, প্রলেটারীয় সমাজের সমস্যার ও সমাধানপদ্ধতির সঙ্গে তাদের বহু সাদৃশ্য আছে আবার বহু অসাদৃশ্যও আছে।

সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের সব চেয়ে বড় যে বিশেষত্বের কথা মার্কসবাদীরা উল্লেখ করেন তা এই যে, এই সাহিত্য যে বাস্তব জীবনের প্রতিফলন করে তার প্রকৃতি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব পূর্ব পূর্ব যুগের বাস্তব জীবনের তুলনায় একেবারে আলাদা। মেহনতী মানুষ যুগযুগান্তব্যাপী শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে যে সমাজ গড়ে তুলছে তা এমন একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ যেখানে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক মূলতঃ বন্ধুভাবাপন্ন। সামাজিক দ্বন্দ্ব বা বিরোধ এই সমাজে আছে বটে কিন্তু সেগুলি শত্রুভাবাপন্ন নয়। শত্রুভাবাপন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিফলনচিত্র ও বন্ধুভাবাপন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিফলনচিত্র এক হতে পারে না। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য একটা নতুন ধরনের সাহিত্য। মূলতঃ এই সাহিত্যে শ্রেণীবিরোধের পরিবর্তে নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বই এবং ভালমন্দ বা ঠিকভুলের দ্বন্দ্বই প্রতিফলিত

হয়। দ্বিতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রলেটারীয় মানুষের সৃজনশীলতাকে এরূপ অবাধ সুবিধা দেয় ও এরূপ দ্রুতভাবে বর্ধিত করে যে এই সমাজে মানুষের জীবনে ও ব্যক্তিচরিত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে অত্যন্ত ত্বরিত গতিতে। এই সমাজের প্রধান ঐতিহাসিক বিশেষত্ব এই যে, ব্যক্তি এখানে সমাজের সহিত পূর্ণভাবে এক।ভূত হয়। এই সমাজে সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টা সমন্বিত হয় সচেতন ও সুশৃংখল সংগঠনপদ্ধতির দ্বারা।

এই দুই কারণে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য এমন এক বিশেষ ধরনের সাহিত্য যা সৃষ্টি করতে গেলে লেখকদের মনে প্রলেটারিয়েট শ্রেণী সম্বন্ধে ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে একটি পার্টিজান মনোভাব থাকা একান্ত আবশ্যক। পার্টিজান মনোভাবাপন্ন লেখক সম্প্রদায়ের দ্বারা পার্টি লাইন অনুসারেই প্রলেটারীয় সাহিত্য বিকশিত হতে পারে। এটাই মার্কসীয় আর্টতত্ত্বে লেনিনের নতুন অবদান।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে সাহিত্যিক সৃষ্টির জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূলগত ষ্ট্র্যাটেজি হল মেহনতী মানুষের মধ্য থেকে যত শীঘ্র সম্ভব এক বুদ্ধিজীবী ও লেখক সম্প্রদায় গড়ে তোলা এবং মধ্যবর্তীকালীন অবস্থায় পূর্বকালীন সমাজের লেখকদের মনে ভাবগত পরিবর্তন ঘটিয়ে তাঁদের দিয়ে প্রলেটারীয় সাহিত্য রচনা করানো। সাহিত্যে পার্টি লাইন বলতে যা বোঝায়, যতদূর বুঝতে পেরেছি, মোটামুটি তার দুই উদ্দেশ্য: (১) সাহিত্যিকদের মনে প্রলেটারিয়েট শ্রেণী ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে একটি পার্টিজান মনোভাব এবং তাদের জয়লাভ সম্বন্ধে একটি সুদৃঢ় আস্থা, গর্ববোধ ও আনন্দবোধ জাগানো; (২) রিয়ালিস্ট সাহিত্যের সর্বকালীন সাধারণ নিয়মগুলিকে যথোচিত পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের নতুন ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রয়োগ করা। অ-মার্কসবাদী বন্ধুদের মতে পার্টি লাইনের এই দুই উদ্দেশ্যই অবৈধ, দুই দিক থেকেই পার্টি লাইন লেখকের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে সাহিত্যের বিকাশকে ব্যাহত করতে বাধ্য। কথাটা ঠিক কি?

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই এবং কোনও মার্কসবাদী কোনওদিন তা অস্বীকার করতে চান না যে, সমাজতান্ত্রিক দেশে সাহিত্যের পার্টি লাইন বুর্জোয়া ভাবাপন্ন লেখকদের তথাকথিত অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নানা দিক থেকে খর্ব করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সম্পূর্ণভাবে অপহরণ করে। ওটাই তার ঘোষিত উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যই যদি তার না থাকবে তাহলে সাহিত্যে পার্টি লাইন নামে একটা লাইন তৈরিই বা হবে কেন? সাহিত্যে পার্টি লাইনটা কি শুধু sound and fury signifying nothing? সুতরাং পার্টি লাইনের দ্বারা লেখকদের

অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে, এই উক্তির দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। যাঁরা ভাবেন যে লেখকের স্বাধীনতা, লেখকের স্বাধীনতা, লেখকের স্বাধীনতা, এই স্লোগানটিকে মন্ত্রের মতো জপ করলেই সমাজতন্ত্রে লেখকের স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে ঠিকমতো উপস্থিত করা হল তাঁরা ভ্রান্ত।

অতীতে সকল সমাজব্যবস্থাই পুরাতন ইডিয়লজির দ্বারা উদ্বুদ্ধ লেখকদের স্বাধীনতাকে নানাভাবে সংকুচিত করেছে এবং স্বকীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ লেখকদের বহুপ্রকার সুবিধা ও প্ররোচনা দিয়ে উৎসাহিত করেছে। সমাজের ও সাহিত্যের অগ্রগতির জন্য তার প্রয়োজন ছিল। ওই সকল সমাজের পদ্ধতিটা ছিল পরোক্ষ, সমাজতন্ত্রের পদ্ধতিটা প্রত্যক্ষ। পদ্ধতির পার্থক্যটা গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই কিন্তু অতীত সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ, উভয়ের ঐতিহাসিক কর্তব্য একই। মেনে নেওয়া যাক যে, লেখকের স্বাধীনতা দরকার প্রথমতঃ তাঁর কর্মক্ষেত্রের প্রসারসাধন ও তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনের জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যের অগ্রগতির জন্য। বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি কোনওক্রমেই নিজেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈপ্লবিক ঐতিহাসিক অবস্থার সঙ্গে মেলাতে পারবেন না, ক্রমশই তিনি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন, তাঁর কর্মক্ষেত্র ক্রমশই সংকুচিত হয়ে পড়বে, তাঁর মনে চিরস্থায়ী বাসা বাধবে তিক্ততা, অবিশ্বাস ও হতাশা এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হওয়ার পরিবর্তে অবশেষে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। কাহিনীটা সুবিদিত, তাকে বাড়িয়ে কাজ নেই। একথা অবশ্য ঠিক যে ইডিয়লজি যাই হোক না কেন, কার্যতঃ যিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজের শত্রুতাচরণ না করেন তাঁকে এই সমাজের সেবা করার সকল সুযোগ দেওয়া উচিত। এটাও মানা যেতে পারে যে, ভাবগত আত্মশুদ্ধিটাই আসল শুদ্ধি, বাইরের থেকে হুকুমজারি করে এ জিনিসটা হয় না এবং হওয়া উচিত নয়। এই সকল নীতি সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃত ও গৃহীত। সময়বিশেষে অসহনশীলতার দরুন এ ব্যাপারে কিছু কিছু অবিচার ও অঘটন যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ঘটেনি এমন নয়। কিন্তু সহনশীলতার আবশ্যকতাকে স্বীকার করে নিলেও এটা আদৌ প্রমাণিত হয় না যে, বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রতি আসক্তি সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতার সহায়ক। ঠিক তার বিপরীতটাই সত্য। শুধুমাত্র সহনশীলতার দ্বারা কোনও সমাজ কোনও ব্যক্তিকে প্রকৃত স্বাধীনতা দেয় না বা দিতে পারে না। সমাজ ব্যক্তিকে নিজের অন্তরে গ্রহণ করেই তাকে স্বাধীনতা দিতে পারে। প্রলেটারিয়েটের ইডিয়লজি গ্রহণ

করে এবং প্রলেটারিয়েট শ্রেণী ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে পার্টিজান মনোভাব অর্জন করেই লেখক সমাজতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে একীভূত হতে পারে, তার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত ও তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে। প্রলেটারিয়েটের প্রতি পার্টিজান মনোভাবের দ্বারাই ব্যক্তি সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে, এই লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ সমাজবিজ্ঞানসম্মত।

এঙ্গেলস অবশ্যই একথা বলেছিলেন যে, বালজাকের মতো যথার্থ শিল্পী নিজের শ্রেণীসহানুভূতির বিপক্ষে গিয়েও সার্থক রিয়ালিস্ট সাহিত্য রচনা করতে পারেন। মার্কসবাদের প্রত্যন্তবাসী পণ্ডিতদের অনেকে এঙ্গেলসের এই সূত্রটিকে সাহিত্য বিকাশের একটি সাধারণ এঙ্গেলীয় নিয়ম বলে মনে করেন এবং এই নিয়মটির সহিত লেনিনীয় পার্টিজান সাহিত্য তত্ত্বের তথাকথিত বিরোধিতাকে তাঁরা তুলে ধরেন। আর্ট ও আর্টিস্টের ইডিয়লজি সম্পর্কে এঙ্গেলস যে সাধারণ নিয়মের কথা বলেছিলেন তা হল উভয়ের aesthetic dissociation-এর নিয়ম। এই নিয়মকে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পূর্ণভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করি। কিন্তু বালজাক প্রসঙ্গে এঙ্গেলস কি কোনও সাধারণ নিয়ম জারি করেছিলেন? তা আদৌ সত্য নয়। নিজের ইডিয়লজির বিরুদ্ধে গিয়েও শিল্পী রিয়ালিস্ট সাহিত্য রচনা করতে পারেন, এঙ্গেলস এই সম্ভাবনার কথাই বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের স্বকল্পিত এঙ্গেলসবাদীরা এই সম্ভাবনাকে নিশ্চয়তায় পরিণত করে ফেলেছেন! বিংশ শতাব্দীর প্রচণ্ড শ্রেণী-সংগ্রামের অবস্থায় এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈপ্লবিক ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রলেটারিয়েটের প্রতি ও সমাজতন্ত্রের প্রতি পার্টিজান মনোভাব বিনা লেখকের পক্ষে রিয়ালিস্ট সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব, এই লেনিনীয় তত্ত্বের স্বপক্ষে বহু যুক্তি আছে। গত চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস এই তত্ত্বের স্বপক্ষে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করেছে তাকে অবহেলা করা মূঢ়তা।

একথা ঠিক যে লেনিনীয় পার্টিজান সাহিত্য-তত্ত্বের গোঁড়া ব্যাখ্যাকারগণ এই তত্ত্বটিকে নির্বিচারে অতীত সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে মধ্যে মধ্যে অনেক ভুল করেছেন। বুর্জোয়া যুগের সাহিত্যে ও তারও আগেকার সাহিত্যে আমরা পেয়েছি দরিদ্রনারায়ণের বহু কল্পনা, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও অপমানিত মানব-মানবীর বহু অবিস্মরণীয় চিত্র। এই সকল সাহিত্য প্রগতির পথ কেটেছে, সাহিত্যের ও প্রগতির পথ আবার সমাজেরও প্রগতির পথ। এইগুলি প্রলেটারিয়েটের কাছে আদরের জিনিস। কিন্তু বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া

প্রগতিশীলতার সংকীর্ণতাকে ও সীমাবদ্ধতাকে ভুলে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ধূলিলুণ্ঠিতা মেরী মাদলাঁর চিত্র তাঁদের কাছে রসসৃষ্টির চিরন্তন উপাদান। কিন্তু মেরী মাদলাঁকে আজ যদি দেখা যায় কালেকটিভ ফার্মের ম্যানেজার বা এমন কি একজন রক্তচক্ষু পার্টি ব্যুরোক্রাট রূপে, প্রলেটারিয়েটের চোখে ছবিটা নিঃসংশয়েই মানবতার অগ্রগতির ও জয়েরই সূচক। কিন্তু অতি বড় বুর্জোয়া শিল্পীও ছবিটাকে মানবের প্রতি ইতিহাসের অভিশাপ ও পরিহাস ব্যতীত আর কিছুই মনে করবেন না। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সীমানার মধ্যে বিজয়ী প্রলেটারিয়েটকে ও তার নেতৃত্বে মানব-সভ্যতার অগ্রগতিকে বোঝা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া ভাবাদর্শে উদ্‌বুদ্ধ কোনও সাহিত্যিককে অবাধে সাহিত্য সৃষ্টি করতে দিলেই কি অমনই তিনি বালজাকীয় কায়দায় ওই সমাজের বাস্তব শিল্পায়ণের কাজে লেগে যাবেন? তা ভাবতে ইচ্ছা হয় বটে কিন্তু ওটা মোটের উপর আমাদের পেটিবুর্জোয়া মনের একটা বিভ্রান্তি। কোথাও কোথাও হয়তো তা সম্ভব হতে পারে কিন্তু মোটের উপর সাক্ষ্য প্রমাণ এর বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। যা অধিকতর সম্ভব তা এই যে, বুর্জোয়া সাহিত্যিক বেছে বেছে সমাজতান্ত্রিক সমাজের নঞর্থক ও পশ্চাৎপদ উপাদানগুলিকেই খাঁটি বাস্তব সত্য বলে উপস্থিত করবেন এবং এইগুলিকে সাজিয়ে তিনি শিল্পের এমন এক জাল বুনবেন যা সমাজতান্ত্রিক সমাজের নতুন মানুষ ও নতুন সত্যগুলিকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রাখবে। তাঁর সাহিত্য হবে প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রবিরোধী রাজনীতির ও অর্থনীতির অগ্রদূত।

এটাই আমরা লক্ষ্য করলাম সাম্প্রতিক কয়েক বৎসরে। পাস্তেরনাকের কথাই ধরা যাক। সন্দেহ নেই যে তিনি বিরাট কবি-প্রতিভার অধিকারী। প্রকৃতির সহিত মানবের মৌষ্টিক কমিউনিয়নের ধারাটা কাব্যজগতে বোধ হয় পাস্তেরনাকে এসেই শেষ হয়ে গেল। লিখনকলা সম্বন্ধে পাস্তেরনাকের কাছে প্রলেটারীয় লেখকের অনেক কিছু শেখার আছে। কিন্তু তাঁর Dr. Zhivago কি রিয়ালিস্ট সাহিত্য, এমন কি একটা মাঝারি ধরনেরও রিয়ালিস্ট সাহিত্য? একথা বলতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু কিছুতেই তা বলা যায় না। বইটিতে পাস্তেরনাকের মোটমাট বক্তব্যটা কি? যীশু খ্রীস্ট মানবের ব্যক্তিত্বকে একটা নতুন ও অপূর্ব মর্যাদা দিয়ে মানুষকে পূর্ব যুগের ট্রাইব্যাল সমাজের শাসন থেকে মুক্ত করলেন। মানব-মুক্তির সেই যে দীপশিখা

যীশু ও তাঁর সেবিকা মেরী মাদলাঁ জ্বালিয়ে গেলেন, দু'হাজার বছর পরে তা নিভে গেল সতরো সালের অক্টোবর বিপ্লবের রূঢ় আঘাতে এবং মানুষ আবার আবদ্ধ হল ট্রাইব্যাল সমাজের শৃংখলে। মূলতঃ এটাই হল Dr. Zhivago বইটিতে পাস্তেরনাকের বাণী। তাঁর নিজের ইডিয়লজির সহিত কলহ করতে চাই না, কিন্তু এই কি অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য? নিতান্ত শিশু ও নিতান্ত ঋষি ছাড়া কেউই অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্যকে বুঝতে এতখানি ভুল করতে পারেন না। পাস্তেরনাক বোধ হয় দুই-ই। প্রতিটি বড় বিপ্লবের সঙ্গীরূপে আসে যে বিপ্লবী সন্ত্রাস, তার অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতার চিত্র পাস্তেরনাক অত্যন্ত জীবন্তভাবে ও অসামান্য নৈপুণ্যের সহিত এঁকেছেন তা মানি; কিন্তু ওই একই নিষ্ঠুরতার যে একটা আবশ্যক, সৃষ্টিশীল ও ইতিহাসের দিক থেকে মহিমময় রূপও আছে, এ বিষয়ে পাস্তেরনাকের অন্ধতা বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতি পাস্তের-নাকের রাজনীতিক পক্ষপাতেরই ফল। এই অন্ধতার বশে পাস্তেরনাক টিপিক্যাল বিপ্লবী চরিত্র একটিও আঁকতে পারেন নি। পার্টিজান যোদ্ধা লাইবেরিয়াসের চরিত্র একটুও জীবন্ত নয়। স্ট্রেলনিকভ তো রীতিমতো existentialist চরিত্র। ভাবাদর্শের দিক থেকে স্ট্রেলনিকভ সমাজতন্ত্র থেকে প্রায় পাস্তেরনাকের মতোই দূরে অবস্থিত। Zhivagoর মৃত্যুর পর পাস্তেরনাক কল্পনা করেছেন, লারার শেষ জীবন কাটল আর্কএঞ্জেল অঞ্চলের কোনও বন্দীশালায়। এটাকে সমগ্র কাহিনীটির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলে মোটেই মনে হয় না। এইখানটায় ঋষি পাস্তেরনাক হয়ে পড়েছেন বিশুদ্ধ প্রচারক পাস্তেরনাক। তারপর কাহিনীটির শেষ যবনিকা পড়ার পরও পাস্তেরনাক শুধুমাত্র রাজনীতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য গল্পটির পিছনে একটা এপিলোগ জুড়ে দিয়েছেন। তাই বলছিলাম, বালজাক সম্বন্ধে এঙ্গেলীয় সূত্রটির কার্যকরিতার কোনও প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে না সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক অবস্থায়। পাস্তেরনাক বালজাক নন, টলস্টয়ও নন।

সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সমাজে লেখকদের মনে প্রলেটারিয়টের প্রতি পার্টিজান মনোভাব জাগানোর জন্য এবং তাঁদের ভাবগত পুনঃশিক্ষার জন্য যে চেষ্টা চলেছে, বর্তমান ঐতিহাসিক অবস্থায় তার একটা সুদৃঢ় ভিত্তি আছে। এই দিক থেকে পার্টি লাইন মূলতঃ সাহিত্যবিকাশের ও লেখকের স্বাধীনতার সহায়ক। প্রলেটারীয় ভাবাদর্শকে গ্রহণ করার ভিতর দিয়েই সমাজতান্ত্রিক সমাজে লেখক সমাজের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করতে পারে, প্রলেটারীয়

মানুষের অতি দ্রুত রূপান্তরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়ে তার অর্থগ্রহণ ও রসাস্বাদন করতে পারে, পুরাতনের সহিত দ্বন্দ্বে নূতনের ত্বরিত ও বিস্ময়কর জয়লাভকে গল্পকথা বলে উড়িয়ে না দিয়ে রিয়ালিটি বলে মানতে পারে এবং সমাজের অগ্রগতির অংশীদার হয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন করতে পারে। পার্টি লাইন লেখককে যে সাধারণ নির্দেশ দেয় তা এই যে, রিয়ালিজমের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সমাজতন্ত্রের নতুন অবস্থায় রিয়ালিস্ট সাহিত্য রচনা করতে হবে এবং এই কাজের ভিতর দিয়ে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বিকাশকে এগিয়ে দিতে হবে। এই নির্দেশ আর্ট সৃষ্টির কাজে লেখকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ও তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভার বিকাশকে যে ব্যাহত করবেই এমন কোনও কথা নেই। পার্টি লাইন সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যক্তির ও ব্যক্তিপ্রতিভার ভূমিকাকে স্বীকার করে না, এটা সত্য কথা নয়। কোনওরূপ অটোমেশ্যন প্রক্রিয়ার দ্বারা কলে তৈরি জিনিসের মতো ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য সৃষ্টি হবে, এমন একটা অদ্ভুত কথা সমাজতন্ত্রের পার্টিনেতারা নিশ্চয়ই বলেন না। প্রতিযোগিতার নিয়ম ও দ্বন্দ্বের নিয়ম যে সমাজতান্ত্রিক আর্টসৃষ্টির ক্ষেত্রেও বলবৎ, একথা মার্কসবাদে স্বীকৃত। বিভিন্ন লেখক ব্যক্তিগতভাবে আঙ্গিক ও স্টাইল সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হন, তার প্রয়োজনীয়তা সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃত হয় এবং সে বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হয়। শিল্পীকে ব্যক্তিগত প্ররোচনা দেওয়ার জন্য অর্থপুরস্কার, লোকসম্মান, রাজসম্মান প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং তাঁর গ্রন্থের ব্যাপক মুদ্রণের ও প্রচারের ব্যবস্থা আছে। ব্যক্তিগত পরীক্ষানিরীক্ষা সম্বন্ধে ব্যাপক মতপ্রকাশের যে সামাজিক প্রক্রিয়া সাহিত্যের রুচিনির্ণয় ও মাননির্ণয় করে এবং ব্যক্তিগত প্রতিভাকে যাচাই ও বাছাই করে, সেই প্রক্রিয়াটিও সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিদ্যমান। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের বিকাশে সমাজের ভূমিকা ও ব্যক্তির ভূমিকা, উভয় ভূমিকার কার্যকরিতার পক্ষে পার্টি লাইন মূলতঃ সহায়ক, একথা মানা যায়।

তবু এই বিপদ আছে যে সাহিত্যে পার্টি লাইন একটা ডগমায় পরিণত হয়ে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখকের সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ব্যাহত করতে পারে এবং সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের বিকাশকেও বিলম্বিত করতে পারে। কোন্ কোন্ দিক থেকে এই ধরনের বিপদ আসতে পারে এবং কখনও কখনও এসেছে, সে বিষয়ে দুটি একটি কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রলেটারিয়েট যেহেতু সকল কাজই তার অগ্রণী বাহিনীর নেতৃত্বে সংগঠিতভাবে

করে থাকে তাই সাহিত্যসৃষ্টিও প্রলেটারিয়েট এইভাবে করবে, এই ধারণাটা একটা সীমা লঙ্ঘন করে গেলেই হয়ে দাঁড়ায় একটা ডগমা। এবং তার ফলে সাহিত্যসৃষ্টিতে লেখকের সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হতে পারে এবং সাহিত্যবিকাশও ব্যাহত হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মেটিরিয়াল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকাটা সমাজের নেতৃত্বমূলক ভূমিকার যতটা বশীভূত, সাহিত্যিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে তা ততটা বশীভূত হতে পারে না, এই উপলব্ধিটা সমাজতান্ত্রিক নেতাদের মনে অনেক সময়েই অপেক্ষাকৃত দুর্বল। আর্ট ও সাহিত্যের নিজস্ব ধর্মকে বা নিজস্ব বিশেষত্বগুলিকে তাঁরা অনেক সময়েই বুঝতে ভুল করেন। সাহিত্যসৃষ্টিতে লেখকের ব্যক্তিত্বের ভূমিকাকে স্বীকার করতে তাঁরা অনেক সময়েই দ্বিধান্বিত। অথচ সকল বড় সাহিত্যই লেখকের ব্যক্তিত্বের ছাপটা সুস্পষ্টরূপে বহন করে। সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। লেখক রিয়ালিটি সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য উপস্থিত করেন সেই সাক্ষ্যটা বাস্তব জীবনে একেবারে তৈরি অবস্থায় পড়েই রয়েছে, তাকে শুধু তুলে এনে আর্টের মধ্যে বসিয়ে দিলেই চলে, রিয়ালিস্ট সাহিত্যের ব্যাপারটা যদি এতখানি সহজই হত তাহলে আমরা সকলেই রিয়ালিস্ট সাহিত্যিক হতে পারতাম। কিন্তু রিয়ালিটি আর্টিস্টের ব্যক্তিত্বের মাধ্যমেই আর্টের মধ্যে একটা মূর্ত ও ব্যক্তিত্বধর্মী রূপ পায়। রিয়ালিটির এই শিল্পগত রূপান্তরের জন্য আর্টিস্টের স্বকীয় পর্যবেক্ষণকে ও স্বকীয় সমন্বয় পদ্ধতিকে তাই যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানো দরকার এবং এ-বিষয়ে যথেষ্ট সহনশীলতা থাকা দরকার। সাহিত্যে পার্টি লাইন যদি সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণকে একটা বাঁধা পথে চালিত করে এবং তাঁর শিল্পগত সমন্বয় পদ্ধতিকে যদি একটা ফরমুলায় বেঁধে দেয়, তাহলে সত্যই বিপদের কথা।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে সাহিত্যিকের মনে প্রলেটারিয়েটের ও সমাজতন্ত্রের প্রতি একটা পার্টিজান অভিমুখিতা যাতে থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সমাজতান্ত্রিক সমাজের নেতাদের পক্ষে অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু বাস্তব জগতে নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বকে বা ভালমন্দের দ্বন্দ্বকে সকল সাহিত্যিক অবিকল একইভাবে দেখবেন এমন কোনও কথা নেই। এই রকম একটা বাঁধা-ধরা নির্দেশ উপস্থিত হলে আর্ট তার ব্যক্তিত্বধর্মী চরিত্র হারিয়ে হয়ে পড়বে রিয়ালিটি সম্বন্ধে একটা abstraction, যা আর্টের দিক থেকে সম্পূর্ণ অবাস্তব। পুরাতনের সহিত দ্বন্দ্বে নতুনের এবং মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ভালর আশু জয় যেহেতু অবশ্যম্ভাবী, এইজন্য নতুনকে সমাজতান্ত্রিক

রিয়ালিস্ট সাহিত্যে বিপ্লবী ঢঙে একটু বাড়িয়ে দেখানো দরকার, এই নীতি বৈজ্ঞানিক, তা মানি। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক নীতিকে একটি আর্টসম্মত নীতিতে পরিণত করতে হলে পুরাতনেরও একটি জীবন্ত ব্যক্তিত্বায়ন করতে হবে, এবং তার জন্যও একটু শিল্পগত অতিরঞ্জন দরকার। শিল্পগত অতিরঞ্জন আর্টের একটা অপরিহার্য ধর্ম। নতুনের চিত্রণের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য, পুরাতনের চিত্রণের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। চণ্ডীকাব্যে দেবীর চিত্রকেও যেমন বাড়ানো হয়েছে, মহিষাসুরের চিত্রকেও তেমনই বাড়ানো হয়েছে। আর্টের এই চিরায়ত নীতি সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। পার্টি ব্যুরোক্রাটের বা অন্য কোনও মন্দ ব্যক্তির বা মন্দ ঘটনার বিশদ, জীবন্ত ও রসান্বিত চিত্র আঁকলেই যদি অভিযোগ আসে যে মন্দকে বাড়িয়ে দেখা হচ্ছে এবং সমাজতন্ত্রের ও প্রলেটারীয় ভাবাদর্শের বিপক্ষতা করা হচ্ছে, তা হলে সাহিত্যের গুরুতর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। মন্দের চিত্র সজীব ও ব্যক্তিত্বধর্মী না হলে ভালর চিত্রটাও সজীব ও সার্থক হতে পারে না। কেবলমাত্র ভালর চিত্র বা কেবলমাত্র মন্দের চিত্র আঁকা মোটেই রিয়ালিস্ট আর্ট নয়। দুইয়ের দ্বন্দ্বের চিত্রটাকে ঠিক মতো আঁকাই প্রকৃত রিয়ালিস্ট আর্ট। যদি রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে আর্টিস্টের দৃষ্টি থেকে পুরাতন, মন্দ বা নঞর্থক উপাদানগুলিকে সরিয়ে রাখার কৃত্রিম চেষ্টা হয়, তাহলে আর্ট স্বধর্মচ্যুত হবে। যা মন্দ বা পশ্চাৎপদ তার জীবন্ত চিত্র আঁকা না হলে আর্টের ক্ষেত্রে সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বকেই অস্বীকার করা হবে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে যাঁরা শুধুমাত্র মন্দ ও পুরাতন দিকগুলিতেই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন তাঁরা অবশ্যই আর্টের নামে সৃষ্টি করেন আর্টের বিকৃতি। কার্যতঃ এঁদের বিরুদ্ধেই যে পার্টি অভিযান সাধারণতঃ চালিত হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এমন বহু সাহিত্যিক সমাজতান্ত্রিক দেশে আছেন, যাঁরা রিয়ালিস্ট সাহিত্যের বৈধ কর্তব্য পালন করতে গেলে যে সব মৌলিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সাহসের সঙ্গে ও নির্ভয়ে করতে হয়, তা সম্পন্ন করতে একটু বিব্রত বোধ করছেন। এইখানটাতেই সম্ভাবনা ও আবশ্যকতা রয়েছে সুবিবেচিত পার্টি লাইনের দ্বারা লেখকদের সমাজতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে আরও বাড়িয়ে তোলার। রিয়ালিস্ট সাহিত্যের বৈধ পরীক্ষানিরীক্ষা কার্য করতে গিয়ে যদি কোনও সাহিত্যিকের ভুলও হয়, সেই ভুলকে এমন দৃষ্টি দিয়ে বিচার করা উচিত নয় যে তার দ্বারা পার্টি লাইন ভঙ্গ করা হল বা প্রলেটারিয়েটের বিপক্ষাচরণ করা হল। সাহিত্যে পার্টি লাইন যদি এইরূপ একটা কঠিন ও অনমনীয় রূপ

ধারণ করে, তার ফলে সাহিত্যের অমঙ্গল ঘটার সম্ভাবনা। আর্ট ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বাধীন প্রতিযোগিতার নিয়ম এবং ব্যক্তিপ্রতিভার ভূমিকাটা যাতে সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রেখে পূর্ণভাবে কার্যকরী হয়, সাহিত্যে পার্টি লাইন এইভাবেই রচিত ও পরিচালিত হওয়া উচিত। সাহিত্য সম্বন্ধে মন থেকে এই ভীতি দূর করা উচিত যে সাহিত্যে একটু-আধটু ভুল বা উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিলে অমনই উৎপাদন-ব্যবস্থাটি বিগড়ে যাবে। সাহিত্যের সহিত উৎপাদন-ব্যবস্থার সম্পর্ক অত প্রত্যক্ষ নয়। সাহিত্য সম্বন্ধে জনমত এবং সাহিত্যিকদেব পারস্পরিক মতামত যাতে আরও অবাধে ব্যক্ত হয়, তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সাহিত্যের বাছাইয়ের ও বিকাশের উপর এটা একটা মস্তবড় সৃষ্টিশীল প্রভাব আছে যদিও তা কিঞ্চিৎ গূঢ় ও কিঞ্চিৎ দীর্ঘকালীন। শুধুমাত্র রাজশক্তির বিচারের ও নির্দেশের দ্বারা সাহিত্য বিকশিত হতে পারে না, সে রাজা ফিউড্যাল রাজাই হোক বা প্রলেটারীয় রাজাই হোক।

কিন্তু আমি নিশ্চয়ই এই সকল বিপদকে খুব বাড়িয়ে দেখছি। *

---

* শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২। জুলাই, ১৯৫৮। দাম তিন টাকা॥

চড়ক ঈস্টার ঈদের রোজা

বিষ্ণু দে

(শ্রীযুক্ত যামিনী বাযেব জন্মদিনে)

ঘৃণাব গঙ্গায নিত্য স্নান কবা, অবজ্ঞায ভাসা !
চতুর্দিকে মতিচ্ছন্ন গৃধ্নুদেব ধূর্ত হাঁকডাকে
স্বার্থান্ধের ক্ষমতায় অক্ষমের নিত্য যাওয়া-আসা ।
আকণ্ঠ ঘৃণার ঢেউযে তাই ডোবা আবিশ্ব বিপাকে ।

অথচ প্রেমেই বৃষ্টি বান ঝর্ণা স্রোতগা ঊর্মিলা,
হৃদযের পদ্মবাগে পাবর্তীর কণ্ঠে দোলে নীলা ।

যন্ত্রণা অশেষ, আজ প্রেমী খোঁজে প্রেমের আস্তানা,
আশেপাশে জঘন্যের নগণ্যেব মরীয়া উচ্চাশা,
সমস্ত কর্মেব ক্ষেত্রে তুচ্ছতাব অসহ্য পিপাসা,
ঘবে ঘবে জল চায়, অথচ ঘরেই সব নোনা ।

প্রেম মানে প্রকৃতই প্রাণ-দেওযা প্রাণ-নেওয়া মনেপ্রাণে মানা,
বিলিয়ে মিলিয়ে বুকে ঠাঁই দিয়ে প্রেমের মানেটা যায় জানা ।
প্রেমেই ফসল ফলে ফুল ফোটে পেকে ওঠে ফল,
অথচ সকলই আজ পুড়ে-হেজে মরে অবিরল ।

ঘৃণার এ অগ্নিযজ্ঞে প্রেমের জটায় বান আনা !
পাড় ভাঙা-গড়া ! এ যে ঘৃণাতেই প্রেমের ঠিকানা ॥

দুই

যেহেতু আনন্দরূপ তুমি আমিও বুঝিবা
দেখেছি হয়তো কোনোদিন
প্রাণ-কম্প্র অন্ধকারে নক্ষত্র বিশ্বাসে সেই বিভা
নীল নম্র রূপের বিভাস
দেখেছি হয়তো কোনো রুশতী উষায়
উন্মোচিত বাহু-বক্ষ-গ্রীবা
পৃথিবীর সাবিত্রীভূষায় ঘুমভাঙা ভৈরবী দীপ্তিতে
আনন্দ রূপের বিভা

অমৃত মুহূর্তে ক্ষিপ্র চির প্রতিভাস
হয়তো বা আমিও দেখেছি
আদিগন্ত বিরাট ছটায়
অনেক শতাব্দী ধ'রে মহীদাস আমরাও সন্ধ্যায় দেখেছি
সিন্ধুতে গঙ্গায় দীপ্র
হাহাকারে সারা দেশে চৈতন্যে স্মৃতিতে আশায় এঁকেছি
বহুকাল বহু আর্য-অনার্যের বহু মানুষের

সেহেতু যন্ত্রণা আজ তীব্রতম
দেহের আরামে প্রাণের তৃপ্তিতে মনের আনন্দে
দুর্মর স্মৃতির সপ্তাশ্বের ক্ষুরে ক্ষুরে
দুর্জয় আশার হাওয়ায় ধূলায়
নিদ্রাহীন একচ্ছত্র স্বপ্নের তুষের উজ্জ্বল ঘটায়
শান্তি নেই দিনরাত্রি শান্তি নেই গ্রামে গ্রামে
শহরে শহরে হাহাকারে দেশে দেশান্তরে
অন্নের অভাবে বাসাবাড়ি বস্ত্রের অভাবে হাহাকারে
নির্বুদ্ধির দুর্বুদ্ধির স্বনামে বেনামে
অক্ষমের অসতের অনাচারে অত্যাচারে

বিশৃঙ্খলা শত-ভেদাভেদে জীর্ণ চৈতন্যের কুয়াশায়
মৃত্যুভয়ে

আনন্দরূপমমৃত তবুও মরে না
শত কঙ্কালের বিস্তীর্ণ কাঁকরে
সে অমর কুরুক্ষেত্রে
ইন্দ্রপ্রস্থে পাশা খেলে বেচাকেনা খেলে
ম্যানেজারী দাঁও মেরে প্রতিদিন
কদম্বকাননে শত শমীদাহ সেরে
কিছুতে সে শেষ নয় হৃদয়বত্তায়
স্মৃতির প্রতাপ আর আশার স্পন্দন শত হাহাকারে
ঈদের রোজায় আর চড়কের ব্রতে আর উপোসী ঈস্টারে

যেহেতু আনন্দরূপে প্রত্যহের বিভা সবাই দেখেছি
যেহেতু এঁকেছি ধ্যাননেত্রে দৈনিক সত্তার ॥

তিন

যে কথা কানে পশে অহর্নিশি,
যে কথা পড়ি সকালে নিজ চোখে,
যে অসত্যে রোজের কাজে মিশি,
ডোবাই মন ড্রেন পাইপ পাঁকে,
কাটাই দিন সঞ্চয়ের রোখে,
সেখানে কোথা বাঁচবে ঝাঁকেঝাঁকে
মানসজীবী অসিত-শ্বেত মরাল ?

শত বলুক পাঁকেই পলিমাটি,
বলুক পচা নালার কাদা খাঁটি,

পাঁচসালায় লুট্‌ক পরিপাটি,
স্বাধীনভাবে হাঁকুক দশদিশি,
প্রকাশ করে লোভের ফাঁকেফাঁকে
অক্ষমতা ; কারণ কালদ্রোহী,
তাই এদের অন্ধতাও ভয়াল।

কারণ কাল নেই রে বাদশাহী,
দাস মহিমা মানে না আর মহী,
কারণ যুগসত্যো দীন দয়াল
মহেশ্বর কঠিন আজ করাল,
লক্ষ্মী আজ ইতিহাসের দাহে
দগ্ধ করে নগ্ন দিবানিশি ॥

চার

গ্রাম কি শহর বলো সব তেপান্তর,
সময়ে মেলে না বৃষ্টি
মাটিতে বা মনে,
যদিই বা নামে জল নামে তা অকালে।
কিবা গ্রীষ্ম কিবা বর্ষা আশ্বিন অঘ্রাণ
সব অবান্তর সব রসিকতা বেসুরে বেতালে।
অনাসৃষ্টি গ্রামে বা শহরে বন্ধুর জীবনে,
কোথা পরিত্রাণ ?
এতকাল দেশে দেশে জেনেছে মানুষ,
জীবন, তা হোক না সে একের বা অনেকের,
প্রেমের বর্ষায় রৌদ্রে স্ফটিক আকাশে
জীবন স্বধর্ম পায়, মাটি পায় মনে,
হৃদয়েরা স্বর পায় পেলব পরুষ,
তা সে বাংলাই হোক আফ্রিকা বা চীন কিংবা রুশ ;

ভ্রূকুটিতে আদরে আশ্বাসে
একের অন্যের আবেগের মননের হাজার ধরনে
জীবনে জীবন দিয়ে মৃত্যু দিয়ে হাসে কেঁদে হাসে।
আজ কেন হাসি পাঁক, রৌদ্র আজ কেন অশ্রুজলে,
আজ মরুভূমি সাজে সাগরে সাগরে
অথচ সমুদ্র মনে আজ ঘরে ঘরে।
জীবনে কি কিছু নেই প্রেমের কড়িতে কিংবা ঘৃণার কোমলে ?
অবিশ্বাস্যছলে আমরা কি সবাই হাঘরে ?

পাঁচ

চতুর্দিকে নির্বোধের ভিড়,
কেউ ভালো, কেউ মন্দ, এরা সকলেই
স্বার্থে বা পরার্থে ঢাকে বর্ষার নিবিড়
সজল বাহার, ঢাকে দুচোখের নীড়
কথার কালিতে নানা নির্বোধ কৌশলে।

পৃথিবী ঢেকেছে এরা, জীবনের মাটি
করেছে শ্মশান পোড়া, পোড়ো ;
কেউ মন্দ, কেউ ভালো, অর্থাৎ কারো বা মন খাঁটি,
সকলে চালাতে চায় কল্কির ঘোড়াই,
অথচ অভ্যস্ত স্বস্তি চায় পরিপাটি।

চতুর্দিকে, মাটিতে আকাশে
এরাই করেছে ভীড়, শালিক ও কাক
কিছুবা শকুন, আর বিছালিতে ঘাসে
বাছুর, শিবের ষাঁড়, আর হাঁকডাক
করে বটে পাড়ায় পাড়ায় কুকুর আশ্বাসে।

চোখ ঢাকো কান চাপো, বুকচাপা দুঃস্বপ্নের ভিড়ে
নৈঃসঙ্গ্য রোপন করো, প্রতিরোধ অন্বিষ্টের ধ্যানে ;
অবজ্ঞায় ঘৃণায় নেতিতে, একান্ত সজ্ঞানে
প্রেম-কে লালন করো স্বপ্নশুচি নীড়ে,
অন্য অরণ্যের ভিড়ে, আপন সম্মানে,
গাছপালা পশুপাখি শিশুর কল্যাণে,
মানুষের, যত মেয়ে-পুরুষের গানে ॥

ছয়

কদিন গরম বেশ, কলকাতায় পশ্চিমা রোদ্দুর,
তারপরে বৃষ্টি এল, কালবৈশাখীর বৃষ্টি, ঝড়, শিলা, জল।
ঠাণ্ডায় সন্ধ্যায় ভাবি এই কটাদিন :
সমুদ্রের বাংলার সাবেক হাওয়ায়
সারা দুনিয়ায় কেন—বাংলায় এলোমেলো অকালে আগুন ঝরে
পশ্চিমা রোদ্দুরে ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকায় ঘৃণার আগুনে
কালো কালো চোখ ভরে রক্ত ঝরে
ছায়ায় ছায়ায় শুধু হত্যার রোদ্দুর !
অথচ ঈস্টার এল।
অথচ পাইলেট ! এখনও ঈস্টার আসে পশ্চিমের কারো কারো
হৃদয়বত্তায়,
চৈতালী অশ্রুতে বাজে মানবিক উজ্জীবিত সুর
সে কোন মাতার
করুণ বাহুতে এল নূতন মানুষ,
আবিশ্ব নয়নে এল মমতার অশ্রুর প্রণতি।
আজও তবু হেরডেরা সালোমের পসরা যোগায়
এশিয়ায় আফ্রিকায় স্বদেশেও লাভের ক্ষতির
দীর্ঘ ইতিহাসে শিশুর হত্যায়।

অথচ গির্জায় চলে গম্ভীর আরতি,
সভ্যতা সঙ্গীতে তীব্র রূপ ধরে, ভেসে আসে দক্ষিণে হাওয়ায়।
তবু হেরডেরা অন্ধ গুম্রুর সত্তায়
সালোমের ভোগের পসরা দেশে দেশে মরীয়া জোগায়।
যেন বা পাইলেট আজও ন্যায়-দণ্ডধর, এ হাতে ও হাতে
চেলে বণিক বন্ধুর।
যেন বা পশ্চিমা মরু একমাত্র সত্য যেন অক্ষয় অমর
ছায়াহীন বৃক্ষহীন শস্যহীন অকাল রোদ্দুর।

মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে, বৃষ্টি নামে, শিলাবৃষ্টি, জল পড়ে
স্নিগ্ধ ঘন ছায়ায় শরীরে নামে অখণ্ড সংবিত।
এদিকে গির্জায় একটি মাতার পরম মায়ায় বাজে
ইওহান সেবাস্তিআনের, হত্যা নয়, সৃষ্টিময় মহীয়ান সুর
দুর্গতের কলকাতায়, উদ্বাস্তু বাংলায় এশিয়ায় আফ্রিকায়
বাখের আপন দেশে একটি সঙ্গীত॥
কদিন সন্ধ্যায় বইছে সমুদ্রের হাওয়া শিলাবৃষ্টি ঝড়ে।
মাথা হেঁট ক'রে নাকি শোনে হেরডেরা
শুনি নাকি পালায় পাইলেট॥

সাত

তারপরে অন্ধকার শান্তি আর অন্ধকার নিস্তব্ধতা।
ঘুমের সমুদ্রে কিংবা ঘুমের আকাশে মুক্তি প্রতিদিন।
ঘুম ভাঙে প্রতিদিন রুশদ্বৎসা রুশতী উষায়,
মনে হয় প্রাণ সত্য, এ নশ্বর জীবন অমৃত।
বিশ্রাম সচ্ছল, পরিপূর্ণ, মানবিক, চৈতন্যে বিস্তৃত।
মনে হয় কাজের সন্ধান আর কর্মস্থানে কাজ,
আর সকাল বিকাল যাওয়া-আসা

সব কিছু, মনে হয়, ঘুম থেকে জাগা যেন রাত্রি আর দিন দ্বন্দ্বহীন,
উভয়ে সমান-বন্ধু, উভয়েরই এক ভাষা, শুধু বিভিন্ন ভূষায়।
এ দেয় নন্দিত ঘুম আর অন্যে কর্মের প্রবল
ছন্দময় সার্থকতা, যেন এক পতিব্রতা প্রেমে ধৈর্যে
দৈনন্দিনে অন্নপূর্ণা আর রাত্রিতে প্রেয়সী, দুই একাধারে ধৃত,
যেন দ্যাবা-পৃথিবীকে বেঁধে রাখে সূর্যেচন্দ্রে আণবিক পৃথিবীকে
একটি মিলনে সাহচর্যে,
কিবা দিন কিবা রাত্রি, স্বদেশ-বিদেশ।

তারপরে ? তারপরে কর্মস্থলে ক্লান্ত যাত্রী।
কর্ম শুধু ক্লান্তি, অসংলগ্ন অর্থহীন,
শত অর্থ খোঁজার পরেও অনর্থক।
তারপরে ক্লান্ত ফেরা।
গ্রামে কিংবা গ্রাম্য জীর্ণ অতিকায় শহরেই হোক।
কোথায় সে রাত্রি যার হাসির পূর্ণতা
ঢেকে দেয় স্থূল অন্ধকার
ভাস্বতীর নিজ অন্তরের দীপ্র অন্ধকারে,
যে শান্তিতে গ্রামবাসী অবিক্ষত
নি পদ্‌বন্তঃ নি পক্ষিণঃ
নি শ্যেনসশ্চিদর্থিনঃ— ?
তাই রাত্রি যন্ত্রণাই, অবসর অস্থিরতা, ক্লান্তিকর,
রাত্রি আর দিন যেন সতীনেরা
সদাই উদ্যত, ভবিষ্যৎ দুঃস্বপ্নে শূন্যতা,
স্মৃতি শুধু শোক।
প্রতিদিন প্রতিরাত্রে
ঘরে ঘরে-বাইরেও কাতরায় শূন্যতার সেই একই রোখ।

চাই অন্ধকার, অন্ধকার শেষ করি যেন প্রতিদিন দীর্ঘায়ুতে
উষসীউষায়, সবিতার খড়্গে খড়্গে;
যে সবিতা পশ্চাৎ ও যে সবিতা পুরস্তাৎ
উত্তরের অধরের সর্বত সবিতা,
সার্থকের বরেণ্য উষায় রুশদ্বৎসা রুশতীর ভর্গে
জগৎহিতায় ঋণশোধে স্নায়ুতে অপার প্রাত্যহিক আত্মস্থতা
আবিশ্ব প্রসাদ ॥

সংকীর্ণ যোজক

রাম বসু

হিম-সিক্ত পাখি এলো, বরণের আকাশ গভীর
ক্লান্তির চিত্রিত বনে, কামনায় নিহিত থাকে কি
চিতার চন্দন গন্ধ, দিব্য দুঃখ সহজ ছবির
পাঁপড়ির সিঁড়ি বেয়ে কোন নীলে পৌঁছাবে, জোনাকি !

বিনীত বিষাক্ত ফুল পেয়ে খর অন্ধকার ঘ্রাণ
মৃত্যু আলোকিত মুখে নিজেকে নৈবেদ্য করে স্থির
বিফল ছায়ার রাজ্যে সেও হয় মুহূর্তে অম্লান
রক্তের অব্যর্থ ভাষা, নিবিড়তা, পায় স্নিগ্ধ তীর।

কি ইচ্ছা আমার বুকে মাঝরাতে নিষ্ঠুর সমুদ্র
পাঁজর উপড়ে ভেঙে পরলোক হীন আর্তনাদ
জলস্তম্ভ হয়ে চূর্ণ, নীল রেণু উড়ন্ত, কি ক্ষুদ্র
পাখায় দিগন্ত মাখে, মুখে রাখে বালির আস্বাদ।

কোথায় উত্তীর্ণ হলে প্রতিভাত নির্মল নির্দেশ
নৈশ-স্বরে দাহ মুক্ত দীপ্তি, প্রেম, সর্বস্বতা—তুমি
গঠিত—আনন্দ আয়ু পরে গাছগাছালির বেশ
নির্ণীত সংকল্পে নম্র হৃদয়ের স্বাভাবিক ভূমি।

আমার বিরুদ্ধে আমি।—হব নাকি সম্পূর্ণ, আচ্ছন্ন
সবুজ আঁধারে গুপ্ত ভিজে তপ্ত গুম্ফিত মৌচাক
বিস্ময়ের মানচিত্র, দিনান্তের মুখশ্রী অনন্য
প্রতিধ্বনি যথাযথ যদি দাও অপরূপ ডাক।

যোজক সংকীর্ণ, জানি পাশাপাশি যাবে না দুজন
তুমি তো নিঃসঙ্গ স্তোত্র নক্ষত্রের ছায়ার সরণি
বিপরীত অর্ধ আমি সেই দিকে, স্বগত ভুবন
পাবো ভস্ম—শান্ত হলে,—হলে জল, দূর ঘণ্টাধ্বনি।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত এক বছরের বাংলা উপন্যাসের সালতামামি অবশ্যই দুরূহ কার্য। শুধু যে সংখ্যা বাহুল্যের জন্যই এ-কার্য দুরূহ তা নয়, বহুলতার সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ষের প্রশ্নও জড়িত হয়ে রয়েছে বলেই এ-কার্য মোটেই সহজসাধ্য নয়, সুখকর তো নয়ই। এ আলোচনার প্রধান সমস্যা এই যে শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রকাশিত উপন্যাসগুলির নামোল্লেখ করা সম্ভব হবে কি না। প্রকাশকদের মুদ্রিত তালিকা দেখে যদি বা সে-কাজ সম্ভব হয়—তখন সমস্যা হবে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতগুলি এবং সে উল্লেখযোগ্যতার মাপকাঠি কী? এবং শেষ অথচ প্রধানতম সমস্যা হবে আমাদের মতে যেগুলি উল্লেখযোগ্য বলে মনে হল তাই সুপরিসমাপ্ত তালিকা কি না। সে-কারণে এ জাতীয় যে কোনও আলোচনারই ভূমিকায় অথবা উপসংহারে বারংবার এ কথা বলে নেওয়া হয় যে অনবধানতাবশতঃ কোনও কোনও নাম বাদ পড়ে গেছে—ত্রুটি মার্জনীয়।

প্রথমেই বলে রাখা দরকার এ আলোচনার উদ্দেশ্য সে জাতীয় কোনও নিঃশেষিত তালিকা প্রণয়ন নয়। এক বছরে প্রকাশিত সমস্ত উপন্যাসগুলি পড়ে ফেলা দুঃসম্ভব—এক বছরে প্রকাশিত সমস্ত উপন্যাসগুলিকে আলোচনা করার মতো করে স্মরণে রাখা অসম্ভব। কাজেই এ ব্যাপারে আলোচনাকারীর ব্যক্তিগত ক্ষমতার সীমাকে কিছুটা মেনে নিতেই হয়। সে কারণেই প্রথমে এ কথাও বলে রাখা আবশ্যক বলে মনে করি যে প্রতিটি উল্লেখযোগ্য লেখকের প্রতিটি উল্লেখের অযোগ্য উপন্যাসও মাত্র আলোচনার খাতিরেই এ রচনায় স্থান পাবে না। বলা বাহুল্য, সে জাতীয় কোনও তালিকা রচনার উদ্দেশ্যও আমাদের নেই। বরঞ্চ আমাদের উদ্দেশ্য অন্যতর। গত এক বছরের উল্লেখযোগ্য বাংলা উপন্যাসগুলির সাহায্যে আমরা কোনও একটা মোটামুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি কিনা, গত এক বছরের বাংলা উপন্যাস কোনও একটা নির্দিষ্ট চেহারা এবং চরিত্র নিয়ে আমাদের সামনে এসেছে কিনা অথবা যথাপূর্বম্ নিশ্চরিত্রতাই এখনো তার বীর্যবত্তার নিদর্শন হয়ে রাজত্ব করে চলেছে কিনা এগুলোই হবে আমাদের এক বছরের সালিয়ানা হিসাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

এ প্রসঙ্গে আরো একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন যে উল্লেখযোগ্যতার মাপকাটি খ্যাতি বা সংস্করণ নয়। যে কোনও দিকের বৈশিষ্ট্যই উল্লেখযোগ্যতার মাপকাঠি। এ কারণে প্রৌঢ় এবং তরুণ দুই বয়সের লেখককুলকেই যথেচ্ছ গ্রহণ এবং ব্যবহার করা প্রয়োজন। লেখকদের ছোট বড় মাঝারি এবং প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এ ধরনের শ্রেণীকরণে আমি বিশ্বাসী নই। কখনো কখনো এ ধরনের শ্রেণীবিভাগের দ্বারা অতীতে আমরা পীড়িত হয়েছি। এ ধরনের শ্রেণী-বিভাগের প্রধান আপত্তি এখানেই যে এ ধরনের কর্ম করতে গিয়ে আমরা লেখকের শ্রেণী নির্ণয় করতে যাই—লেখার নয়। ফলে প্রথম শ্রেণীর লেখকের তৃতীয় শ্রেণীর লেখা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের প্রথম শ্রেণীর লেখা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে গিয়ে বিপদে পড়ি।

তাই যেহেতু দফাওয়ারীভাবে লেখক ধরে ধরে আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, যেহেতু গত বছরের ঔপন্যাসিক গতিপ্রকৃতি ধারা নিরূপণই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য সেইহেতু আমাদের প্রয়োজন মতো বয়স, খ্যাতি এবং তথাকথিত সাফল্য-নিরপেক্ষভাবেই লেখকদের ব্যবহার করব।

॥ দুই ॥

গত বছরে প্রকাশিত উপন্যাসের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলে একটা ব্যাপার লক্ষ্য না করে উপায় থাকে না। সেটা হল বাংলা উপন্যাস পুনরায় শুধু বর্ণাঢ্য পরিবেশে বিধৃত কাহিনী গড়ে তোলার প্রলোভন থেকে মুক্তিলাভ করতে চলেছে। গত দশকের বাংলা গল্প-উপন্যাসের জগতে রাজত্ব করছিল ঊনবিংশ শতকের বিষয়বস্তু কিংবা "অভিজ্ঞতার নব নব দিগন্ত উন্মোচনকারী" বিস্ময় রসজীবী বিষয়। সাহেব-বিবি-গোলাম, আকাশপাতাল, লালবাই থেকে উদ্ধারণপুরের ঘাট, পূর্বপার্বতী আসলে একধরনের জীবনবিমুখতা উদ্ভূত উপন্যাস। এদের বিষয়বস্তু এবং শিল্পকর্ম শিল্পকর্মের তাগিদে জন্মগ্রহণ করেনি। তাই বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের কাছে লেখকদের আত্মসমর্পণেই এ-জাতীয় শিল্প-কর্মের সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়েছে। অবশ্যই এই বিষয়বস্তু ঔপন্যাসিকেরা ব্যবহার করবেন এবং এই বিষয়বস্তু করবেন না এমন ধরনের কোনও পাঁতি দেওয়া সমীচীন নয়—কিন্তু বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব যে শিল্পের অভিনবত্ব নয়, এবং কোনও ব্যাপার চিত্তাকর্ষক হওয়া মানেই যে সেটা শিল্পগুণান্বিত হওয়া নয়

গত কয়েক বছরের বাংলা সাহিত্যের বড় একটা অংশে সে বোধের অভাব লক্ষ্য করে আমরা পীড়িত হয়েছি। শিল্প সৃষ্টি সম্বন্ধে এই অমনোযোগিতা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা সম্বন্ধে লেখকদের অনবধানতারই পরিচায়ক।

তাই যদিও গত এক-দেড় বছরে 'কেরিসাহেবের মুন্সি', 'মহারানী' প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে প্রফুল্ল রায়ের 'সিন্ধুপারের পাখি' এবং বারীন দাশ মশায়ের চীনে পাড়ার কাহিনী নিয়ে লেখা উপন্যাস 'চায়নাটাউন'। তথাপি মোটামুটি বলা যেতে পারে গেল বছরের বাংলা উপন্যাসের সাধারণ ঝোঁক ছিল সমকালীন জীবনকে শিল্প-কর্মের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করার দিকেই। এবং এ-প্রসঙ্গে আরো একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে এ-বিষয়ে তরুণতর ঔপন্যাসিকেরাই বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। অবশ্যই উপন্যাস রচনায় বিষয়বস্তুর ভূমিকাকে অস্বীকার না করেও বলা চলে যে সমকালীন জীবনকে উপন্যাসে বিন্যস্ত করার ভিতরেই উপন্যাসিকের শক্তির প্রাথমিক পরিচয় নিহিত হযে রয়েছে। দেখা এবং চেনা ঘটনাকে উপন্যাসের বিন্যাসে নিয়ে এসে সমকালাশ্রয়ী ঔপন্যাসিক পাঠকের রসপিপাসা চরিতার্থ করেন। এখানে আঞ্চলিকতার ফাকিবাজির বা শতবষ পূর্বের কল্পিত রোমান্সগন্ধী বিষয়ের কোনও আনুকুল্যই নেই। মাত্র কাহিনী এবং উদ্ভট কল্পনার পাতাবাহারি বর্ণাঢ্যতায় শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভুলানোর বিপুল অবকাশও এখানে অনুপস্থিত। এখানেই ঔপন্যাসিকের যথার্থ শক্তিমত্তার পরিচয়। ওখানে শক্তিমত্তার। এ-প্রসঙ্গে ভুল বোঝার সম্ভাবনাকে এড়ানোর জন্যই বলা দরকার যে একথাগুলো বিশেষ করে বাংলা উপন্যাস—গত কয়েক বছরের বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কেননা, বিদেশী উপন্যাসের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যে ইতিহাসের ক্রোড়ে ন্যস্ত কাহিনী মাত্রেই ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। সার্থক ঐতিহাসিক-উপন্যাসের তাৎপর্য অন্য। লেখকের কালচেতনা এবং ব্যক্তিচেতনা সেখানে সমভাবে সক্রিয় হয়ে বর্ণিত-কালকে ব্যাখ্যা করে উপন্যাসের ভাষায়। ওঅর এণ্ড পীসের বিশাল কলেবরে রাশিয়ার ইতিহাসের বিশেষ ঘটনাবলী বা একটা কালের সোশ্যাল মিলিউ ফুটে উঠেছে বলেই ওঅর এণ্ড পীস বড় উপন্যাস নয়। নবীন এবং স্থবির রাশিয়াকে কেন্দ্র করে সময়ের চক্রবৎ আবর্তন এবং অতিবাহনই এ-উপন্যাসের প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। আমাদের ইতিহাসের ক্রোড়ে ন্যস্ত উপন্যাসগুলিতে ইতিহাস-চেতনার অভাব বড়ই প্রকটা। শুধুমাত্র কাহিনীকে নিরাপদে একটা খাতে বইয়ে দেবার জন্যই যেন উনবিংশ শতকের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

ঠিক এইভাবেই আমাদের আঞ্চলিক উপন্যাসগুলিও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। হার্ডির উপন্যাসে অথবা তারাশঙ্করের মহৎ সৃষ্টিতে আঞ্চলিকতা আছে বটে— কিন্তু উক্ত উভয় ক্ষেত্রেই আঞ্চলিকতার আধারে জীবনের রসরূপই ফুটে উঠেছে। এবং যখনই সে রসরূপ সার্থক হয়েছে, তখনই সে-জীবন আর মাত্র লেখকের ভ্রমণবৃত্তান্তের ঔপন্যাসিক প্রকাশ হয়নি, হয়েছে দেশকালোত্তীর্ণ জীবনেরই অংশ। তা না হলে লেখককে কেবল পাঠকের আঞ্চলিক অজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের শিল্পপ্রয়াস কখনোই সার্থকতার কাছাকাছিও যেতে পারে না। 'সিন্ধুপারের পাখি' জাতীয় রচনাগুলি তারই নিদর্শন। ভ্রমণকাহিনীর বিস্ময়-বোধের সঙ্গে কল্পনার উদ্ভট স্বেচ্ছাবিহার ছাড়া এর মধ্যে সাহিত্যজিজ্ঞাসা কিছু নেই। গত এক-দেড় বছরের মধ্যে আঞ্চলিক সাহিত্য বলে পরিগণিত হতে পারে এরকম আর একখানি বই প্রকাশিত হয়েছে। অচ্যুত গোস্বামীর 'মৎস্যগন্ধা'। বহু উৎসাহ নিয়ে এ-বইখানি পড়তে গিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় জীবনের টোটালিটি বা সামগ্রিকতার জন্য অচ্যুতবাবুর শত চেষ্টা সত্ত্বেও উপন্যাসের জীবন কোনও প্যাটার্নেই পরিণত হতে পারেনি। দক্ষিণবঙ্গের জেলেদের জীবনকে অচ্যুতবাবু যে চেনেন না তা নয়, তাদের অর্থনৈতিক বিন্যাসকেও লেখক অনুধাবন করেছেন—তাদের জীবনের যে কোনও ব্যাপার সম্বন্ধেই তার সমান কৌতূহল আছে—ভদ্রলোকী শুচিবায়ু থেকে তিনি মুক্তও বটে, তথাপি উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত পাঠকের রসপিপাসাকে—তথা যে জীবনকথাকে লেখক বলছেন তাকে পাঠকের পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার বাসনাকে অতৃপ্ত রাখে। তার কারণ এই যে উপাদান সমূহকেই লেখক টোটালিটি বলে ভুল করেছেন। তাই যদিও অচ্যুতবাবু 'পূর্বপার্বতী' 'সিন্ধুপারের পাখি'র লেখকের মতো উপকরণ নির্বাচনেই দুর্বলতার পরিচয় দেননি অথবা নিষ্ঠার দিক দিয়ে বিচার করলে বলতেই হয় যে তিনি অধিকতর লক্ষ্যসন্ধ ছিলেন তথাপি টোটালিটির অভাবেই 'মৎস্যগন্ধা' শেষ পর্যন্ত তার উদ্দেশ্যে পৌঁছয়নি।

॥ তিন ॥

এই উপকরণ-বাহুল্যের সন্ধানেই আমাদের লেখকদের ফিরতে হয় উনবিংশ শতাব্দীর ছায়াপথে। বনফুলের 'মহারানী' যদিও কাঁটায় কাঁটায় তারিখ

মিলিয়ে গত সালের উপন্যাস নয় তথাপি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আতিশয্য-যুক্ত চরিত্রের দিকে বনফুলের ঝোঁক বরাবরের। এমন কি মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী উপন্যাস রচনার কালেও তাঁর এ আসক্তি লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর এ বছরে প্রকাশিত 'জলতরঙ্গ' তার প্রমাণ। 'মহারানী'তে এই আতিশয্য-কল্পনা উপন্যাসের ভারসাম্যকে রীতিমতো বিপর্যস্ত করেছে। আফ্রিকান মেয়ে কষ্টি, বাঙালী সামন্ত-তনয়া মহারানী, একদল বাঘ-সিংহ বোঝাই পশুশালা—এ সমস্ত নিরুদ্দেশ্য সমারোহের এবং সমাবেশের উপন্যাসে তাৎপর্য কী তা একান্তই দুর্বোধ্য। সম্ভবত মহারানীর ব্যক্তিত্বের পরীক্ষাস্থল ঐ পশুশালা, সম্ভবত আফ্রিকান মেয়ে কষ্টির মহারানী সম্বন্ধে বিমূঢ় বিস্ময় ও আতঙ্ককেই লেখক সঞ্চারিত করতে চান পাঠকের মনে। কিন্তু কেন? কোন শিল্প-সিদ্ধির জন্য এগুলো করা হচ্ছে? প্রেমের যন্ত্রণা যখন সমগ্র ব্যক্তিমানসের মূলে স্থূলে আলোড়ন তোলে তখন তা কি শুধু সিংহের গলা জড়িয়ে সোহাগ এবং বাঘের পিঠে চড়ে ছুট্ দিলেই রূপায়িত হবে? শ্রীহর্ষের পায়ের কাছে এসে মহারানীর আত্মনিবেদন পর্যন্ত এবম্প্রকার ঘটনার পর ঘটনায় পাঠকমন এতখানি অভিভূত থাকে যে সে অভিভূতি রসিক পাঠকের রসোপভোগের পক্ষে হানিকর হয়েছে। বস্তুত একথা ভাবলে দুঃখ হয় যে উনিশ শতকের দায়মুক্ত প্রান্তরে কল্পনার ঘোড়া ছোটাতে আমরা কম পারদর্শিতার পরিচয় দিলাম না—সে জায়গায় গত শতাব্দীর চেনা মানুষ, চেনা ঘটনাকে নিয়ে ঐতিহাসিক রোমান্স নয়, একটা সত্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের কতখানি অবকাশ ছিল তার সদ্ব্যবহার বিশেষ হল না।

সেদিক দিয়ে বিচার করলে বরঞ্চ 'কেরি সাহেবের মুন্সি' একটা বিশেষ মর্যাদার আসন দাবি করতে পারে। গত বছরে প্রকাশিত অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের জীবনাশ্রয়ী উপন্যাস যতদূর স্মরণে আসছে বোধ হয় এখানিই অন্যতম—এবং প্রকারের দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় অনন্য। বাংলা গদ্যের আদি-পুরুষ রামরাম বসু—ঐতিহাসিক ব্যক্তি কেরি সাহেবও তাই। শ্রীরামপুর মিশনারিদের জীবনী নিয়েও যথেচ্ছ কল্পনার কোনও অবকাশ ছিল না। আর এদিকে আঠারো শতকের অন্তিম প্রহরও ইতিহাসের দিক দিয়ে চিত্তাকর্ষক কাল। আর সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক রামরাম বসু নিজে। আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথমপাদের যা কিছু কালচিহ্ন সবই ছিল তার অঙ্গীভূত। ভাগ্যান্বেষণের কাল তখন। নিজ ধূর্ততা, পাণ্ডিত্য এবং হৃদয়—সবকিছু নিয়ে সেই কালান্তরের টানাপোড়েনের আশ্চর্য প্রতীক রামরাম বসু।

লেখক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় রামরাম বসুকে কালের সমানুপাতেই গড়েছেন— আর তার সঙ্গে মিশিয়েছেন জীবন সম্বন্ধে নিজের সকৌতুক অ্যাটিট্যুড। এই অ্যাটিট্যুড প্রমথনাথের সাহিত্যজীবনের সহজাত শক্তি। কিন্তু ইতোপূর্বে এ মনোভঙ্গির সঙ্গে বিদ্রূপময় উন্নাসিকতার মিশ্রণ প্রমথনাথের পক্ষে সর্বথা সুফলদায়ক হয়নি। স্বকালের ভিন্ন ধরনের জটিলতাকে ব্যাখ্যা করার জন্যে অন্য মনোভঙ্গির প্রয়োজন ছিল। তাঁর বিদ্রূপ শ-এর বিদ্রূপের মতো জীবনযাত্রার নির্বোধ অসঙ্গতিগুলিকে আঘাত করে সত্যার্থ উন্মোচনকারী নয়—স্থূল ভাষায় ঈশ্বর গুপ্তের মতো আত্মরক্ষাকারী। কিন্তু এই অ্যাটিট্যুড সার্থকভাবে নিজ আধার খুঁজে পেয়েছে কেরি সায়েবের মুন্সির নায়কের চরিত্রে। সে কারণে কেরি সাহেবের মুন্সি লেখকের নিজ সাহিত্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

অবশ্য লেখকের দৃষ্টি তৎকাল এবং ব্যক্তি উভয়ের প্রতি সর্বত্র সমানভাবে সজাগ থাকেনি। উপন্যাসের প্রথমাংশে দেশ এবং কালের দিকে লেখকের যে সতর্কদৃষ্টি লক্ষ্য করা যায় শেষাংশে তা রক্ষিত হয়নি। এবং বর্তমানকালে তারাশঙ্কর ব্যতীত বাংলা উপন্যাসের যে দোষ সর্বক্ষেত্রে প্রায় সার্বজনীন হয়ে উঠেছে শ্রদ্ধেয় বিশী মহাশয়ও তা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি—চিত্তাকর্ষী এক নারী চরিত্র সৃজন, এবং যে রহস্যাবর্তে উপন্যাসের সমস্ত দায়ভাগকে সমর্পণ। রেশমীর আত্মপ্রকাশের পরই উপন্যাসের এই বিপদ আভাসিত হয়েছে। এবং শেষাংশে রেশমী প্রধান হয়ে ওঠার ফলে রামরাম বসু অনেকখানি হারিয়ে গেছেন। হয়তো লেখক রেশমীর প্রণয়ভাজন হবার মতো শক্তিমান নায়ক তখনকার চরিত্রহীন বাংলা দেশের দেশজদের মধ্যে সম্ভব ছিল না—একথা বোঝাতে গিয়েছিলেন রেশমীর প্রেমোপাখ্যানের ভিতর দিয়ে—কিন্তু এই উপলক্ষ্যে মূল লক্ষ্য বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শ্লীল-অশ্লীল হাস্যকরুণ বীভৎস এবং আদি তথা নবরসের সম্যক ব্যবহারে এ উপন্যাস তবু অর্জন করেছে একটা স্বাস্থ্য এবং এ উপন্যাসের অসীম স্বাস্থ্যের দিকে বাংলা দেশের পাঠককুলের দৃষ্টি যে আকৃষ্ট হয়েছে তা থেকে এই কথা আর একবার বোঝা যায় যে পাঠকমাত্রেই "নির্বোধ" নয়।

॥ চার ॥

তবু যতই আসর জমানো হোক গত বছরের উপন্যাসের তালিকায় কেরি সাহেবের মুন্সি জাতীয় রচনা আর নেই বললেই হয়। আমাদের এ আলোচনার

প্রারম্ভেই আমরা বলেছি যে গত বছরের বাংলা উপন্যাসের প্রধান ঝোঁক ছিল সমকালীন জীবন চিত্রণের দিকে। অন্তত প্রকাশিত উপন্যাসের তালিকার দিকে তাকালে এটা মনে হবেই যে বিগত শতাব্দীর মোহ, অপরিজ্ঞাত অঞ্চল চিত্রণের মোহ কাটছে। আপাতত এটুকুকেই আমরা সুস্থ লক্ষণ বলব। সমকালীন জীবন চিত্রণে লেখকদের যে সীমাবদ্ধতা এখনো রয়েছে তাকে কাটিয়ে নিজ নিজ শিল্পকর্মের সার্থকতায় উপনীত হবেন এ আশা নিশ্চয় পোষণ করি—যখন তা হবে তখন 'আপাতত এটুকুকেই'—এ দুটো কথা বাদ দেব।

সমকালীন জীবন বলতে প্রধানতঃ কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনই বোঝাচ্ছে। অন্তত তালিকা দেখলে তাই মনে হয়। একমাত্র সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া'ই এ বিষয়ে বোধ হয় একক ব্যতিক্রম। নিঃসন্দেহে সুবোধ ঘোষের শতকিয়া গত বছরের একখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। কিন্তু যতটা সুবোধবাবুর লেখা বলে উল্লেখযোগ্য ততটা উপন্যাস বলে নয়। আমার ধারণা সুবোধবাবু এবং অচিন্ত্যবাবু বাংলাদেশের দুজন ঔপন্যাসিক—উপন্যাস যাদের মেজাজে আদপেই নেই। এঁরা দুজনেই আসলে ধর্মতঃ ছোট-গল্পকার। ছোটগল্পের টানই এঁদের লেখার মধ্যে অধিক পরিস্ফুট। এর প্রমাণ হিসেবে দুটো তথ্য সরবরাহ করা চলে। এক, এঁদের ভাষা, দুই এঁদের উপন্যাসের বিন্যাসরীতি। এঁরা দুজনেই যে ভাষায় ছোটগল্প লেখেন হুবহু সেই গদ্যরীতিতেই উপন্যাস লেখেন। উপন্যাসের গদ্য এবং ছোটগল্পের গদ্য বলতে পৃথক কিছু আছে কিনা সে তর্কে না গিয়েও বলা চলে যে এঁদের গদ্যের চটপটে ভঙ্গি এবং অতিরিক্ত তৎপরতা ছোটগল্পের পক্ষেই সুপ্রযোজ্য, উপন্যাসের পক্ষে নয়। এ-বছরে প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমারের 'রূপসীরাত্রি' পড়লে এ ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়। প্রবাদ-প্রবচনময় বাংলার গদ্যরীতি কাঠখড়-কেরোসিনের পক্ষে যতটা সুপ্রযুক্ত হয়েছিল রূপসী-রাত্রির পটে তা ব্যর্থ। এবং যে কল্পনাগত অসংগতি থেকে এই গদ্যরীতির উদ্ভব তারই আর এক প্রকাশ উপন্যাসের বিন্যাসে। লুডোর ছকের প্যাটার্নে উপন্যাসটি বিধৃত। বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন রঙের ঘুঁটি। শেষ পরিচ্ছেদটি লুডোর মাঝখানের 'হোম'। ফলে ঘরে ঘরে ঘুঁটিগুলো সাজানো আছে কিন্তু যেন পরস্পর সম্পর্কহীন। কাজেই আট নম্বর পরিচ্ছেদের হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার সঙ্গে নলিনেশ সরকার অধ্যাপক ছাত্রীর প্রেমের অতি বিস্তৃত বর্ণনার সম্পর্ক কী বোঝা গেল না। সব ঘটনাগুলোই এক একটা ছোটগল্প—শেষটা সব মিলিয়ে একটা ছোটগল্পেরই বুনোন।

শতকিয়ায় অবশ্য ঔপন্যাসিক-লক্ষ্য আর একটু স্থির। বলা যেতে পারে যে সুবোধবাবুর পূর্ববর্তী রচনার থেকে এ বই অনেক বেশি উপন্যাসধর্মী। যে সামগ্রিকতার সন্ধানে অচিন্ত্যবাবু শেষ পর্যন্ত তাঁর উপন্যাসটিকে এলোমেলো করে ফেলেছেন সুবোধবাবুর রচনায় ততটা বিশৃঙ্খলা ঘটেনি। অবশ্য এও ঠিক, দাশু মুরলী এবং পলুস হালদারের যে গল্প এ উপন্যাসের বিষয় তার সঙ্গে উপন্যাসের পৃথুলতার কোনও সম্পর্ক নেই। বড়গল্পে সুবোধবাবুর হাত এখনো চমৎকার—মিঠে, প্রেমের গল্পগুলো তার প্রমাণ—যেমন 'শুন বরনারী।' বস্তুত দাশু মুরলী এবং পলুস হালদারের গল্পও একটা গল্পই। বৃহৎ উপন্যাসের পৃথুলতা আনতে গিয়েই কিছু অপ্রয়োজনীয় জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে। গল্পটি দাশু অথবা মুরলী একজন কারো হলে পলুস হালদারের আখ্যান আরো বেশী শিল্পকর্মের দিক দিয়ে ফলপ্রদ হত। যন্ত্রযুগের প্রবেশ এবং পলুস রিচার্ড মুরলী দাশুর সত্তার আলোড়ন উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি।

বস্তুত গত কয়েক বছরের বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় একটা কথা স্পষ্ট। তা হল, আমাদের ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি যে কারণেই হোক বিষয়গত সামগ্রিকতা অর্জনের দিকে গিয়েছে। বৃহৎ উপন্যাসগুলির প্রকাশ সে কথাই প্রমাণ করে। শুধু শতকিয়া বা রূপসীরাত্রি নয় বনফুলের গত বছরে প্রকাশিত জলতরঙ্গও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। বনফুলের উপন্যাস বরাবরই চরিত্রপ্রধান। পটভূমি অপেক্ষা চরিত্রকল্পনাতেই বনফুলের আগ্রহ সমধিক। পটভূমির দিকে সম্যক দৃষ্টি না দেওয়ায় চরিত্রকল্পনায় বনফুলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনেক সময় আতিশয্যের দ্বারা চিহ্নিত। তাই বনফুলের নায়কবৃন্দের মধ্যে শঙ্কর ব্যতীত সকলেই অন্তর্দ্বন্দ্ব রহিত দ্রষ্টামাত্র। তাঁর ভালরা খুবই ভাল, তাঁর কবিরা কেবলই কবি, শিল্পীরা মাত্র শিল্পী। খারাপেরা খুবই খারাপ। 'জলতরঙ্গ'ও এই চিহ্নগুলি থেকে মুক্ত নয়। 'জলতরঙ্গ' গ্রামের অধ্যায় এবং শহরের অধ্যায়ের মধ্যে যে সংঘাতের সম্ভাবনা ছিল লেখক তাকে ব্যবহার করলেন অত্যন্ত সরলভাবে। নিজের প্রিয় চরিত্রগুলিকে বাচাতে গিয়েই এই বিভ্রাট হয়েছে। ফলে বহু সন্তান প্রসবক্লান্ত জননীর মনোবিকার (হেমন্ত-সত্যবতী অধ্যায়) মাত্র প্যাথোলজিকাল কেস হয়েই রইল—রইল উপন্যাসের মূলবৃত্তের বাইরের ব্যাপার হিসেবে। নায়িকা বর্ণনার কৃচ্ছ্রসাধনা তাই অনেকটা সৌখিন বলে মনে হয়েছে। বনস্পতিদের সমস্যাও নতুন হতে গিয়েছে বটে কিন্তু কোনও তাৎপর্য সৃষ্টি করতে পারেনি। সে কারণেই বৃত্তপূর্ণ হলেও টোটালিটি আসেনি।

আসলে টোটালিটি শিল্পকর্মের অঙ্গীভূত ব্যাপার। টোটালিটি স্বয়ং কোনও শিল্পকর্ম নয়। 'জঙ্গমে'র বিপুল পরিসরেও এ সামগ্রিকতা আসেনি। গৌণ পটভূমিতে বহু চরিত্র সমাবেশ আসলে শেষ পর্যন্ত চরিত্র চিত্রশালাই হয়। প্রকৃতপক্ষে পটভূমি এবং ব্যক্তি উভয়কে মিলিয়ে যে সমগ্র চেতনা (যেটা বরঞ্চ আমরা তারাশঙ্করেই সমুপস্থিত দেখেছি) বনফুলের স্বভাবে সেটা নেই।

॥ পাঁচ ॥

শতকিয়া ছাড়া গত বছরের বেশির ভাগ উপন্যাসই মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনকে অবলম্বন করেছে। মধ্যবিত্ত এবং প্রায় ক্ষেত্রে কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনকেই আমরা গত বছরের বাংলা উপন্যাসের পটভূমিকায় বেশি খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু গত পাঁচ-ছ বছর ধরে মধ্যবিত্ত জীবনের যে রূপ আমরা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করছিলাম, এ বছরে প্রকাশিত উপন্যাসগুলিতে বিধৃত জীবনের রূপ তা থেকে পৃথক। মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে লেখা হচ্ছে এটা এমন কিছু আনন্দের কথা নয়। জীবনকে যে রূপকে, জীবনকে যে আলোকে এই ঔপন্যাসিকেরা ধরতে চাইছেন এইটেই স্বাস্থ্যকর বলে বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। গত কয়েক বছর আগে প্রকাশিত চেনামহল, মোমের পুতুল, বারো ঘর একটি উঠান যে জাতীয় জীবনবীক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা মূলতঃ যুদ্ধোত্তর বাঙালী মধ্যবিত্তের অবক্ষয়সঞ্জাত। চেনামহলই এ প্রসঙ্গে শক্তিমান লেখকের হাতে চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করেছিল। অবশ্য অবক্ষয়কে চিত্রিত বা শিল্পস্থ করা কোনও মহাপাতক নয়, যদি যিনি অবক্ষয়ের চিত্রকর হবেন তাঁর নিজের কাছে জীবনের স্থিরাদর্শ সুস্পষ্ট থাকে। রেমার্কের তিন বন্ধুতে যুদ্ধোত্তর জার্মানীর অবক্ষয় অতখানি বেদনাবহ চিন্তাবহ বলে আমাদের কাছে যে মনে হয় তার কারণ মানবিক মূল্যবোধের একটা বৃহৎ তাৎপর্যে ঐ অবক্ষয় ধৃত ছিল। উপন্যাসটির প্রেমকাহিনীই সেই নৈতিক গূঢ়ার্থের ধারক। উপরে কথিত উপন্যাসগুলিতে সেই বোধের অভাব সুস্পষ্ট। সে কারণেই শিল্পকর্ম হিসাবে এদের দুর্বলতা। কখনো কখনো একথা মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে উক্ত অবক্ষয়কে পাঠ করবার অক্ষমতা থেকেই বাংলা উপন্যাসে পটভূমির অভিনবত্বের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল।

কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে অবক্ষয় যত নিদারুণই হোক না জীবনে এবং সে-কারণেই সাহিত্যেও—কোথাও কিছু ইতিবাচকতা উপস্থিত থাকেই।

এটা সমাজ প্রগতির মূলীভূত সত্য। চেনামহল প্রমুখ উপন্যাসের পাশাপাশি তখন আর দুটি-একটি উপন্যাস আমাদের সামনে ছিল। লেখকেরা তরুণ। লেখায় নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধতাও বেশ কিছু ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র নিজ মননসিদ্ধ দৃষ্টিতে একটা গভীরতামুখী মনোভঙ্গি লেখক দুজন সৃষ্টি করেছিলেন এই উপন্যাসে। বই দুটি হল অসীম রায়ের 'একালের কথা' আর সুশীল জানার 'সূর্যগ্রাস'। একেবারে উঁচুতলার শিল্পসৃষ্টি কিছু না হলেও ঔপন্যাসিকের গভীর জিজ্ঞাসার চিহ্ন বইদুটিতে আমরা পেয়েছি। আজ এ উপন্যাস দুটির কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে এই কারণে যে এখন এমন অনেকগুলি উপন্যাসের দেখা আমরা পাচ্ছি যেগুলি কোনও না কোনও দিকে গভীরতার লক্ষণে চিহ্নিত। বিশেষ করে 'একালের কথা' এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ ছয় ॥

বিমল করের 'দেওয়াল' উপন্যাস সাম্প্রতিককালে সে হিসাবেই দায়িত্বশীল রচনা। যে হতাশা, যে শূন্যতাবোধ গত কয়েক বছরের সমকালাশ্রয়ী বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে রাজত্ব করছিল দেওয়াল তার বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। যুদ্ধের কলকাতার পটভূমি এ উপন্যাসের প্রধান বিষয়। সেই বিস্তৃত পটভূমিতে ধৃত চরিত্রগুলির মধ্যে নায়িকা সুধা আপন আপন স্বাস্থ্যবান মনের নানা ঘাতে-প্রতিঘাতে, নানা সমস্যায় নিজেকে এবং পরিবেশকে নানা দিক দিয়ে মেলাতে চাইছে। দেওয়াল পড়ে যে কোনও পাঠকেরই এই ধারণা হবে যে জীবন কোনও সময়েই শূন্যকুম্ভ নয়। 'জীবন শূন্যকুম্ভ নয়' গত এক বছরের বাংলা উপন্যাসের যদি কোনও পরিচয়-চিহ্ন থাকে তবে তা এই। পূর্ব পূর্ব বৎসরের অতীতানুসরণ—ডকুমেন্টারি জীবনালেখ্য রচনা এবং শূন্যাশ্রয়ী দর্শনপ্লুত বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় গত বছর এই দিক দিয়ে বলিষ্ঠ। বস্তুত সঠিকভাবে বলতে গেলে সমকালকে, তার বাস্তবতাকে যথার্থ ব্যাখ্যাতার মতো করে গত বছরের বাংলা উপন্যাস আমাদের কাছে উপস্থিত করেছে। বাস্তবতার উপরিতলশায়ী পরিচয়ের চেয়ে বাস্তবতার অন্তরাবগাহন শিল্প সৃষ্টির দিক দিয়ে অধিকতর মূল্যবান। দেওয়াল উপন্যাসের সৎপ্রচেষ্টা এই দিক দিয়েই অভিনন্দনযোগ্য। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত সমাজের নানা জিজ্ঞাসা আমাদের ঔপন্যাসিকদের যে পুনরায় আলোড়িত করছে এবং সমস্যা বলতে যে শুধু অসংগতি বা বিড়ম্বনাকেই বোঝায় না, জিজ্ঞাসা আরো গভীরে প্রেরণ করা

প্রয়োজন—এ কথা গত বছরের বাংলা উপন্যাসের অন্তত তরুণতরদের লেখায় প্রায় সর্বত্রই উপস্থিত। 'দেওয়াল', 'ত্রিধারা' বা 'পাকা ধানের গান' প্রমুখ রচনায় বৃহৎ উপন্যাসের টোটালিটির জন্য আয়াসের সঙ্গে সঙ্গে এ জিজ্ঞাসার বিদ্যমানতাও লক্ষ্য করার বিষয়।

অবশ্য সর্বত্রই এবং সর্বাঙ্গীনভাবেই এই জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরার চেষ্টা স্থির শিল্পবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তা নয়। ত্রিধারার কথা এ প্রসঙ্গে উঠতে পারে। মেয়েদের বিবাহিত জীবনের সমস্যা, বিবাহ-বিড়ম্বনার সমস্যা এই উপন্যাসের বেশির ভাগ স্থান দখল করে আছে। বিষয়বস্তু হিসাবে সেটা মোটেই সংকীর্ণ ব্যাপার নয়। নায়িকা সুমিতা রাজেনের মতো স্থিরচিত্ত রাজনৈতিক কর্মব্রতীকে ভালবাসল। নিজের দুই বড় বোনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সে মধ্যবিত্ত মানসের লোভাতুরতাকে পরাস্ত করল। বাইরের স্ববারি নয়, রাজেনের অন্তরস্থিত সুস্থ মানুষকেই সে ভালবেসেছে। এই চমৎকার বিষয়বস্তুকে লেখক নষ্ট করেছেন দুভাবে। এক, যে টোটালিটি লেখকের আয়ত্তের বাইরে তাকে ব্যবহার করতে গিয়েছেন। ফলে, নাইটক্লাবে সেপারেশনদগ্ধ স্বামী নিজ স্ত্রীকে একা পেয়ে ধর্ষণ করছে এমন ধরনের হাস্যকর ব্যাপারের সমাবেশ ঘটেছে। দুই, এইভাবে বর্ণাঢ্য করতে যাওয়ার ফলে মূল নায়কচরিত্র বা নায়িকাচরিত্রের সূত্রগুলিকে লেখক ভাল করে চিন্তা করেননি। তাই সুমিতা, রাজেন এবং রাজেনের মা সুচরিতা, গোরা, আনন্দময়ী হয়ে উঠতে গেছেন। কোনও সত্য প্রয়োজন ব্যতিরেকেই।

টোটালিটি আনতে গিয়ে উপন্যাসের চরিত্রাবলীর গভীরতা হারিয়ে ফেলা অবশ্য একা সমরেশবাবুরই ত্রুটি নয়। এ ত্রুটি অংশতঃ অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে। দেওয়াল উপন্যাসের নায়িকাচরিত্রের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন থেকেও একথা বলা চলে যে চরিত্রটি মাঝে মাঝে যে ত্রিমাত্রিকতা হারিয়ে ফেলেছে। তার কারণ বোধ হয় এই যে বিমলবাবু সুধার মনের উপর মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সর্বদা সমান দৃষ্টিশীল ছিলেন না। ফলে যে মহাযুদ্ধে আমরা বাধ্য হয়েই আন্তর্জাতিক হয়েছি সে মহাযুদ্ধ সুধার মনে কোনও নতুন শক্তি সৃজন করল কিনা সে সম্বন্ধে আমরা তেমন অবহিত হই না।

এইখানেই আমাদের সতর্কতার প্রয়োজন। বর্তমান বাংলা উপন্যাসের শিল্পসমস্যা শুধু সামগ্রিকভাবে ধরবারই সমস্যা নয়। এখন যে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের সদুত্তর পেলেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে তা হল লেখকের

অনুভূতির সততার প্রশ্ন, জীবন এবং বিন্যাসের প্রশ্ন। মাত্র বৃহত্ব নিয়ে কোনও মহৎ শিল্প রচনা সম্ভব নয়। সেই জন্যেই যখন দেখি যে দেওয়ালের লেখক ফানুসের আয়ু লেখেন অধিকতর সুকৌশলের সঙ্গে, অথবা বারোঘর একটি উঠানের হাতে নীলরাত্রি লেখা হয় অনেক মুক্ত এবং স্বচ্ছন্দভাবে তখন একটা সিদ্ধান্তে আমরা পৌছতে পারি যে সমগ্রতার জন্য আয়তনকে তলব না করেও মনের দর্পনের বিভিন্ন প্রক্ষেপে অনেক সময় সমগ্রের ব্যঞ্জনা আনা যায় অনেক বেশি। অন্ততঃ জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর নীলরাত্রি এ বিষয়ে একটা বড় প্রমাণ।

গত এক বছরের বাংলা উপন্যাসের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাবে যে লেখকদের প্রবণতা এই চেতনার প্রবাহের অনুভূতি পাঠক মনে সঞ্চারিত করার দিকে। বিষয়গত সামগ্রিকতা অর্জনের চেয়ে এটা ভাল কিনা সে প্রশ্ন মুখ্য প্রশ্ন নয়। বাস্তবের পূর্ণ চেহারা অপেক্ষা বাস্তবের পূর্ণ চরিত্রকে আনয়ন করাই এ জাতীয় উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য—সেটাই বড় কথা। মনের এক প্রকার ভাবশুদ্ধ অবস্থায় বাস্তবের প্রতিফলন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই এখানে উপজীব্য। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো প্রবীণ লেখক এবং জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তরুণেরা এই পথের পথিক। এঁদের এ-জাতীয় রচনা গুটিকতক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। প্রথম, প্লট বা আখ্যায়িকাংশের প্রথানুগত সাফল্যের উপর এঁরা নির্ভরশীল নন। কাজেই বাংলা উপন্যাসের গত কয়েক বছরের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি থেকে এঁরা মুক্ত। দ্বিতীয়, বিবরণের তন্নিষ্ঠ যথাযথতার চেয়ে নিজ অনুভূতিকে সঞ্চারিত করার দিকে এঁরা সযত্ন বেশি। ফলে উপন্যাসকে নিখুঁত শিল্পকর্ম হিসেবেই এঁরা গ্রহণ করতে পারছেন। এঁদের গদ্য, এঁদের কবিত্ব, এঁদের চিত্রণ ক্ষমতা তার প্রমাণ। তৃতীয়, জীবনের পূর্ণাদর্শ সম্বন্ধে এঁরা সচেতন বলেই (বিশেষ করে তরুণেরা) এঁদের লেখা এক নৈতিক তাৎপর্যে বিধৃত। শুধু শূন্য দর্শনে নিঃশেষ নয়।

সত্যি বলতে কি এখন বাস্তব অবস্থাও এ জাতীয় রচনার পক্ষে অনুকূল। নানা ভাঙনে নানা আঘাতে আমাদের চিত্তলোক এখন অনেক বেশি অনুভূতি-প্রবণ। টান করে বেঁধে-রাখা তারের মতো আজ তা সূক্ষ্ম স্পন্দনেও ঝঙ্কারময় হতে পারে। নানা প্রশ্ন, নানা অস্তিত্বগত সমস্যা, নানা ঘটনা এবং ঘটনাংশ চেতনার নদীর ওপরে রকমারিভাবে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। উপলব্ধির নানা আলোকের বিচ্ছুরণে সে-নদীতরঙ্গ আজ সমৃদ্ধ। ফলে বাস্তবের শুদ্ধ রূপ-কে

আঁকা এঁদের পক্ষে অনেকটা সহজসাধ্য। দ্রষ্টার নিরাসক্তি এবং কবির সহানুভূতি দুইই এ জাতীয় রচনায় মিলিত হতে পারে বলে অভিজ্ঞতার শিল্পান্বিত রূপ এবং লেখকের অনুভূতির কাব্য এখানে মিলতে পারে। সঞ্জয়বাবুর তিন চরিত্রের কথা অথবা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় ভুবন, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তর্মনা কিংবা মতি নন্দীর নক্ষত্রের রাতের কথা এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য। এঁদের শিল্পীমনের শুদ্ধতা সম্বন্ধে আমরা আশান্বিত হই যখন দেখি যে প্রচলিত চমকের সবপ্রকার প্রলোভন এঁরা কত অবলীলায় পরিহার করতে পারেন। জয়ন্তীর সঙ্গে আসাদের প্রেম-দৃশ্যের অবতারণা (তৃতীয় ভুবন) অথবা রমা এবং বিশ্বের প্রেমের পরিণতি নিয়ে সময়ক্ষেপণ (নক্ষত্রের রাত) কিংবা মাধুরী পরিতোষের বর্তমানের মোলাকাতের ভেতর দিয়ে একটা ছায়াচিত্র-সুলভ স্টান্ট রচনা (তিন চরিত্র)—এ জাতীয় কোনও কিছুই উপরোক্ত বই কয়েকখানিতে ঘটেনি। সে স্থলে জ্যোতির্ময়বাবুর শহরবাসী কিশোরের স্মৃতি বিচরণ, সঞ্জয়-বাবুর ঔপন্যাসিক পরিতোষের নিজের শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে বারবার নিজেরই মুখোমুখি হওয়া—মতি নন্দীর চিন্নুর জিজ্ঞাসা এবং দীপেন্দ্রবাবুর জয়ন্তীর স্কুল কলেজের অভিজ্ঞতার প্রতি মুহূর্তেই নিজেকে যাচাই করা, চেনা, অনেক বেশি শিল্পময়। আর আশ্চর্য কী চিত্তগ্রাহী স্নিগ্ধতায় এঁদের রচনা উজ্জ্বল! অন্তর্মনার সন্ধ্যার বাতি জ্বালানোর অংশ এবং নক্ষত্রের রাতের উৎসবাকুল নগর বর্ণনা এর উদাহরণ।

॥ সাত ॥

এবং এদিকে আশা করার অনেক কিছু আছে। গত কয়েক বছরের বাংলা উপন্যাসের একদিকে ছিল তারাশঙ্করের সুসার্থক নাট্যপ্রসাদযুক্ত দু-একখানি বড় গল্প (সপ্তপদী বিচারকের প্রসঙ্গ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়) আর একদিকে ছিল শিল্পগত নৈরাজ্য—চূড়ান্ত উদ্দেশ্যহীনতা। বাস্তব জীবনের যথাদৃষ্ট তালিকা। রিরংসা এবং মনোবিকার। শিল্পক্ষমতার অভাবপূরণের জন্য উগ্র ঝাঁজালো মশলার ব্যবহার। এ থেকে বর্তমান বাংলা সাহিত্য মুক্ত হতে চলেছে।

অভিজ্ঞতার অন্ত নেই। তার রূপ বহু, তার প্রকাশও বহু। মানুষকে জড়িয়েই এই অভিজ্ঞতা। মানুষকে জানার শেষ নেই বলেই অভিজ্ঞতারও কোনও অন্তসীমা নেই। সেই জন্যেই কী দেখেছি এ অহঙ্কার অর্থহীন। কেমন করে দেখেছি এটাই বড় কথা। বহু যত্নে বিরচিত কাগজের ফুল যতই দেখতে

ফুলের মতো হোক তা সৌরভহীন, কৃত্রিম। কখনো কখনো আমরা কোনও কোনও শিল্পে সাহিত্যে জীবনের সেই সুরভিসারের ঘ্রাণ পাই যা একান্তভাবেই সৃষ্টির কঠিন নিয়মে সঞ্জাত। বর্তমান বাংলা উপন্যাসের অতি সামান্য অংশে সেই সৃষ্টির কঠিন অনুশাসনকে প্রত্যক্ষ করেছি। সহজের মোহে এঁরা অবশিষ্ট নন বলেই সুলভ প্রশংসায় এঁদের বিব্রত করা ঠিক হবে না। শুধু আশা করছি এটাই জানালাম।

এক বছরের বাংলা কবিতা

কৃষ্ণ ধর

কবিতার মুক্তি

অধুনা বাঙালী পাঠকশ্রেণীতে কাব্যে এক গভীর অনীহার ভাব লক্ষ্য করা যায়। তার কারণ কবিতার বক্তব্যের সঙ্গে জীবনবাস্তবতার সাযুজ্যের অভাব। কাব্যতত্ত্বের বিচারে দেখা গেছে, হৃদয়সংবাদ ও কম্যুনিকেশনে সার্থক না হলে কবিতা স্থায়িত্বলাভ করতে অক্ষম। মানবসমাজের ট্রাইব্যাল যুগে, গোষ্ঠীবদ্ধতার যুগে, কবিতা হয়ে উঠেছিল জীবন-যুদ্ধের হাতিয়ার। প্রাক-ইতিহাসের এই সাম্যবাদী সমাজে কবিতার ছন্দ, গঠনরীতি, বক্তব্য ও সঙ্গীত স্বভাবতই সামাজিক মানুষের রিয়্যালিটিকে এক মন্ত্রমুগ্ধতার আবরণে প্রকাশ করে হৃদয়ের অনুচ্চারিত আকাঙ্ক্ষাকে, সমাজচৈতন্যকে বাস্তবে রূপায়িত করত। সমাজ যতই শ্রেণীবিভক্ত হয়ে যেতে লাগল, কবিতাও ততই বৃহত্তর গণজীবন থেকে সরে এসে সব চেয়ে প্রভাবশালী শ্রেণীর আওতায় আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল। প্রভাবশালী শ্রেণী প্রথম দিকে কাব্যের প্রয়োজন অনুভব করেছে। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা দিয়েছে শ্রেণীপ্রধানদের কাব্যবিমুখতা। সেই জন্যেই আজকের দুনিয়ায় দেখতে পাই ইংলণ্ডের সেক্সপীয়ারের সব চেয়ে বেশি সমাদর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে। ধনবাদী সমাজে শুধু সেক্সপীয়র কেন, রোমান্টিক যুগের কবিদেরও আজ কী অনাদর! শেলী, কীটস, বায়রনের হৃদয়ব্যাকুলতা প্রাণপ্রাচুর্যের উচ্ছল প্রকাশ ক্ষয়িষ্ণু ধনবাদী সমাজের শাসকগোষ্ঠীর কাছে কালের ইঙ্গিত বলে অবহেলিত। অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণী যে এই-কবিতা পড়ে উদ্বুদ্ধ হবেন, লাভ করবেন কর্মের উদ্দীপনা, ধনবাদী সমাজে শ্রমিকদের সংস্কৃতিচর্চার সে সুযোগও সীমাবদ্ধ। সমাজবাস্তবতার পরিপন্থী তারা রহস্যোপন্যাস কিংবা রক অ্যাণ্ড রোল নৃত্যের মাধ্যমেই শ্রমিকদের অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা শাসকগোষ্ঠী করে রেখেছেন।

আজকের বাংলা দেশে মানুষ কেন কবিতা পড়ছেন না এবং বাঙালী কবিরাই বা কেন উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখতে পারছেন না, তার কারণও মূলতঃ সামাজিক। শুধু গত এক বছর ধরে নয়, গত দশ বছর ধরেই কাব্যজগতে

এই আনুগত্যহীনতা লক্ষ্য করছি। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ চিরকালই কবিতাকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের স্থান দিয়ে এসেছে। কবির সমাদর এখনও গ্রামের মানুষের কাছেই সব চেয়ে বেশি ও আন্তরিক। আমাদের গ্রামের মানুষেরা দীর্ঘ শতাব্দী ধরে অনেক বিস্ময়কর কবিতা লিখে গেছেন। ময়মনসিংহ গীতিকায় পড়ি যে লোকগীতি শুনে দস্যু কেনারামের হৃদয় দ্রব হয়েছিল :

যখন গাহিলা পিতা মনসা ভাসান।
হাতের খন্তা ফেলাইয়া কান্দে কেনারাম॥

হৃদয়ের সৎ বিশ্বাস ও আকুলতাই ময়মনসিংহ গীতিকার 'তুমি হইও গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি', প্রভৃতি অবিস্মরণীয় ছত্রের জন্ম দিয়েছিল। আজকের যুগে যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে একথাই বলতে হবে যে আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রে এসেছে সংশয়। বক্তব্যে এসেছে কৃত্রিমতা!

কবিতা ভাষার ব্যায়াম বা ভাবের বোঝা নয়। বিস্ময়, আনন্দ ও যন্ত্রণা, এই ত্রয়ী বোধ থেকেই কবিতার জন্ম। এই সকল বোধই কবির হৃদয়জগতের স্তরগুলোকে করে তোলে বাঙ্ময়। এবং তখনই কবিতার জন্ম। কিন্তু কবি চিরকালই সামাজিক মানুষ। সমাজ-চৈতন্যকে স্বকীয় চৈতন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলেই তাঁর পক্ষে শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হবে। জর্জ টমসন বলেছেন :

'The function of poetry is still, as always, to withdraw the consciousness from the perceptual world into the world of fantasy. This world of fantasy is not, of course, a separate world from the real world , rather, it is the real world stripped of all accidental, unessential features so as to reveal its underlying movement." [Marxism and Poetry]

একথা তাই স্বীকার্য যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগত ও কবি-হৃদয়ের জগত দুটিই স্বতন্ত্র সত্তা। কিন্তু একেকে বর্জন করে অপরটি সক্রিয় হতে পারে না। যে কবি পরিদৃশ্যমান জগৎ ও সমাজ সম্পর্কে নিঃস্পৃহ, আত্মজগতে অন্তর্লীন, তিনি চিরকালই আগন্তুক (outsider)। তাঁর পক্ষে সমাজচেতনাকে কাব্যচেতনায় প্রকাশ করা সম্ভব হতে পারে না। যাঁরা বলেন কাব্য একান্তভাবেই ব্যক্তিগত, পাঠক সেখানে নিজের গরজে এসে সুর মেলাবে, আমি তাদের দলে নই। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকরা অত্যন্ত জোরালো এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন

যে কবিতা কখনই কবির একার বস্তু নয়। কবিতার লক্ষ্য সামাজিক মানুষ অর্থাৎ পাঠক।

অতএব কবিতাকে সমাজ থেকে, সামাজিক মানুষের গৃহাঙ্গন থেকে নির্বাসন দিলে সে কবিতার কোনো সামাজিক উপযোগিতা থাকতে পারে না। এবং সামাজিক উপযোগিতা না থাকলে সে কাব্যের রস কে আস্বাদন করবেন? সামাজিক উপযোগিতা বলতে অবশ্যই আমি কোনো ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন বোঝাতে চাইনি। বৃহত্তর সমাজ-চেতনা ও সামগ্রিক আকাঙ্ক্ষাই আমার বক্তব্য। এবং এ জন্যেই তো কবিদের 'unacknowledged legislators of the world' বলা হয়েছে। এত বৃহৎ ও মহৎ কবিত্বের ঝুঁকি নিতে যদি কেউ অসম্মত হন তাহলে তাঁকে আমরা 'কবিরেব প্রজাপতি' আখ্যা দেব কী করে? এবং এই বিশ্বাস ও দায়িত্ব পালনের আকাঙ্ক্ষা অবসিত হলেই কবির মনে হবে এই পৃথিবীটা আসলে 'পোড়ো জমি', এখানে শস্যের সম্ভাবনা তিরোহিত। তখনই অর্ধস্ফুট কণ্ঠে তাঁর কণ্ঠে গুঞ্জরণ উঠবে :

In this last of meeting places
We grope together
And avoid speech
Gathered on the beach of the humid river.

[T. S. Eliot : Waste Land]

এই নির্বাকপুরে কবির আর কোনো প্রয়োজনই থাকতে পারে না। কিন্তু আমি মনে করি বিশ্বাস হারানোই কবির পক্ষে সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য। যন্ত্রণা, দুঃখ ও অশ্রু দিয়ে মানুষের জীবন যেদিন জন্ম নিয়েছিল, সেইদিনই কবি তার গীতিকারের দায়িত্ব নিয়েছিল। কবির দায়িত্ব কী, সর্বকালের মহৎ কবি গ্যেটের ভাষায় তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। *গ্যেটে বলছেন, প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে কান্না ;* যন্ত্রণায় মানুষ অধীর। এবং সবচেয়ে বেশি আমি। কিন্তু আমাকে সে দিয়েছে ভাষা। দিয়েছে সুর। যাতে আমার বেদনার গভীরতার কথা জানাতে পারি বিশ্বজগতকে। যন্ত্রণাকাতর মানুষ যখন নির্বাক হয়ে যায়, তখনই ঈশ্বরের দেওয়া সুরে আমি যন্ত্রণাকে ভাষায় রূপ দিই।

বাংলা কবিতার আলোচনাতে এই মুখবন্ধটুকু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ কবিতার দুর্গতি আজ শুধুমাত্র বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ নয়, সর্বত্রই এর ক্ষয়িষ্ণুতা, অনাদর ও উপেক্ষা কাব্যরসিকদের বেদনার কারণ হয়েছে। অনেকে বলবেন

বিজ্ঞানই কবিতাকে জীবন থেকে নির্বাসিত করছে। কিন্তু একথা ঠিক নয়। মহান গোর্কির ভাষায় 'Science creates a 'second nature' from without, art creates a 'second nature' from within ourselves.'

শিল্প ও বিজ্ঞান তাই পরস্পর-বিরোধী নয়, তারা পরস্পরের সম্পূরক। বিজ্ঞানের অগ্রগতি কবিতার দুর্গতির কারণ নয়, তার আসল কারণ কবি প্রকৃতির ক্ষয়িষ্ণুতা, অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক মানুষ থেকে তার পলায়নী মনোবৃত্তি।

এই বিড়ম্বিত যুগে, বুর্জোয়াশাসিত পৃথিবীতে কবির সামাজিক মর্যাদা পরিবর্তিত হয়েছে। এককালে আমাদের দেশের কবিরা রাজসভায় সমাদার লাভ করতেন। সামন্তযুগে কবিদের প্রতিপত্তি ও সম্মান একেবারে ক্ষুণ্ণ হয়নি। চারণকবিরা গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে, আবৃত্তি করে কবিতাকে পৌঁছে দিতেন নিরক্ষর মানুষের হৃদয়ে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও শিল্পবিপ্লবের প্রসারে কবিতা আবৃত্তির সে পাট চুকেছে। ফলে কবিতার যারা রসগ্রাহী, সেই নিরক্ষর জনতা আর কবির মুখ থেকে কবিতা শুনতে পায় না। ধনবাদী সমাজে শিক্ষার প্রসারও এত ব্যাপক নয় যে সাধারণ মানুষ বই পড়ে কবিতার রসোদ্ধার করতে পারেন।

অন্যদিকে বৈশ্যযুগের শাসকশ্রেণীর কাছেও কবিতা অনাদৃত কারণ কবিতার বক্তব্য আর তাদের শোষণ-নীতির পরিশোধক নয়। ধনবাদী সমাজে কবিতা পণ্যে পরিণত কিন্তু নিরক্ষর ও অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণ এবং শাসক-শ্রেণী উভয়ের অনাদরের ফলে কবিতার বাজার ও চাহিদা সীমাবদ্ধ। এবং কবিতা-লেখক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হৃতমান নৈরাশ্যে পুরোপুরি শ্রেণী-চেতনা বিসর্জন দিয়ে এখনও বৃহত্তর শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে হাত মেলাতে দ্বিধাগ্রস্ত। ফলে তাঁদের কবিতায় প্রাণের উত্তাপ নেই। সমাজের বৈপ্লবিক আকাঙ্খাকে তাঁরা কাব্যে রূপায়িত করতে ভীতিগ্রস্ত। বুর্জোয়া কবিদের কবিতা আজ জনতার কবিতা তো নয়ই, কোনো শ্রেণীবিশেষেরও নয়, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভ্রান্তিবিলাস ও আত্মরতি। যদি এই কবিকুলের চেতনার গুণগত পরিবর্তন না হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতেই এঁদের কবিতার রূপকর্মে কেবল এঁদের নিজেদের কথারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। বৃহত্তর সমাজচেতনার কোনো চিহ্নই সেখানে পাওয়া যাবে না। প্রকৃত বিচারে অবক্ষয়মান ধনবাদী কালচারই কবিতার এই অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী।

কবিতার সমস্যা

বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিককালের কবিতা নিয়ে খণ্ডিত আলোচনা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। কিন্তু সে আলোচনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কে কী লিখছেন, এ নিয়ে আলোচনায় কখনোই কবিতার মৌল সমস্যা উদ্‌ঘাটিত হতে পারে না। কবিতার সমস্যা আজ আমাদের সমাজেরই সমস্যা। বাংলা সাহিত্যে যাঁরা কবিতা লিখছেন তাঁদের শ্রেণীগত স্বরূপ কী? এঁদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত, নাগরিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর। কেরানি, মাস্টার, সাংবাদিক—এরাই হলেন এ যুগের কবি। স্বভাবতই তীব্র শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এঁদের কবিসত্তা নিদারুণভাবে বিড়ম্বিত। এঁদের জীবিকার জগৎ আর কবিতার জগতে আকাশপাতাল ফারাক। এবং সে ফারাক আরও তীব্র এঁদের পরিবেশে। নগরজীবনে যে পরিবেশে কবিকে বাস করতে হয়, যে পরিবেশে ও যে লাঞ্ছনা হজম করে তাঁদের জীবিকার্জন, এতে সমাজচেতনা তীব্রতর হওয়াই স্বাভাবিক। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, বৃহত্তর সমাজজীবনে আজ দ্বন্দ্ব ক্রমশই প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ স্তরেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই ব্যবহারিক বস্তুজগতের অভিজ্ঞতাই প্রত্যেক সৎকবিকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে নির্বাক মানুষের পক্ষে কথা বলবার মহৎ প্রেরণা দেয়। বাংলা দেশে অন্ততঃ দৈনন্দিন জীবনেই এই যন্ত্রণাময় বাস্তব স্পর্শকাতর কবিমনকে শাণিত করে তোলবার প্রচুর সুযোগ দিয়েছে। বাংলা কবিতায় তাই সাম্প্রতিককালে অনেক বিচিত্র মননের সুর শোনা গেছে। এটা অবশ্যই আমার কথা। কারণ ইতিহাস-চেতনা থেকেই আসে সমাজবাস্তবতার প্রতি অন্তর্দৃষ্টি এবং শিল্পকর্মে তাকে প্রতিফলিত করবার প্রেরণা।

বাঙালী কবিদের এটা সৌভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের মতো একজন কালোত্তর স্রষ্টার বিচিত্র কাব্যকর্মের দৃষ্টান্ত তাদের সামনে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এখন আমাদের ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের বিশাল কাব্যচিত্রশালার সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করেছি, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে জনজীবনের যে মহৎ চেতনা উপস্থিত ছিল, পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক কয়েকজন বাদে, তার লক্ষণ দেখা যায় নি। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় যদি কিছু গলতি থাকে, তা হল এই বিশ্বাসের, প্রতিশ্রুতির।

কবিতায় দেশজ উপকরণকে আঙ্গিকে ও বক্তব্যে মিশিয়ে দেবার যে ক্লাসিক দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথে আমরা পেয়েছি, সাম্প্রতিক কবিরা তার থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। আধুনিক কবিদের ক্ষমতার অভাব আছে একথা বলব না,

অভাব তাঁদের বিশ্বাসের। বিড়ম্বিত জীবনে এরা যেন উত্তরাধিকারচ্যুত (disinherited)। এবং ফলে একান্তভাবে দিশেহারা। কাব্যে এই বাস্তবতাই এ-যুগের জিজ্ঞাসার উত্তর। ব্যক্তিগত মননে জগতের যথার্থ প্রতিফলনেই সৎ কবিতা সৃষ্টি হয়। এবং এই ধরনের সৎ কবিতাকেই বলব প্রগতিশীল কাব্য-আন্দোলনের প্রতীক। একশ্রেণীর সমালোচক প্রগতিশীলতার মধ্যে পালিটিক্সের গন্ধ খুঁজে পান। অথচ কোনো মানুষের পক্ষেই পলিটিক্সের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। পলিটিক্স শুধুমাত্র রাষ্ট্রনীতি নয়, এর মধ্য দিয়েই জীবনদর্শন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যে সমস্ত কবি এতকাল নারীর জঙ্ঘা আর স্তনসন্ধির ঐন্দ্রজালিক স্পর্শকাতরতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতার বন্দনা করেছেন, তাদেরও তো দেখেছি হাঙ্গেরীর ফ্যাশিস্তদের পক্ষ হয়ে প্রচুর হৈচৈ করতে। পলিটিক্স থেকে তো তাঁরাও বাদ যান না।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় এই দুই ধরনের পরীক্ষাই লক্ষ্য করছি। কিন্তু জনজীবনের সত্যকে কাব্যসত্যে রূপায়ণের প্রচেষ্টাই, অভিনন্দিত হবে, এ আশা আমরা করতে পারি। ব্যক্তিগত কবিতা বলে কোনো শিল্পকর্মের অস্তিত্ব নেই। কবিতা শুধুমাত্র আবেগের প্রক্রিয়াই (emotional process) নয়, এটি একান্তভাবেই সৃজনী প্রক্রিয়া (creative process)। হাওয়ার্ড ফাস্টের কথা উদ্ধৃত করে তাই বলব : There is no subjective art. In order to exist as art in the whole sense, the writer's product must form a bridge of communication between himself and his reader. [Literature and Realitry]

কবিতা মুখ্যতই কবি ও পাঠকের মধ্যে হৃদয় সংবাদের সেতু।

যারা জীবনবিমুখ, সমাজবাস্তবতায় ভীত, তারাই ফর্ম্যালিজমের ক্ষয়িষ্ণু কায়াকে আঁকড়ে ধরে বিশুদ্ধ সাহিত্য বা 'পিওর পোয়েট্রি'র সাধনা করছেন। জীবনই একমাত্র সত্য। অতএব জীবনকে বাদ দিয়ে 'পিওর পোয়েট্রি' রচিত হতে পারে বলে বিশ্বাস করি না। যাঁরা তা করছেন, তাঁরা শুধু পাঠককে নয়, নিজেদেরও প্রবঞ্চিত করছেন।

সাম্প্রতিক কবিতা

গত এক বছরের বাংলা কবিতার দিকে তাকালে আমরা এই দুটো ধারাই লক্ষ্য করি। তবে যতটা আশা ও প্রেরণা দিয়ে আমাদের নতুন কাব্যান্দোলন

শুরু হয়েছিল, কবিরা সে আশা রক্ষা করতে পারেননি। সামাজিক স্তরে হতাশা এবং নৈরাশ্যকে এর কারণ বলতে দ্বিধা হয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ ও অরুণ মিত্রের কবিতায় একই লক্ষ্যবস্তুর জন্যে ত্রিবিধ পরীক্ষা সোৎসাহে অভিনন্দনযোগ্য। এঁরা তিনজনেই বয়সের দিক দিয়ে এবং কাব্যানুশীলনের দিক দিয়ে অগ্রজের সম্মান দাবি করতে পারেন। সৃজনধর্মী কবির চেতনা কীভাবে ক্ষুরধার তীব্রতা লাভ করে সমাজবাস্তবতার প্রবল আলোড়নে এই তিনজনের কবিতায় তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। অথচ এই তিনকবি ভিন্ন মেজাজের এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মধ্যবিত্ত সমাজের অংশ হয়েও এঁরা শ্রেণীচ্যুত চেতনাকেই কাব্যে রূপায়িত করে বৃহত্তর জন-সমাজের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে কাব্যে রূপায়িত করছেন।

বিষ্ণু দের কবিচিত্তে আজ আর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। বক্তব্যে তিনি স্পষ্ট, আঙ্গিকেও তিনি নিয়ত পরীক্ষার্থী। তিনি তাই বলেন:

আমরা সৃষ্টির কবি, জীবনের নির্মাণের গান
আমাদের নিদ্রাহীন স্বপ্নে জলে প্রাণের কংক্রিটে
তৃপ্তিহীন আমাদের কাজে চলে, মৃত্যুঞ্জয় দান
জীবনের কবিতার প্রাণের গ্রানিটে
আকাশের ঐক্যে আর বাংলার বাতাসে সন্ধান
ঘাটে ঘাটে খুঁজে পাই, মাঠে মাঠে খড় আর ইটে
আমরা দেশের প্রাণ, প্রাণ কোথা ইঁদুরে বা কীটে?
জনতাই জীবনের এদেশের অসীম প্রমাণ
আকাশে মাটিতে গাড়ি ভিটে

[আলেখ্য : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়]

বস্তুসত্য (objective truth) এখানে কাব্যসত্যে একাত্ম হয়ে পাঠকের মনে এক দুর্জয় প্রেরণা সঞ্চার করে। এবং এ জন্যই একে বলব সার্থক কবিতা। বিমলচন্দ্র ঘোষকে অনেকে উচ্চকণ্ঠ কবি বলেন। তাঁর কবিতায় 'পাসন্যাল পোয়েট্রির' স্বাদ কম। এ কথা স্বীকার করেও বলব তিনি সৎ ও আন্তরিক। আঙ্গিকের চোরাবালিতে তিনি ডুবে না গিয়ে বহির্চেতনায় নিজেকে সার্থকভাবে প্রকাশ করে চলেছেন:

খুঁজেছি সারাটা রাত তোমায় খোঁজার তেপান্তরে
কলমে ভাস্বতী হলে, 'থাক বা না-থাক এ সংসারে'

বলা তো হত না। ধ্রুব তারকার উদীচী অম্বরে
পথের নির্দেশ খুঁজে ; যে পথের অনন্ত বিস্তার—

রক্তঘাম-কান্নাঝরা, কবে সে অদৃশ্য কালান্তরে
স্বাশ্রয়ী ফলাবে শস্য ? কষণে মননে অঙ্গীকার
এনে দেবে জীবকোষে ; বহিরঙ্গ তোমার অন্তরে
আমারি দ্যোতনাময় প্রতীকের জাগাবে ঝঙ্কার !

[দৈর্ঘ্য হয় দীর্ঘতম]

এ কবিতায় নিঃসন্দেহে কবির ব্যক্তিচেতনা গণচেতনার সমুদ্রে এসে মিশেছে। এবং কবি সতর্ক প্রহরীর মতোই তাঁর এই চেতনাকে শানিত রেখেছেন এক মহৎ অঙ্গীকার পূর্ণ করবার প্রত্যাশায়।

অরুণ মিত্রের সাম্প্রতিক কবিতায় ফরাসী মেজাজ এসেছে। ফরাসী কাব্যের তিনি একজন বিদগ্ধ অনুরাগী। হয়তো ফরাসী কবিদের সঙ্গে তিনি তাঁর আত্মিক মিল খুঁজে পেয়েছেন। ইয়োরোপে ফরাসী কাব্যের মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা অন্যত্র অল্পই হয়েছে। এবং হলেও তা ফরাসীকাব্যেরই প্রভাবে। তাঁর কবিতার স্বপ্নময় চিত্রধর্মিতা আশ্চর্য গল্প বলার মতো ক্ষমতা রাখে। আঙ্গিকের দিক দিয়ে 'লিপিকার' সঙ্গে সাদৃশ্য বোধ হলেও, বক্তব্যে তিনি একালের চেতনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এবং সে চেতনা নিঃসন্দেহে জনজীবন থেকে আহৃত। 'পরিচয়ে' প্রকাশিত 'যাত্রী' কবিতাটিই তার প্রমাণ :

'এক্কাগাড়ির ঘোড়া পা তুলল, এখনই চলতে আরম্ভ করবে। সওয়ারীরা এতক্ষণ উসখুস করছিল, এই ভঙ্গিটা টের পেয়ে তারা জমাট হয়ে বসল। একগলা ঘোমটা-টানা বউ, জোয়ান মরদ, ছেলেবুড়ো সকলে। তারা এখন যাবে কুহকের দেশে।……'

ভাষার দিক দিয়েও অরুণ মিত্রের এই পরীক্ষা সাগ্রহে লক্ষ্য করবার মতো। 'আটপৌরে' ভাষাকে কবিতার বাহন করতে পারলে জনতার আরও কাছাকাছি পৌঁছনো যাবে। কবিতার পাঠক ও শ্রোতাও তখন বাড়বে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে প্রত্যেক আলোচনাতেই আনতে হয়। তার কারণ তিনিই তরুণতরদের মধ্যে অগ্রজ। এবং আঙ্গিক ও কাব্যবস্তু নিয়ে তিনি খুবই সাহসিক পরীক্ষা করে থাকেন। যদিও তিনি সংখ্যার দিক দিয়ে আজকাল

খুব বেশি লিখছেন না, তাঁর প্রতিটি কবিতাই এক একটি নতুন অভিজ্ঞতায় জীবনবাস্তবকে কাব্যসত্যে রূপায়িত করে।

বাংলা কবিতার নবজীবনের আন্দোলনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সবচেয়ে পরিশ্রমী কবি। জীবনসত্যকে তিনি কাব্যসত্যে রূপায়িত করবার প্রচেষ্টায় আঙ্গিক নিয়ে, কাব্যবস্তু নিয়ে কবিতার শরীরে অনেক কোমল কঠোর অলংকার এনেছেন, কখনো বা তাকে করেছেন নিরলংকার। কখনো তিনি নির্বাক রয়েছেন। তবুও জনপ্রিয়তার তরল মদিরায় গা ভাসিয়ে দেননি। সাম্প্রতিক কালে তাঁর কবিতা দক্ষ চিত্রকরের ব্রাশওয়ার্কের মতো, ঋজু, সংহত, শাণিত। বাহুল্য তিনি বর্জন করেছেন। চিত্রকল্পতার মোহমুক্ত হবার তিনি প্রয়াসী। তাঁর কবিতা পাঠ এখন কথকতার আসরের কথা মনে করিয়ে দেয়। সব সময়েই যে তিনি এতে সাফল্য লাভ করেছেন একথা বলব না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেন তিনি অস্পষ্ট, অমূর্ত। তবুও তাঁর এই কাব্যপরীক্ষা সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার এক বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের দাবি নিয়ে এসেছে.

বুকের বাঁ পকেট সামলাতে সামলাতে,
হায় হায়,
তার ইহকাল পরকাল গেল।
অথচ আর একটু নিচে হাত দিলেই
সে পেত আলাদীনের আশ্চর্যপ্রদীপ.
তার হৃদয়।

[লোকটা জানল না]

নিষ্পেষিত মানুষের জীবনযন্ত্রণার একটি তির্যক চিত্র। এর ভাব ও ভাষা, বাক ও অর্থ পার্বতী পরমেশ্বরের মতোই সম্পৃক্ত। বস্তুজগতের চেতনা অন্তর্জগতে প্রবেশ করে সমীকরণে সার্থক হলেই এ ভাষায় কবিতা রচনা সম্ভব।

প্রবীণতরদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখরা নিজেদের পুনরাবৃত্তি করছেন। জীবনস্রোতকে তাঁরা সযত্নে পাশ কাটিয়ে চলেছেন। ত্রিশের যুগে যে রোমান্টিক বিদ্রোহে পুরনো বিশ্বাসের ভিত্তিতে এঁরা ফাটল ধরিয়েছিলেন, দুঃখের বিষয়, এ যুগে তাঁরা সেই পুরনো মদই নতুন বোতলে ঢেলে পরিবেশন করতে চাইছেন। ফলে আসর জমছে না। বিষণ্ণ ক্লান্ত কণ্ঠে এঁদের এখন বলতে শুনি : 'আমার প্রেম রেখে এলেম ঈশ্বরের হাতে'।

তরুণতর কবিদের সম্পর্কে আমার অভিযোগ আছে। এঁদের অনেকেই আমার বন্ধু ও সমসাময়িক। দশ-বারো বছর আগে যে জ্বলন্ত বিশ্বাস আর পরিশুদ্ধ কাব্যচেতনা নিয়ে এঁরা বিশেষ বক্তব্যের জন্যই কবিতাকে বেছে নিয়েছিলেন, আজ অনেকেই সেই বক্তব্য বিস্মৃত হয়ে মুহূর্ত বিলাস কিংবা অভ্যাসবশে কবিতা লিখে চলেছেন। কবিতার চাহিদা কম, সেজন্যে বাজার-দরে কবিরা তাঁদের কাব্যপণ্য বিক্রি করছেন। পত্রিকা-সম্পাদকদের মুখ চেয়ে কবিতার মেজাজও স্বচ্ছন্দে পালটাচ্ছেন। এরা সকলেই খণ্ডিত প্রতিভার অধিকারী। সুকান্তের মতো নিষ্কম্প বিপ্লবী-চেতনা এবং কাব্যব্যক্তিত্ব এঁদের নেই। অবশ্য বিমুখ জীবনের বঞ্চনায় তীব্রভাবে বেদনাহত হয়ে আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই সৎ অনুভূতিকে প্রকাশ করছেন। আমি এঁদের অনুরাগী পাঠক। সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, সিদ্ধেশ্বর সেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, অরুণ-কুমার সরকার, অরুণ ভট্টাচার্য, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেক প্রবীণ ও তরুণ কবির রচনায় সাম্প্রতিককালের জীবনবোধ বিভিন্ন রূপকল্পে, আঙ্গিকে ও মেজাজে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবিতায় চাতুর্যকে অস্বীকার করি না। কিন্তু চাতুর্যের চেয়েও কাম্য সাধুতা এবং আন্তরিকতা। আধুনিক কবিতায় আন্তরিকতার উত্তাপ কারো কারো কাব্যে অবশ্যই উপস্থিত। রাম বসু অনেক আশ্চর্য চিত্র-কল্প নিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি চিত্রকল্পের পাঁচিলে স্বেচ্ছা-বন্দী। সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায় এক গভীর অন্তর্যাত্রার পদধ্বনি শুনি। আধুনিক বাংলা কবিতার চিত্রার্পিত সৌন্দর্য আছে। কিন্তু ভাস্কর্যের ত্রিস্তর রূপময়তা পাইনে। এক বিষণ্ণ বিকেলের কনে-দেখা-আলোতে কবিতার মুখ প্রত্যক্ষ করছি। এতে মনে তৃপ্তি পাই না। ক্ষুধার্ত জীবনে বিড়ম্বিত চেতনার যে প্রকাশ আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রত্যক্ষ করি তার সঙ্গে জীবনের সাযুজ্য বিলম্বিত।

আধুনিক বাংলা কবিতায় নীতিধর্ম অবশ্য অনেককে আকর্ষণ করে। আমাকেও। চেতনার অভিব্যক্তি কেন্দ্রবিন্দুতে সংহত হলেই লিরিকের জন্ম। এবং লিরিক কবিতাতেও জীবনের প্রচণ্ডতম বক্তব্য প্রকাশিত হতে পারে। জীবনানন্দ দাশের কোনো কোনো কবিতায় তার শক্তি আমরা অনুভব করেছি। কিন্তু বর্তমান বিপর্যস্ত জীবনে কবির সামগ্রিক চেতনা, মনে হয়, কেন্দ্রবিন্দুর সন্ধান করতে পারছে না। ফলে তার ইতস্তত বিচরণ। আরোহী ও অবরোহী

সিদ্ধান্তে কোনো না কোনো মৌল অনুভূতি সাম্প্রতিক কবিতায় স্বয়ংপ্রকাশ। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতায় জীবনের এই কোমল সৌন্দর্য ও আলোক (Sweetness and light) এক বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতার মূর্তি নিয়ে মাঝে মাঝে ধরা দেয়। অভিব্যক্তি অস্পষ্ট হলেও তিনি হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেন।

বক্তব্য ও জীবনাদর্শ-বিচ্যুত আঙ্গিকসর্বস্ব কবিতার চর্চাও অনেকে করেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় এই ধরনের এক আপাতগ্রাহ্য জীবনস্রোতের ঢেউ শোনা যায়। কখনও বা এক একটা খণ্ড চিত্র :

কেউ কি শহরে যাবে? কেউ যাবে? কেউই যাব না
শহরে প্রচণ্ড ভিড়, অকারণ তুমুল চিৎকার,
নগ্ন নিয়নের আলো। শহরে ফিরব না কেউ আর।

[ফলতায় রবিবার]

এ কবিতায় যে পলায়নের সুর আছে, তাতে জীবনবিমুখতার কারণও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। অরুণকুমার সরকারের কাব্যশিল্প সুরেলা মেজাজের হলেও, তিনি অবিশ্বাসী নন, পলায়নও তাঁর অন্বিষ্ট নয় :

জলপিপি রেখে গেছে উজ্জ্বল পালক
যদি ফিরে আসে পুনরায়
বলব, আমাকে দাও দূরের আলোক
দেবে না আমায়?
যেহেতু তোমার পাখা ভাবনার মতো
উড়ে যায় হাওয়ায় সহজে
আমার শরীর মন চেতনা সতত
তোমাকেই খোঁজে।

[দীঘা]

রাম বসুর কবিতায় সাম্প্রতিককালে এক অনির্দেশ্য আত্মসমর্পণের আকুতি লক্ষ্য করছি। জীবনানন্দের কথাও তিনি মাঝে মাঝে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন :

একদিন এই মন পাখি হয়ে উড়ে যেতে গিয়ে
মেঘমালা দেশে, মেঘবতী নদীর উদ্দেশে
উজ্জ্বল ফলের মতো প্রেম নিয়ে, ইচ্ছা নিয়ে
হৃদয়ের সমগ্রতা নিয়ে

পৌঁছাতে পারিনি শেষে

নক্ষত্রের আলো পেয়ে নক্ষত্র হয়নি।

[ঘুমের ভিতর]

এতদিনে রাম বসুর একটা পরিণত কাব্যজিজ্ঞাসা তাঁর শিল্পকর্মে প্রতিভাত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি মনস্থির করতে পারেন নি।

সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায় এই জিজ্ঞাসা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এসেছে। এই নিজস্বতাকে আমি স্বাগত জানাই। পোড়খাওয়া জীবনের রুক্ষ মুহূর্তগুলো অনন্যতায় সার্থক হয়ে ওঠে তাঁর কোনো কোনো কবিতায় :

আমরা ভুলে গেলাম

কলকাতা, কলকাতা, তাব ছত্রভঙ্গ আগুনের শিখার মধ্যে

আমি পার হয়ে গেলাম জলন্ত পার্ক, অ্যাভিন্যু, ময়দান

কাঁপছে আগুনের মধ্যে শিশু…

[একটি সাক্ষাৎ, স্মৃতিথেকে]

এই কাব্যের উপকরণে মানুষের সৎ অনুভূতিগুলি কথা বলার চেষ্টা করেছে বলেই মনকে দোলা দেয়। ইদানীংকালে বিগতহৃদয় অনেক কবি ফরাসী কাব্যের একটা যুগ থেকে কবিতার প্রেরণা আহরণে ব্যর্থ প্রয়াসী। মালার্মে, বোদলেয়রের অনেক কবিতার ভাব ও ভাষা পর্যন্ত আত্মসাৎ করে বাংলা পোশাকে এঁরা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছেন। কাব্য জগতে চিন্তার সমান্তরাল অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার না করে বলা যায় যে এই অনুভূতি ধার করা এবং সেজন্যেই আন্তরিক হতে পারেনি। জীবনের যন্ত্রণাবোধ কবির নিজস্ব এবং ব্যক্তিগত। অনুভূতিগ্রাহ্য বাস্তব থেকেই এর জন্ম। শিকড়হীন ফুলগাছ যেমন স্বল্পায়ু, এ ধরনের কবিতার চারাগাছও ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। চিত্রকল্প, সুর ও মেজাজে দেশজ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কবিতা কোনোদিনই বাঁচেনি। আশা করি সম্প্রতিকালের সৎ কাব্যানুরাগীরা একথা মনে রাখবেন। কবিতার দুর্বোধ্যতাও এই আন্তরিকতাহীন কাব্যচর্চার জন্যই দায়ী। কোনো সৎ অনুভূতিই আঙ্গিকের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকে না। বস্তুসত্য ও মননসত্যের সংযোগ সার্থক হলেই আবেগ নদীস্রোতের মতো দুর্জয় হয়ে ওঠে। বাংলা কবিতাকে যদি বাঁচতে হয় বৃহত্তর জনগণের হৃদয়ে, তাহলে তাকে আরও স্পষ্ট হতে হবে, হতে হবে আন্তরিক। কল্পিত-বাস্তব ফ্যান্টাসিরই নামান্তর। জীবনের ভিতরে যিনি বাস করেন, তাঁর পক্ষে বাস্তবকে বিকৃত দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব নয়।

জীবন প্রতীক্ষা করে আছে প্রকাশের জন্য, কবিতা সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারছে না। এবং যদি সেখানে পৌঁছনো না যায়, তাহলে কবিতাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। তবুও আশাবাদী বলেই এ প্রত্যাশা এখনো আছে। চরম বিপর্যয়কে প্রত্যক্ষ করেও বাংলা দেশের কবির কাছ থেকে শোনা যাবে সেই দুর্জয় প্রতিশ্রুতি, স্পেনে ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে ঘোষণা আমরা শুনেছি তরুণ কনফোর্ডের কণ্ঠে :

On the last mile to Huesca
The last fence for our pride,
Think so kindly, dear, that I
Sense you at my side.
And if bad luck should lay my strength
Into the shallow grave,
Remember all the good you can ;
Don't forget my love.
[John Cornford :To Margot Heinemann]

বাংলা কবিতার শরীরে অনেক নতুন অলংকরণের পরীক্ষা করছেন তরুণতর কবিরা। কবিতার সোমরসে এঁরা আচ্ছন্নদৃষ্টি একথা বলা চলে না। বেশ একটা যুক্তিনিষ্ঠ, বাস্তব ও গদ্যের কড়া মেজাজ এঁদের অনেকের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এঁদের মধ্যেও কাব্যবোধের আনুগত্য দ্বিধাবিভক্ত শিবিরপন্থী। 'কবিতা', 'উত্তরসূরী', 'কৃত্তিবাস', 'ময়ূখ' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা সাময়িক অবং অন্যান্য 'অমনিবাস' সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র করে আধুনিক বাংলা কবিতা এখন অজ্ঞাতবাস পর্বে এসে ছদ্মবেশী চাতুর্যের নানাবিধ পরীক্ষা করছে। ছদ্মবেশী বললাম এই জন্য যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী কবি বোদলেয়র, মার্লামে এবং জার্মান কবি রিল্‌কের ধ্যানধারণা ও কথনভঙ্গি তরুণতর কবিদের অনেকে নিজেদের কবিধর্মের সঙ্গে সমান্তরাল করবার প্রয়াসী। চিন্তার নাস্তিকতা ও বৈরাগ্যধর্মী মনের অবক্ষয় যুগে এ ধরনের চোরাই চালান হয়, ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাংলা কাব্যে এখন সৎ ও আন্তরিক কবির সংখ্যা মুষ্টিমেয়। অধিকাংশই আবার কথাসাহিত্য ও কাব্যসাহিত্যের মধ্যে দোলাচলে দোদুল্যমান। আর কবিতা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তার অবসর ও ধৈর্য এই অস্থির যুগে অনেকের মধ্যে পাওয়া যায় না। তার ফলে ১৯৪৮-৪৯ সালের সোচ্চার কাব্য নিনাদের পর বাংলা কবিতা এক অগভীর দেহবাদী রোমান্টিকতাকে আশ্রয় করেছে। ফলে, বক্তব্যের চেয়ে ছাঁচ নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া হচ্ছে। কাব্যের ছাঁচ বা ধরণকে আমি

অস্বীকার করি না। তার প্রয়োজন অবশ্যই স্বীকৃত। কিন্তু বক্তব্যকে চরম প্রতিক্রিয়াশীল যৌনগন্ধী দেহবাদী রোমান্টিক বিলাসের কাছে আত্মসমর্পন করে কেবলমাত্র মুখে রঙ লাগানো এক বিশেষ ধরনের নারীর মতো সন্ধ্যায় দেহলীতে দাঁড়িয়ে থাকলে, যারা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, কোনো সুস্থ মানুষই তাকে মহৎ প্রেমিকের সম্মান দিতে পারবে না। কারণ কর্মের এই আনুগত্যই শেষ পর্যন্ত 'mystical cult of formalism' গড়ে তোলে।

খুব আশঙ্কার কথা, বাংলা কবিতায় এখন এই ফর্মালিজমের অশুভ ছায়া মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক কবিদের আরও কয়েকজনের নামোল্লেখ করছি, যাঁদের কাব্যকর্মে ফর্ম ও কন্টেন্টের এই দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা গেছে। আলোক সরকার, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, যুগান্তর চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উৎপল বসু, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, সামসুর রহমান, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, সুশীল কুমার গুপ্ত, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, অরবিন্দ গুহ, মানস রায়চৌধুরী, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকেই সাম্প্রতিককালে কিছু কবিতা লিখেছেন এবং আরও লিখে চলেছেন।

আধুনিক এই কবিদের রচনায় চাতুর্য আছে, কিন্তু বিশ্বাস নেই। কাব্যের শরীর নিয়ে মত্ততা হেতু হৃদয় উপেক্ষিত। অথচ সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী না হলে কাব্যের কম্যুনিকেশন ব্যর্থ। এদের আসল আনুগত্য লিরিকের প্রতি। অথচ এই অস্থিচর্মসার জীবনে লিরিকের ঝলক আনতে গেলে যে পরিমাণ আত্মবিলুপ্তি প্রয়োজন আধুনিক কবিদের মধ্যেই সেই অপার ধৈর্যের অভাব। এক অসুস্থ অবরুদ্ধ কামনার আত্মরতি আধুনিক কাব্যে এনেছে বিকৃতি, যার ফলে অনেক সৎ কবির রচনা ভিড়ের মধ্যে সমাদর পাচ্ছে না। এই কবিদের মনে রয়েছে প্রেমে অবিশ্বাস, দ্বিধা ও চাতুর্য। এঁরা বলেন: 'কী লজ্জা, যদিও ভেবে থাকে রমণীবিদ্বেষী লোকটা ডুবেছে নয়ননীলজলে,' [শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়]। কিংবা কখনো কামার্ত হয়ে পেয়েছে প্রত্যাখ্যান.

আমার বিবেক
শরীরের ছিপ নিয়ে গভীর আবেগে
যতবার বিকারের ঘোরে
আদিম জেলের মতো গেছে কাছাকাছি

অমনি সে মায়াবিনী ফুটফুটে আঁশের
জলাঙ্গী মিনাক্ষী তিলোত্তমা
জলের মাছের মতো
গিয়েছে পালিয়ে।

[রামেন্দ্র দেশমুখ্য]

এবং তারই সমান্তরাল আর এক আদিম পাপবোধে বিগতবীর্য মানুষের বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনি :

প্রেমের পাঁচালীগান আমি শুনে রুগ্ন, নিরুৎসুক।
(প্রণয়ে আশ্রিত যীশু, নিরস্ত্রেরা, বৃদ্ধ মহাশয়)
আমার রক্তের মতো লাল, কালো গম্ভীর লম্পট
অধরোষ্ঠে স্রাব লাগে, নোনতা বুনো কর্দমাক্ত হয়।

[শক্তি চট্টোপাধ্যায়]

আশা করি বিদগ্ধ পাঠক এই কবিতার ছদ্মবেশ উন্মোচনে সক্ষম হবেন। এর ব্যাখ্যাও নিষ্প্রয়োজন।

ডিকাডেন্সের লক্ষণ বাংলা কাব্যে এখন স্পষ্ট। এবং অনেক তরুণ কবিই এর প্রতি আকৃষ্ট। অথচ এরই পাশাপাশি আরেকটি স্রোত লক্ষ্য করা যায়। যা উচ্চকিত না হলেও এক বিস্তৃত ও গভীরতর অভিজ্ঞতার কণ্ঠস্বরকে বয়ে নিয়ে চলেছে। আমি এঁদের সম্পর্কেই আশাবাদী। তবে কবিতার সাবজনীন যে ঝোঁক চল্লিশের দশকের শেষ দিকে লক্ষ্য করেছিলাম, এখন আবার সেখান থেকে কাব্যের বক্তব্যকে গুটিয়ে এনে ব্যক্তিগত করবার চেষ্টাই হচ্ছে বেশি। কবিতার সৃষ্টি অবশ্যই ব্যক্তিগত ধ্যান, ধারণা ও অনুভূতি। কিন্তু সেই অনুভূতিতেও নিশ্চয়ই সবসাধারণের একটা অধিকার আছে। অতিমাত্রায় ব্যক্তি-সবস্বতাই আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে দুর্বোধ্যতার অভিযোগকে ব্যাপক জনশ্রুতিতে পরিণত করেছে। নাগরিক চাতুর্যের হাস্যকর প্রচেষ্টায় কেউ কেউ শিশ্নোদর-পরায়ণ যুবক এবং কামুক ছলনাময়ী যুবতীর [অরবিন্দ গুহ] অন্তর্জিজ্ঞাসাকে কাব্যরূপ দিতে চেয়েছেন, কিংবা অবৈধ সন্তানের পিতার পক্ষে সগবে [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়] ঘোষণা করেছেন. এইসবগুলোর মধ্যেই এক মৃত সমাজের ময়নাতদন্তের স্পর্শ পাই, জীবনকে ছুঁতে পারি না। কাব্যে এই প্রতিক্রিয়াশীল অবক্ষয়ী চিন্তার প্রসার বিপজ্জনক। তথাপি এই বেদনার্ত ভাঙা জীবন থেকেও কোনো কোনো কবি বিশ্বাসের কতকগুলি মুহূর্তকে তুলে

আনছেন। আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার এবং মানস রায় চৌধুরী লিরিকধর্মী। এক একটা খণ্ড মুহূর্ত কিংবা অভিজ্ঞতা বিশেষ-অর্থ নিয়ে তাঁদের কাব্যে ধরা দিয়েছে। যদিও গভীরতর কোনো অর্থে তারা পাঠককে নিয়ে যেতে পারেন না। কিন্তু তারই মধ্যে কখনও বা গভীর অনীহাকে অবলম্বন করে ব্যর্থ জীবন আবার বিশেষ চিত্রকল্পে জেগে উঠতে চায় :

আমাকে সবাই ভালবাসে আমি তো তা জানি, নন্দিত উৎসব
হাওয়ায় হাওয়ায় সান্দ্র শিখা, নীল সমস্ত সময়
লাল বেনারসী আর চন্দনরঞ্জিত মুখে লজ্জিত নীরব।
আমি মনে মনে ভাবি, আমি স্পষ্ট জানি এক রাত্রি অভিসার
আমারই বাসরশয্যা লক্ষ্য করে, স্বপ্ন এক সমুদ্র, নির্ভয়।

[আলোক সরকার]

কিন্তু এ জানা সুস্পষ্ট নয়, এর সদিচ্ছায় রয়েছে ভীরু মনোবিলাস। যুগান্তর চক্রবর্তীর কবিতায় হতাশ্বাসের মধ্যেও কোনো মুহূর্ত গভীর বিশ্বাসে বাঙ্ময় :

জ্বালো অগ্নিশিখা ! আমি কতকাল গঠিত চরিত্র
একা একা তাণ্ডব বল, হানো অন্ধতম বৃষ্টিপাত
বিনষ্ট আলোর নীচে শায়িত যে-শরীর পবিত্র
আমি তার নিপতিত দৃশ্যে হব জলের প্রপাত।

এই বিনষ্ট আলোর তলাতে বসেই এ যুগের কবিরা কখনো কখনো রুগ্ন জীবনের পঙ্ককুণ্ড থেকে উৎসারিত হয়ে চাইছেন জলের প্রপাত হতে। নদী, নারী, আকাশ, পাখি ইত্যাদি চিত্রকল্প বারবার আধুনিক কবিতায় ঘুরে ঘুরে আসছে এবং 'ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত' হতে হতে তার শক্তি হারিয়েছে। কখনও বা বক্তব্য নিদারুণ অস্পষ্টতায় কেবল শব্দকে অবলম্বন করে মাথা দোলায়। যার ফলে কবিদের মনে হয় :

'রক্তের পাঁকের নিচে বিশাল মহিষ শুয়ে আছে' কিংবা 'বক্ষের নিঃশ্বাস কাঁপছে' [তরুণ সান্যাল]। এই অসুস্থ সমাজদর্শনের বিরোধিতা করতে গিয়ে তরুণ কবিরা বোদলেয়রের মতো ঈশ্বর ও শয়তানের মাঝখানে সংশয়ে দোদুল্যমান। এই অর্ধ-বিদ্রোহ ও অর্ধ-বিষণ্নতার ছায়া আধুনিক বাংলা কবিদের একটা বৃহৎ অংশকে ঘিরে রেখেছে। এটা খুবই আশংকার কথা।

ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল

সুশোভন সরকার

ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সূচনা উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষাশেষি আর এই আন্দোলনে ভাটার টান লাগে পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। এই গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৭৭ সালে এই আন্দোলনের নাম দিয়েছিলেন 'ইয়ং ক্যালকাটা'। সুদক্ষ মনীষী প্রতিভাবান লেখক চরমপন্থী চিন্তাধারার এবং তৎকালীন নব্য শিক্ষাধারার সবচেয়ে খ্যাতিমান শিক্ষক ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) ছিলেন এই আন্দোলনের প্রবর্তক। ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের (১৭৭৫-১৮৪১) নাম যুক্ত করা একটু অস্বাভাবিক হবে। নানা দিক দিয়েই ডিরোজিওর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। হেয়ার পেশাদার শিক্ষক অথবা বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। উঁচুদরের জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতও তিনি ছিলেন না। ডিরোজিওর মতো কর্মপ্রতিভা অথবা একগুঁয়েমিও তাঁর ছিল না। খানাপিনা আচারব্যবহারে তিনি প্রায় আধা-হিন্দু হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু ডিরোজিও তা হননি। তা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে তাঁদের দুজনের মধ্যে যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় সেটাই ইয়ং বেঙ্গলের মূল্যায়নের মূল সূত্র।

তাঁরা দুজনেই সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন যে 'ইউরোপীয় শিক্ষা এবং জনগণের মধ্যে প্রচার করার' চেয়ে জরুরী কাজ ভারতে আর কিছু নেই। তাঁরা দুজনেই চিন্তা ও আলোচনার স্বাধীনতায় উৎসাহ দিতেন। 'অন্ধ কুসংস্কারের বন্ধন থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত' করার জন্য তাঁরা তাঁদের অনুপ্রাণিত করতেন। তখনকার দিনে অন্যান্য নেতারা ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী কিন্তু ডিরোজিও এবং ডেভিড হেয়ার ছিলেন অনাধ্যাত্মিক এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। ধর্মশিক্ষায় তাঁদের কোনও আস্থা ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও আদর্শবাদের প্রতি ছিল তাঁদের অবিচল নিষ্ঠা। এ-কথাও কেউ বিস্মৃত হতে পারেন না যে ডিরোজিও এবং তাঁর বহু নিন্দিত ছাত্রদের অগ্নিপরীক্ষার সময় হেয়ার তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সেই ছাত্রদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'আপনাদের দেশবাসী আপনাদের সংস্কারক এবং শিক্ষক বলে গণ্য করে।' ডিরোজিওপন্থীরাই সর্বপ্রথম হেয়ারকে প্রকাশ্যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখবার জন্য প্রতি বছর

পয়লা জুন তারিখে তাঁর স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতেন। এক নাগাড়ে পঁচিশ বছর ধরে এই স্মৃতি-বার্ষিকী উদ্‌যাপন করে তাঁরা এক নূতন ইতিহাস রচনা করেছিলেন।

॥ দুই ॥

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন কলকাতার পর্তুগীজ-ভারতীয় কুলজাত একজন ইউরেশিয়ান। তাঁর বাবা ছিলেন এক ব্রিটিশ সওদাগরী অফিসের অফিসার। (হিন্দু কলেজের ১৮৩১ সালের নথিপত্রে তাঁর নাম লেখা আছে এই বানানে—De Rozio ; ম্যাক্সমুলার তাঁর নাম লিখেছিলেন—D. Rozario)। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্যে যে সমস্ত প্রাইভেট স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, এমনি এক স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন। স্কটল্যাণ্ডের ড্রামণ্ড ধর্মতলা এলাকায় এই স্কুলটি পরিচালনা করতেন। ড্রামণ্ড ছিলেন সুপণ্ডিত ও কবি। স্বাধীন চিন্তার দুঃসাহসী সমর্থক বলে নিজের দেশ থেকে তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন। সহজেই অনুমান করা যায় যে ডিরোজিওর সাহিত্য এবং দর্শন-প্রীতি, ফরাসী বিপ্লবের প্রতি আস্থা এবং ইংরাজ চরমপন্থার প্রতি শ্রদ্ধা—এসবের পেছনে ছিল ড্রামণ্ডের প্রেরণা। ডিরোজিও যে বার্ণসের কবিতার একজন অন্ধ ভক্ত ছিলেন, তারও মূলে আছেন ড্রামণ্ড।

স্কুলের পাঠক্রম শেষ করে ডিরোজিও কিছুকাল তাঁর বাবার অফিসে কেরানি-গিরি করেন। পরে তরুণ ডিরোজিও ভাগলপুরে পিসিমা, মিসেস উইলসনের বাড়িতে গিয়ে কিছুকাল বাস করেন। সেখানে লেখক হিসেবে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়। তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখা পাঠাতে এবং কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। (ফকির অব ঝহিরা কবিতাটাও এখানে বসে লেখা। স্থানীয় একটি উপকথায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ঐ কবিতা রচনা করেন।) কাশীপ্রসাদ ঘোষের অনেক আগেই তিনি দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেছিলেন। ঘটনাটা তাঁর সম্প্রদায়ের লেখকের পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক। তিনি লিখেছিলেন :

My country ! in thy days of glory past
A beautious halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast,
Where is that glory, where that reverence now ?

ডিরোজিও কান্টের উপর যৌবনেই যে সন্দর্ভ রচনা করেছিলেন তা 'যে কোনো প্রতিভাবান দার্শনিকের পক্ষেও লজ্জার বিষয় হত না' বলে বিবেচিত হয়েছিল। নীতি-দর্শন সম্পর্কে তিনি একটি ফরাসী প্রবন্ধ অনুবাদ করেছিলেন। সেটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। বিশ বছর বয়সে পদার্পণের আগেই তিনি এত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে ১৮২৮ সালের গোড়ার দিকে হিন্দু কলেজের উঁচু ক্লাসগুলোয় পড়াবার জন্য তিনি শিক্ষক নিযুক্ত হন। (কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন ১৮২৭ সালে। কেউ কেউ বলেন ১৮২৬ সালে।) কলকাতায় ফিরে ডিরোজিও নাকি 'হের্মাপরাস' এবং 'ক্যালকাটা লিটারারী গেজেটে'র সম্পাদনা করেন, 'রাজনীতিতে অতি চরমপন্থী' ইণ্ডিয়া গেজেটে সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন এবং ক্যালকাটা ম্যাগাজিন, ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন, বেঙ্গল এ্যানুয়াল ও কেলি-ডোস্কোপ পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন। তাঁর একটি কবিতায় নেভারিনোর সংগ্রামে গ্রীসের মুক্তিলাভকে স্বাগত জানান হয়। আর একটি কবিতায় সতীদাহ নিবারণী আইনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

কলেজের ইতিহাসে ডিরোজিওর ব্যক্তিত্ব 'এক নতুন যুগের সূচনা করে।' এই তরুণ শিক্ষক 'চুম্বকের মতো' বয়স্ক ছাত্রদের নিজের চারিপাশে টেনে আনতে লাগলেন ; তাঁর জীবনীকার লিখেছেন, 'এর আগে এবং পরে অপর কোনও শিক্ষক ভারতের কোনও দেশী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালের মধ্যে ছাত্রদের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি।' শুধু ক্লাসের মধ্যেই নয়, বাইরেও মুক্তি এবং মাদকতার নতুন উৎস পশ্চিমী ভাবধারা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি তাঁর ছাত্রদের 'জ্ঞান সম্প্রসারণের' চেষ্টা করতেন এবং তাতে তিনি সফলও হয়েছিলেন। কলেজের ছাত্ররা সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকত। তাদের মনে তিনি যে ছাপ এঁকে দিয়েছিলেন, অনেকের মনেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই ছাপ অমলিন ছিল। এই যোগসূত্রই ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছিল। শিক্ষকের স্মৃতি তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যকে পরবর্তীকালেও অটুট করে তুলেছিল। ডিরোজিও তাঁর ভক্ত তরুণদল সম্বন্ধে কি ভাবতেন তা তাঁর একটি কবিতার নিচের কটা লাইনেই প্রকাশ পাচ্ছে :

Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers.
What joyance rains upon me when I see

Fame in the mirror of futurity
Weaving the chaplets you have yet to gain,
And then I feel I have not lived in vain.

এখনও ডিরোজিওর কলেজে এই লাইনগুলো সানন্দে আবৃত্তি করা হয়।

ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের স্বাধীন বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহ দিতেন। প্রাধিকারের ন্যায় অন্যায় নিযে প্রশ্ন তোলার জন্যও তিনি ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, 'নিজেরা চিন্তা কর। বেকনের উল্লেখিত কোনও দেবতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ো না। সত্যকেই জীবন এবং মৃত্যুর অবলম্বন ধরে নাও।' তাঁর ছাত্র রাধানাথ সিকদার গুরু সম্বন্ধে বলেছেন, 'তিনি সত্যানুসন্ধান চেতনার একমাত্র স্রষ্টা। পাপ ও অন্যায়ের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা। তাতে ভারতের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হতে পারে না।' রামগোপাল ঘোষ এই নীতিবাক্য গ্রহণ করেছিলেন: 'যে তর্ক করে না, সে অন্ধ গোঁড়ামীতে ভুগছে। যে তর্ক করতে পারে না, সে নির্বোধ এবং যে তর্ক করে না, সে ক্রীতদাস।'

ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্ররা তাঁর এণ্টালীর বাসায় অবাধে যাতায়াত করতেন। সেখানে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিষিদ্ধ খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বয়সের গুণে এ ব্যাপারে তাঁরা যে বাড়বাড়ি করে ফেলেছিলেন তা দেখে কেউ যেন মনে করবেন না যে গতানুগতিক বিধি বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তাঁদের আন্তরিকতা অথবা সাহসের অভাব ছিল। আর একথাও সত্য যে ইয়ং বেঙ্গলের কোনও কোনও সদস্য অকরুণ বিদ্রূপের দ্বারা পাড়াপড়শীর সংবেদনশীল মনে নির্মম আঘাত হেনেছেন। উত্তরকালের বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ যুবকেরা এ ব্যাপারে অনেক সংযম অবলম্বন করেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের লোকেরা হিন্দু সমাজের অকথ্য কুৎসা গাইতেন কেন তা বোঝা যায় কিন্তু তাঁদের কুৎসায় সব সময় যুক্তি থাকত না। মাধবচন্দ্র মল্লিক এক কলেজ ম্যাগাজিনে লিখেছিলেন—'অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমরা হিন্দু ধর্মকে ঘৃণা করি।' এটা অপরিণত অশ্রদ্ধার বে-পরোয়া উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়! কিন্তু প্রকাশ্য আদালতে গঙ্গার জল ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এ ব্যাপারে রসিককৃষ্ণ মল্লিক যথেষ্ট চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি গঙ্গার পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না।' ডিরোজিওপন্থীদের এক বড় অংশের মধ্যে যে সুরাসক্তি ছিল, সেটা তাদের দুর্বলতার পরিচায়ক। তবে হরমোহন

চট্টোপাধ্যায়ের তৎকালীন ভক্তিও বিস্মৃত হওয়া যায় না। তিনি বলেছিলেন, 'ওরা সকলেই সত্যের উপাসক বলে বিবেচিত হয়। সত্যিই কলেজ-বয় যেন সত্যেরই প্রতিশব্দ।'

ডিরোজিও এবং ছাত্ররা ১৮২৮ সালে আমাদের প্রথম বিতর্ক ক্লাব একাডেমিক এ্যাসোশিয়েশনের প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে স্বাধীন চিন্তা, ভবিতব্য, পাপপুণ্য, দেশাত্মবোধ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, গোঁড়ামী এবং পুরোহিততন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে তর্কবিতর্ক হত। দীর্ঘ সাপ্তাহিক সভায় পৌরহিত্য করতেন ডিরোজিও। তাঁর পরামর্শ এবং উপদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হত। তরুণ সদস্যদের বিতর্ক-প্রতিভা শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সেই উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্কসভায় টেনে আনত। হিন্দু কলেজের ছেলেরা 'পার্থেনন' ম্যাগাজিন (শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে এথেনিয়াম) প্রকাশ করেন ১৮৩০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। তাতে স্ত্রীশিক্ষা, শস্তায় বিচারব্যবস্থা, কুসংস্কারের অভিশাপ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা স্থান পায়। পত্রিকার দুটি সংখ্যা বেরুবার পর কলেজ ভিজিটর ডাঃ এইচ-এইচ উইলসনের আদেশে 'জন্মে হিন্দু, শিক্ষায় ইউরোপীয়'দের এই মুখপত্রটি বন্ধ হয়ে যায়। ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় ডিরোজিও অধিবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর স্কুলে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। 'প্রায় চারশো যুবক' সেই বক্তৃতা শুনতে যেতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বেকন, লক, হিউম, স্মিথ, পেইন এবং বেন্থামের নূতন ভাবধারায় গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

এই আবহাওয়ার মধ্যে চরমপন্থী ভাবধারার উত্তাল তরঙ্গ উঠতে শুরু করে। ১৮৩০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র অতীত এবং বর্তমান ইতিহাসের নজির তুলে তৎকালীন ঔপনিবেশিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৩০ সালের ১০ই ডিসেম্বর টাউনহলে জুলাই-বিপ্লব উদ্‌যাপনের জন্য দুইশত লোক এক জনসভায় সমবেত হন। সেই বছরের খ্রীস্টমাস দিবসে 'অজ্ঞাতনামা' কয়েকজন লোক মনুমেণ্টে ফরাসী-বিপ্লবের তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন।

এই সব ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী সমাজ গভীর উদ্বেগ বোধ করছিলেন। গুজব রটেছিল যে হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্র প্রার্থনার সময় মন্ত্রোচ্চারণের বদলে ইলিয়াডের লাইন আবৃত্তি করেন। একটি ছাত্র কালী ঠাকুরকে মাথা নিচু করে প্রণাম করার বদলে 'গুড্ মর্নিং, ম্যাডাম' বলে কালীকে নমস্কার জানান। বৃন্দাবন ঘোষাল নামে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সমাজের নেতাদের কাছে গিয়ে

ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের সম্বন্ধে বেশ রঙ চড়িয়ে নানা রকমের গালগল্প এবং কুৎসা প্রচার করতেন। সংবাদ-প্রভাকর এবং সমাচার-চন্দ্রিকা প্রচণ্ড চিৎকার তুললেন যে "বেকার ফিরিঙ্গিদের" অনুকরণপ্রিয় "ঈশ্বরে অবিশ্বাসী পশুরা" ধর্মকে বিপন্ন করে তুলেছে। ১৮৩১ সালে সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত এক পত্রে "অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় ভাষায় হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করা হয়।" কলেজ কমিটি সেই পত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন। বেশ বোঝা যায় যে উস্কানিটা শুধু ডিরোজিওর দিক থেকেই আসেনি। অপর পক্ষও বেশ সক্রিয় ছিলেন।

সংবাদপত্রে আন্দোলন দানা বাঁধবার আগেই হিন্দু কলেজের ম্যাগাজিন কমিটি চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। ১৮৩১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী কমিটি ডিরোজিওর সঙ্গে হেডমাস্টার ডি' এ্যানসেলমের (D' Anselme) এক ঝগড়া মিটিয়ে দেন। ডিরোজিও প্রগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে হেডমাস্টারের কাছে গেলে তিনি তাঁকে "মারবার জন্য হাত তোলেন।" ডেভিড হেয়ার তাঁর হাত চেপে ধরেন। তখন হেডমাস্টার ডেভিড হেয়ারকে 'ঘৃণ্য মোসাহেব" বলে গাল দেন। এই ব্যাপারে শিক্ষক মহলে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় তাতে হেডমাস্টার হতবুদ্ধি হয়ে যান বলেই মনে হয়। যথারীতি পরস্পরের কাছে দুঃখ প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই ঘটনার যবনিকা পড়ে। তবে "জাতীয় ধর্মের মহান নীতি সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে সন্দেহ সৃষ্টিকারী সকল প্রকার আলোচনা যতদূর সম্ভব ঠেকিয়ে রাখবার জন্য কমিটি অবিলম্বেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন" (প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা থেকে জানা যায়)। "যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ হিন্দু ন্যায়-অন্যায় বোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ নয়," তাঁরা সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করেন। "যে সমস্ত সভা-সমিতির ধর্ম এবং রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার ব্যবস্থা ছিল, সেখানে ছাত্রদের যোগদান" নিষিদ্ধ করা হয়। এমন কি কমিটির সদস্য রামকমল সেন ডিরোজিওকে অপসারণ করবার জন্য কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বানেও উদ্যোগী হয়েছিলেন।

কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে (১৮৫৫ সালে হিন্দু কলেজের ঐ নামকরণ হয়) ১৮৩১ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত হিন্দু কলেজের ডিরেক্টর বোর্ডের সেই বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণী সংবলিত একখানি হাতে লেখা দলিল এখনও রক্ষা করা হচ্ছে। সেই অধিবেশনে আলোচনার জন্য উত্থাপিত এক স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল, "যেহেতু ডিরোজিও যত নষ্টের গোড়া এবং

জনগণের পক্ষে ভীতিস্বরূপ, সেইহেতু তাঁকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করা হোক। যে সমস্ত ছাত্র প্রকাশ্যে হিন্দু-ধর্ম এবং দেশের প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধিতা করে তাদেরও তাড়িয়ে দেওয়া হোক। যদি কোনও ছাত্র সভা-সমিতিতে বক্তৃতা শুনতে যায়, তাহলে তাকেও তাড়িয়ে দেওয়া হবে। ক্লাসে পাঠ্যপুস্তক পড়াতে হবে এবং কোন ক্লাসের মেয়াদ কতক্ষণ, তাও নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।" আরও বলা হয়েছিল যে ডিরোজিওর অসদাচরণের ফলে ছাত্ররা কলেজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তবে কলেজ কমিটির ১৮৩১ সালের ৭ই মে এবং ১১ই জুন তারিখের কার্যবিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে ডিরোজিওর পদচ্যুতির পরও কলেজের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাওয়া বন্ধ হয়নি।

ডিরোজিও যে "তরুণদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণের অনুপযুক্ত"—সে কথা স্বীকার করতে কমিটি ৬-৩ ভোটে অস্বীকার করেন। তবে "হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ায়" তাঁরা তাঁকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণের সময় উইলসন এবং হেয়ার ভোটদানে বিরত থাকেন, কারণ হিন্দু সমাজের পক্ষে কিছু বলবার অধিকার তাঁদের ছিল না। রাধাকান্ত দেব রামকমল সেন, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দ্রকুমার ঠাকুর রায় দেন যে ডিরোজিওকে বরখাস্ত করার "প্রয়োজন" আছে। রসময় দত্ত ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত ছিল, বরখাস্ত করা "যুক্তিযুক্ত"। একমাত্র শ্রীকৃষণ সিংহ বলেছিলেন যে বরখাস্তের কোনও "প্রয়োজন নেই"।

উইলসনের প্রস্তাব অনুযায়ী ২৫শে এপ্রিল ডিরোজিও পদত্যাগপত্র পেশ করেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, "আমাকে জিজ্ঞাসা না করে আমার বক্তব্য না শুনে এমনকি একটা বিচারের প্রহসনও না করে আপনারা আমাকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"

তাঁর সম্বন্ধে লোকপরম্পরায় যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছিল, সে সম্বন্ধে উইলসনের এক প্রশ্নের জবাবে ২৬শে এপ্রিল ডিরোজিও একটি পত্র লেখেন। তিনি ছাত্রদের ভগবৎ-বিশ্বাসকে হেয় করার চেষ্টা করেছিলেন কি-না সেই প্রশ্নের উত্তরে যা লিখেছিলেন, তা বাঙলার রেনেসাঁসের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে :

> যদি ঐ বিষয়ের উপর কথা বলা অন্যায় হয় তাহলে আমি অপরাধী। কারণ একথা ঘোষণা করতে আমার কোনও ভয় অথবা লজ্জা নেই যে, এ ব্যাপারে আমি দার্শনিকদের সন্দেহের কথা প্রকাশ করেছি এবং সেই সন্দেহ নিরসনের

পন্থাও আমি ব্যক্ত করেছি। এমন একটি প্রশ্নের উপর তর্কবিতর্ক করা কি কোথাও নিষিদ্ধ? যদি তাই হয়, তাহলে বিবাদমান কোনও পক্ষে যুক্তি তোলাই অন্যায়। এতবড় একটা বিষয়ের উপর একটি মাত্র ধারণাকে আঁকড়ে ধরে তার বিরোধী সমস্ত ধ্যানধারণার দিকে চোখকান বুঁজে থাকা কি জ্ঞানদীপ্ত সত্যের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

……বিশেষ অবস্থার মধ্যে আমি কিছুকালের জন্য তরুণদের শিক্ষাদানের ভার পেয়েছিলাম। তাদের কি আমি প্রগলভ এবং নির্বোধ অন্ধবিশ্বাসী তৈরি করতে পারি?……সেইজন্য আমি কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে হিউমের লেখা ক্লিনথেস এবং কিলোর বিখ্যাত কথোপকথনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে আস্তিকতার বিরুদ্ধে অতি সূক্ষ্ম এবং চতুরতা-পূর্ণ যুক্তিতর্ক আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রীড এবং ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট হিউমের যুক্তিতর্কের যেসব জবাব দিয়েছেন, সেগুলোও আমি ছাত্রদের পড়তে দিয়েছি। সে জবাব আজও কেউ খণ্ডন করতে পারেনি। আমার অপরাধ কি তা এবার বুঝে দেখুন।………আমি যে নাস্তিক এবং অবিশ্বাসী বিশেষণ লাভ করব তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ধর্মের ব্যাপার নিয়ে যারা স্বাধীন চিন্তা করে, তারা চিরকালই ঐ বিশেষণে ভূষিত হয়।……

ডিরোজিও কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। কিন্তু ছাত্রদের উপর তিনি যে প্রভাব রেখে এসেছিলেন, সেটা অটুট থাকে। কয়েকজন বন্ধুর উচ্ছৃঙ্খলতায় ১৮৩১ সালের অগস্ট মাসে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহ থেকে বিতাড়িত হন। তিনি ইনকুইরার নামে একখানি পত্রিকা বার করেন। তাতে নির্যাতিত (Persecuted) নামক এক প্রবন্ধ লিখে তিনি প্রাচীনপন্থীদের গোঁড়ামীর মুখোশ খুলে দেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিকের আত্মীয়স্বজন একবার তাকে ওষুধের সাহায্যে ঘুম পাড়িয়ে হাত-পা বেঁধে নিরাপদ স্থানে নিয়ে তোলেন। কিন্তু তিনি বাবার কাছ থেকে পালিয়ে এসে জ্ঞানান্বেষণ নামে আর একটি পত্রিকা বার করেন। কলেজ কমিটির ১৮৩১ সালের ১১ই জুনের কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক পত্রিকা প্রকাশের এবং চাঁদা সংগ্রহের অনুমতি চেয়ে কমিটির কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। কমিটি সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

ডিরোজিও চুপচাপ বসে থাকেন নি। ইস্ট ইণ্ডিয়ান নাম দিয়ে তিনিও একটি দৈনিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আদর্শবাদ এবং আপোসহীনতার পথ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিচ্যুত হননি। তাঁর এই গুণ দেখে সত্যিই

অভিভূত হয়ে যেতে হয়। নতুন পত্রিকা বার করে তাঁর কাজ হল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয়দের সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করা। প্রসন্নকুমার ঠাকুর নিজেকে নাস্তিক রামমোহনের অনুগামী বলে প্রচার করতেন। তাঁকে দুর্গাপূজা করতে দেখে ডিরোজিও তাঁর পত্রিকায় কঠোর সমালোচনা করেন।

১৮৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ডিরোজিও কলেরায় আক্রান্ত হন। প্রিয় শিষ্যরা তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে এক সপ্তাহ যাবত কলেরার সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেন। ক্রিস্টমাস ইভে আমাদের রেনেসাঁসের এই ঝোড়ো পাখির জীবনাবসান হয়।

॥ তিন ॥

সংসারের চাপে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে ডিরোজিও-গোষ্ঠীর সদস্যরা ক্রমে ক্রমে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ইয়ং বেঙ্গল অনুরূপ নামধারী বিভিন্ন ইউরোপীয় আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয় নয় কারণ ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন তেমনভাবে দানা বাঁধতে পারেনি। তবে ডিরোজিওর মর্মান্তিক অকাল মৃত্যুর পরও ১০।১২ বছর যাবত তার অসাধারণ প্রভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হতে থাকে।

বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে যখনতখন চরমপন্থী মতবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ত। ১৮৩২ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা টম পেইনের "এজ অফ রিজন" বইয়ের জন্য আটটাকা দাম দিতে রাজী ছিলেন এবং এক প্রকাশক পাঁচ টাকা দরে ঐ বই ১০০ কপি বিক্রি করেন। ১৮৩৬ সালে ইংলিসম্যান লিখেছিলেন যে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা "সকলেই চরমপন্থী এবং বেন্থাননীতির অনুগামী। 'টোরি' শব্দটা তাদের কাছে অপমানজনক।······তারা সকলেই অ্যাডাম স্মিথের মতবাদে বিশ্বাসী।" "১৮৪৩ সালে" গুরুতর ব্যবসাবাণিজ্যের কাজে লিপ্ত জনৈক "প্রচীন হিন্দু" ভারতীয় অভাব-অভিযোগের উপর কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে বিপ্লবের জন্য আফসোস প্রকাশ করেন।

ডিরোজিওপন্থীরা আরও সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তায় মগ্ন হতে থাকেন। ১৮৩১ সালে রসিককৃষ্ণ মল্লিক পুলিশী দুর্নীতির সমালোচনা করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষকদের অসহায় অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একচেটিয়াধারী কোম্পানীগুলির হাতে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল, তিনি তার

অবসান দাবি করেন। ১৮৩৪ ৩৫ সালে কোম্পানীর সনদ সংশোধন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর মর্মগ্রাহী বক্তৃতা করেন। ১৮৪২ সালে তারাচাদ চক্রবর্তী দাবি করেন যে ওরলিনিস্ট ক্রান্সের মতো এদেশেও কারিগরী শিক্ষার সরকারী ব্যবস্থা থাকা প্রযোজন। ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে খ্যাত জর্জ টমসন ১৮৪২ সালে ভারতে আসেন। রামগোপাল ঘোষ তাঁর সঙ্গে ফৌজদারী বালাখানায গিযে বজ্র নির্ঘোষে বক্তৃতা করেন। জনসভায বক্তৃতা দিযে দিয়ে তিনি নাম পেলেন, "ভারতীয ডিমস্থেনেস।" আগে ইউরোপীয়রা ভারতের সাধারণ আইনের আওতায় পড়তেন না। ১৮৪৯ সালে এই ব্যবস্থা বহিতের জন্য একটি বিল আসে। ইউরোপীযরা তার নাম দেয 'কালা বিল"। রামগোপাল এই তথাকথিত কালা বিলের সমর্থন করেন।

১৮৪৩ সালে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায তাঁর "বিচার ও পুলিশ" নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে প্রচলিত ব্যবস্থাকে "অবৈধ জুলুমবাজী এবং দুর্নীতিপরাযণ" বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে "প্রভুত্বকামী পুরোহিততন্ত্র' আমাদের মৌলিক সাম্য উচ্ছেদ করেছে। ১৮৪৬ সালে প্যারীচাদ মিত্র রাযতকে রক্ষা করার দাবি জানিয়ে বলেছিলেন, "ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে গভর্নমেন্টের জন্ম হয। গভর্নমেন্ট থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম হয় না" (ডিরোজিও প্রবর্তিত লোকের ভাবধারার প্রতিধ্বনি)। তিনি আরও বলেছিলেন "গরীব এবং অসহায়দের যেমন সব সময চোখে চোখে রাখতে হয, ধনী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের তেমনভাবে রাখবার প্রয়োজন হয না।"

হিন্দু কলেজের ছেলেরা নিজেদের বক্তব্য প্রচারের জন্য কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ডিরোজিওর মৃত্যুর বছর হিন্দু অজ্ঞানতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায ইনক্যুইরার পত্রিকা প্রকাশ করেন। রসিকমোহন মল্লিকের জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা বাঙলা এবং ইংরেজী দুই ভাষায প্রকাশিত হত। ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত বেচে ছিল এই পত্রিকা। এর মূল লক্ষ্য ছিল "গভর্নমেন্ট এবং ব্যবহারতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষাদান করা।" ১৮৩৮ সালে হিন্দু পাইওনিযারে 'ভারত ও বিদেশী" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জনগণকে গভর্নমেণ্টে অংশ নিতে দেওযা হয না বলে তাতে অভিযোগ করা হযেছিল এবং বলা হয়েছিল, গভর্নমেন্ট যে "যে বিপুল কর ধার্য করেছেন" তা অযৌক্তিক। তারাচাঁদ চক্রবর্তী "ক্যুইল" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাতে সরকারী নীতির অবাধ সমালোচনা করা হত।

১৮৪২ সালে "বেঙ্গল স্পেক্টটর" পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। তাতে প্রতিযোগিতা-মূলক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার দাবি করে নিয়মিত প্রবন্ধ লেখা হতে থাকে। সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার কুলিদের দিয়ে সরকারী অফিসাররা নিজেদের ঘরোয়া কাজ করিয়ে নিতেন। রাধানাথ শিকদার তার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তার বিবরণ ১৮৪৩ সালে এই পত্রিকায় ছাপা হয়। নীতিগতভাবে এই পত্রিকা বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিল।

সমাজে তখনও ডিরোজিও-ভক্তির জোয়ার চলছে। পথিকৃৎ সংস্থা একাডেমিক অ্যাসোশিয়েশন ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। ডিরোজিওর পর ডেভিড হেয়ার ঐ সংস্থার প্রেসিডেণ্ট হন। সভার শেষে তিনি অনেক সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সদস্যদের সঙ্গে আলাপআলোচনা করতেন। ইতিমধ্যে এপিস্টোলারী এ্যাসোশিয়েশন নামে একটি অনুপূরক সংস্থা গড়ে ওঠে। সেখানে ডিরোজিও-পন্থীরা খাঁটি রেনেসাঁস-মানবতাবাদের ধরনে নিজেদের মতামত বিনিময় করতেন। রামগোপাল ঘোষ এবং রাধানাথ শিকদার তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাপ্রবাহ, রোজনামচার আকারে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এই বন্ধুমহলের সদর দপ্তর হয়ে উঠেছিল রামগোপাল ঘোষের বাড়ি। ১৮৩৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ডিরোজিওপন্থীদের নেতৃত্বে সোসাইটি ফর দি একুইজিসন অফ জেনারেল নলেজ (জ্ঞানান্বেষণ সমিতি) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সভাপতি হন তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তী, সহকারী সভাপতি রামগোপাল ঘোষ, সেক্রেটারীদ্বয়—(প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী)। ১৮৩৮ সালের ১২ই মার্চ এই সোসাইটির কাজ আরম্ভ হয়। ডেভিড হেয়ারকে তাঁরা তাঁদের অনারারী পরিদর্শক নির্বাচিত করেন। ১৮৪০ ও ১৮৪৩ সালের মধ্যে এই সোসাইটি-পঠিত প্রবন্ধগুলি তিনখানি গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়। তার মধ্যে এই প্রবন্ধগুলো আছে : 'সিভিল অ্যাণ্ড সোশ্যাল রিফর্ম" এবং "নেচার অফ হিস্টোরিকাল স্টাডিজ" (কৃষ্ণমোহন); "ইন্টারেস্ট অফ দি ফিমেল সেক্স" এবং পাঁচখণ্ডে "স্টেট অফ হিন্দুস্থান" (প্যারীচাঁদ); "স্কেচ অফ বাঁকুড়া" (হরচন্দ্র ঘোষ); "নোটিশ অফ টিপারা"; "নিউ স্পেলিংবুক" এবং চারখণ্ডে 'নোটিসেস অফ চিটাগঙ" (গোবিন্দচন্দ্র বসাক)। ১৮৩৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু কলেজ হলে যখন এই সোসাইটির সভা হচ্ছিল, তখন প্রিন্সিপাল রাজদ্রোহিতার অভিযোগ এনে সেই সভা ভেঙে দেবার চেষ্টা করেন। তখন প্রেসিডেণ্ট তারাচাঁদ চক্রবর্তী তাকে ভৎর্সনা করে নীরব থাকতে বলেন। সে কাহিনী আজও বিখ্যাত হয়ে আছে। ১৮৩৯

সালের গোড়ার দিকে স্বল্পায়ু মেকানিকাল ইনষ্টিটিউট গঠিত হয়। ১৮৪৪ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্র হিন্দু থিওফিলানথ্রাফিক সোসাইটি গঠন করেন (সম্ভবত এটি ভলনির প্রতিধ্বনি)।

ডিরোজিওপন্থীদের সমিতিগুলি ছিল সাংস্কৃতিক সংগঠন কিন্তু সেগুলি ক্রমেই রাজনীতির দিকে ঘেঁষতে শুরু করে। জর্জ টমসন বাঙালীদের উপদেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন "সুবিধাবাদ" ত্যাগ করে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। সংবাদপত্রের চেয়ে সেটা বেশি ফলপ্রসূ হবে। তাঁর বক্তৃতা ইয়ং বেঙ্গল-গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। ঐ সময় ইয়ং বেঙ্গলের প্রবীনতম সদস্য তারাচাঁদের নাম অনুসারে সকলে ইয়ং বেঙ্গলের নাম দিয়েছিল চক্রবর্তীর দল। ১৮৪৩ সালের ২০শে এপ্রিল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি গঠিত হয়। ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোশিয়েশন নাম দিয়ে যে "ধনসম্পদের আভিজাত্য" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার সঙ্গে সোসাইটির "বিদ্যাবত্তার আভিজাত্যে"র প্রভেদ লক্ষ্যণীয়। ১৮৫১ সালের ৩১শে অক্টোবর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন গঠিত হলে সোসাইটি তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। রাজনৈতিক চিন্তাধারায় শিক্ষিত ভারতীয়গণ সেই প্রথম একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করেন। ইয়ং বেঙ্গলের পৃথক সত্তা তখন প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী বর্ণিত এক বিস্ময়কর ঘটনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহু বছর বাদে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর বোম্বাইয়ের বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে কাথিয়াওয়াড়ে এক ডিরোজিওপন্থী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি সব সময়ই তাঁর মহান শিক্ষকের গুণগান করতেন। একবার তিনি "কাথিয়াওয়াড়ে কুশাসন" শিরোনামায় সংবাদপত্রে কয়েকটি চিঠি লিখে দেশীয় রাজ্যে কুশাসনের কথা জনগণের কাছে প্রচার করেছিলেন। তিনি এক বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে এমন আন্দোলন শুরু হয়ে যায় যে উক্ত রাজ্যের নৃপতি তাঁকে মুক্তি দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনায় নিযুক্ত করতে বাধ্য হন। এমন কি নিজের সহকারী বেছে নেওয়ার ক্ষমতাও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। শাসনসংস্কার কিছুদূর অগ্রসর হবার পর প্রতিক্রিয়াশীলরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং সন্ন্যাসীকে তাঁর কার্যক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই অজ্ঞাত ডিরোজিও-পন্থী এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাতই আছেন।

॥ চার ॥

ডেভিড হেয়ার ভারতে এসেছিলেন ১৮০০ সালে এবং ১৮১৬ সালে ঘড়ির ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করে জীবনের বাকী ২৫ বছর তাঁর নূতন মাতৃভূমির জনগণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজের সমস্ত সময়, শক্তি এবং সম্পদ নিয়োগ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ১৮১৭ সালের হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭) ও স্কুল সোসাইটির (১৮১৮) সংগঠক। হিন্দু কলেজের শৈশবে সমস্ত বাধাবিঘ্ন থেকে কলেজটিকে তিনি রক্ষা করেছেন এবং নিজের স্কুলের সবচেয়ে ভাল ছেলেদের এই কলেজে পাঠিয়েছেন। প্রতিদিন তিনি কলেজের কার্যাবলী পরিদর্শন করে যেতেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি আমাদের প্রথম মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের (১৮৩৫) ঐতিহাসিক কাজে সাহায্য করেছিলেন। তখনকার দিনে লাশকাটার কাজ সম্বন্ধে সাধারণের মনে যথেষ্ট কুসংস্কার ছিল কিন্তু ডেভিড হেয়ার তাঁর ব্যাপক পরিচিতির মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের এই কুসংস্কার দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

চতুর্থ দশকে ইয়ং বেঙ্গলের মিত্র হিসাবে হেয়ার টাউন হলের সভায় বক্তৃতা করতেন। প্রেস আইনের বিরুদ্ধে তিনি ১৮৩৫ সালের ৫ই জানুয়ারী বক্তৃতা করেন। জুরী-প্রথার সম্প্রসারণের অনুকূলে বক্তৃতা করেন ১৮৩৫ সালের ৮ই জুলাই, মরিসাসে কুলি চালানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন ১৮৩৮ সালের ৮ই জুলাই। পটলডাঙ্গার এক বাড়ি থেকে তিনি প্রায় শতাধিক কুলিকে উদ্ধার করেছিলেন। মরিসাসে চালান দেবার জন্য তাদের ঐ বাড়িতে এনে রাখা হয়েছিল।

ডিরোজিওপন্থীরা ১৮৩০-৩১ সালে মাধবচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে প্রকাশ্যে হেয়ারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেখানে তাঁকে শুকতারা নামে অভিহিত করা হয় এবং তাঁর চলমান পাল্কিটিকে বলা হয় গরীবের দাওয়াখানা। সত্যিই তিনি সে-যুগের মানুষের মঙ্গলকারী পথিকৃৎ এবং সুহৃদ ছিলেন।

ডিরোজিওর মৃত্যুর দশ বছর বাদে ডেভিড হেয়ার ১৮৪১ সালের ১লা জুন ডিরোজিওর মতো কলেরা রোগেই মারা যান। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া তাঁকে খ্রীষ্টীয় সুসমাচারের আজন্ম শত্রু বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাই তাঁর মৃতদেহ কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত তাঁরই কেনা জমিতে সমাধিস্থ করা হয়। সেই বৃষ্টি-বাদলের দিনে পাঁচ হাজার লোক শোকযাত্রা করে হেয়ারের মৃতদেহ তাঁর বাসভবন (বর্তমানে হেয়ার স্ট্রীট) থেকে কলেজ স্কোয়ারে নিয়ে আসেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাঙ্গণে তাঁর যে

মর্মর মূর্তি আছে, সেটি ডিরোজিওপন্থীদের উদ্যোগেই স্থাপিত হয়। শহরের বুকের উপর মাথা তুলে দাঁড়ানো বিদেশীর এই মর্মর মূর্তি অপসারণের কথা কোনও অন্ধ জাতীয়তাবাদী স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

॥ পাঁচ ॥

ইয়ং বেঙ্গলের অন্যান্য প্রতিনিধিদের জীবনকাহিনী লিখতে গেলে অনেক যায়গা লেগে যাবে। এখানে লাইফ অফ ডেভিড হেয়ার বই থেকে ইয়ং বেঙ্গলের ভিতরে মহলের কয়েকজনের নাম ও আয়ুষ্কাল দেওয়া হচ্ছে: রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১২-৮৭), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫) এবং রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮) এই চারজনকে তাঁদের কলেজে আগুণের ফুলকি বলে অভিহিত করা হত। এঁদের পরের সারিতে ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-৬৮), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮) এবং রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-২০)। তার পরের সারিতে ছিলেন মাধবচন্দ্র মল্লিক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক এবং অমৃতলাল মিত্র। এঁদের সঙ্গে প্রবীণ তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-৫৫) এবং তরুণ কিশোরীচাঁদ মিত্রের নামও যোগ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় এই নামগুলি সুপ্রসিদ্ধ। এ-ছাড়া আরও অনেকে নিশ্চয়ই মাত্র তেইশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণকারী শিক্ষকের যাদুকরী প্রভাবে পড়েছিলেন।

দেশে ধর্মোন্মত্ততার ফলে ডিরোজিওপন্থীরা তাঁদের প্রথম জীবনে নিন্দিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত গুণাবলী সমাজে স্বীকৃত হলেও ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনকে হেয় করা প্রায় ঐতিহ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ১৮৭৫ সালে রাজনারায়ণ বসু মন্তব্য করেছিলেন, "পশ্চিমের আশায় তাদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল।" এই মন্তব্যই সে যুগে সাধারণ বিচারের রায়। এই রায় যে বিকৃত সেকথা দৃঢ়কণ্ঠেই বলা চলে। তবে ঐতিহাসিক মূল্যায়নে এও একটা দৃষ্টিভঙ্গি।

নিষিদ্ধ খাদ্য এবং পানীয়ের প্রতি ডিরোজিওপন্থীদের অতিরিক্ত আসক্তি, "শুকর এবং গোমাংসের পথে তাঁদের অগ্রগতি এবং বিয়ারের বোতলের পথ ভেঙে তাদের উদারনীতিতে পৌঁছবার" ব্যাপারগুলোকে তৎকালীন লোকেরা অত্যন্ত খারাপ চোখে দেখেছিলেন। কিন্তু এ-সবের মূলে ছিল প্রচলিত রীতিনীতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা।

দেশের অগ্রগতির কোনও সঙ্কটমুহূর্তে এমন জিনিস ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

সাহেবীয়ানার প্রতি ডিরোজিওপন্থীদের ভয়ানক মোহ ছিল বলে যে অভিযোগ ওঠে, তাতেও যথেষ্ট মাত্রাধিক্য আছে। পরবর্তীকালে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কাছে দেশ ও দেশবাসীকে হেয় করা এক ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ডিরোজিওপন্থীরা আকস্মিকভাবে পশ্চিমী ভাবধারার অপ্রত্যাশিত সম্পদের সম্মুখীন হয়ে কিছুটা দিশেহারা হলেও দেশ এবং দেশবাসীকে কখনও বিস্মৃত হননি। ডিরোজিওর সময় এবং তৎ-পরবর্তীকাল থেকে ইয়ং বেঙ্গলের মনে দেশাত্মবোধের আলোড়ন উঠতে থাকে। ১৮৩১ সাল থেকে কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টান মিশনারীত্ব গ্রহণ করলেও হিন্দু দর্শন এবং শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন। তারাচাঁদ মনুর তর্জমা করেন। জ্ঞানান্বেষণ আংশিকভাবে বাঙলা ভাষায় ছাপা হত। রামগোপাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বাংলা গদ্যকে স্বাগত জানান। প্যারীচাঁদ আর রাধানাথ দুই বন্ধুতে মিলে সরল চলতি ভাষায় একখানি মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করেন। অল্পশিক্ষিত গৃহস্থ বধূদের কাছেও সেই ভাষা অবোধগম্য ছিল না। বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের (টেকচাঁদ ঠাকুর) দান কিরকম গুরুত্বপূর্ণ তা সকলেই অবগত আছেন।

ডিরোজিওপন্থীরা অধার্মিক ছিলেন—এ-অভিযোগও ঠিক নয়। তাঁদের লক্ষ্য ছিল "হিন্দু ধর্মকে তাঁদের যুক্তিবিচারের আদালতে হাজির করা।" ১৮৩২ সালে মহেশচন্দ্র এবং কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টান হয়ে যান। পরবর্তীকালে শিবচন্দ্র হন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রেসিডেন্ট। রামতনুও ব্রাহ্ম সমাজের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্মের গোড়ার দিকে ডিরোজিও-পন্থীরা তাঁর যে সমালোচনা করতেন তা অযৌক্তিক নয়। কৃষ্ণমোহন মন্তব্য করেছিলেন, ব্রাহ্ম ধর্ম "রাজনীতি আর ধর্মের মাঝপথে এসে পৌঁছেছে।" রামগোপাল অভিযোগ করেছিলেন, এর ধর্মান্তরকরণ-বিরোধী অভিযানে ভণ্ডামী আছে। রামগোপাল ঘোষ অন্তর্ভেদী মন্তব্য করে বলেছিলেন, "বেদান্তের অনুগামীরা সুযোগসন্ধানী সুবিধাবাদী······মূর্তিপূজার অবসান একান্তভাবে বাঞ্ছনীয় কিন্তু সেটা ভ্রান্ত পদ্ধতিতে করা আমার কাম্য নয়।···ব্রাহ্মসমাজ খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে শত্রুতার ভাব পোষণ করেন। সেটা মোটেই সৎ কাজ নয়।······প্রত্যেক ধর্মের সেবকরা তাঁদের সহগামীদের যুক্তির কাছে নিজেদের আবেদন নিয়ে যাক।" ডিরোজিওপন্থীদের মধ্যে অনেকেই যে রকম ব্যক্তিগত চরিত্রে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তাও ভোলবার নয়।

হরচন্দ্র এবং রসিককৃষ্ণের গভীর সাধুতা, শিবচন্দ্রের সেবাপরায়ণতা, ১৮৫১ সালে সন্ন্যাসীতুল্য রামতনুর গৌরবময় পৈতা ত্যাগের কথা কে ভুলতে পারে। সমাজে একঘরে হবার হুমকি পেয়েও রামগোপাল নিজের মতবাদ ত্যাগ করেননি, এবং পরিবারের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও রাধানাথ নাবালিকা বিবাহ করতে অস্বীকার করেন। এ ঘটনাগুলিও ভুলবার নয়।

ইয়ং বেঙ্গলের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অনেকগুলোই আমাদের সমগ্র রেনেসাঁসেরই সীমাবদ্ধতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝতে পারেন নি যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শোষণ। তাঁরা এই শাসনের আশু লাভালাভের দিকেই প্রধানত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। আমাদের নবজাগরণের হোতাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক জগতের অধিবাসী শ্রমজীবী জনসাধারণের কোনও যোগাযোগ ছিল না। হিন্দু ঐতিহ্য ও জীবনের দ্বারা তাঁরা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন যে তার ফলে মুসলমান সম্প্রদায় তাদের থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। রেনেসাঁসের এই ঐতিহ্য দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করেছে।

ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রকৃত ব্যর্থতার কারণ এই যে তাঁরা কোনও ক্রমবর্ধমান আন্দোলন এবং কোনও সুনির্দিষ্ট আদর্শবাদ গড়ে তুলতে পারেননি। সম্ভবত পরিপার্শ্বিক অবস্থায় সেটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। এই আন্দোলনের সব চেয়ে স্মরণীয় দান হচ্ছে নির্ভীক জাতীয়তাবাদ এবং নবাগত পশ্চিমী ভাবধারার পুনরুজ্জীবনে অকপট স্বাগত সম্ভাষণ। শতাব্দীর শেষাশেষি এর অনেক কিছুই ঐতিহ্যবাদ, আধ্যাত্মিক রহস্যবাদ, ধর্মান্ধতাবাদ ইত্যাদির স্রোতে ভেসে গিয়েছিল। সেই পরিবর্তন আমাদের জাতীয় জীবনে কোনও মঙ্গল এনেছে কি-না এ সন্দেহ পোষণ করা অন্যায় হবে না।

১৮৬১ সালে কিশোরীমোহন মিত্র বলেছিলেন : "যে তরুণ সংস্কারকামী গোষ্ঠী হিন্দু কলেজে বিদ্যার্জন করেছিলেন, কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার মতো তারাই প্রথম প্রত্যূষের স্পর্শ লাভ করেন।···প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করলে বিপদআপদের সম্মুখীন না হয়ে উপায় নেই। আমাদের বন্ধুরা সমাজচ্যুত হয়ে তার সমস্ত পরিণাম ভুগতে বাধ্য হয়েছিলেন।····· মূর্তিপূজার রীতিনীতি মেনে নেওয়ার অর্থ নিজের নীতি বিসর্জন দেওয়া। অন্যদিকে বিবেকের কাছে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে মূর্তিপূজার রীতিনীতি মেনে না নেওয়া।"

(ইংরেজি থেকে অনূদিত)

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

মিস্ত্রাল-এর অর্থ ভূমধ্যসাগরের শীতল ঝঞ্ঝা প্রবাহ। শ্রীমতী লুসিলা গ্যদয় আলকায়েগা-কে এই ছদ্মনামেই আত্মপ্রকাশ করতে হল। পেশা ছিল চিলি-র এক গ্রাম্য ইস্কুলে শিক্ষকতা। কর্তৃপক্ষ পাছে এই কব্যচর্চাকে অন্যভাবে গ্রহণ করেন তাই গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল (১৮৮৯-১৯৫৭) এই স্বাক্ষরে কবির প্রথম কাব্য 'ডেসলেশন্' ছেপে বেরলো। এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশে ল্যাটিন আমেরিকায় সাড়া পড়ে গেল। ১৯৪৫ সালে এই কাব্যগ্রন্থের জন্যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। শেষ জীবনে কবির ভাগ্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি জোটে। শিক্ষকতা ছেড়ে চিলি-র কন্সাল হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, যেতে হয়েছিল দেশ-বিদেশ। সবচেয়ে বড় কথা এই কাব্যগ্রন্থ তাঁকে শিক্ষিকার চেয়ার থেকে কাব্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

চিলি-র এল্‌কি নদীর উপত্যকায় ভিকুনা গ্রামে লুসিলার প্রথম যৌবন কেটেছে। ইস্কুলমাস্টার পিতার বাতিক ছিল গ্রামের পাল-পার্বন উপলক্ষ্যে গান বাঁধা। লুসিলাও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্বরচিত সহজ ছড়ার মাধ্যমে প্রাথমিক পাঠচর্চা শুরু করাতেন। পদ্য লেখার বাতুলতা তাঁর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত।

বছর কুড়ি বয়েসে রোমিলো উরেতার সঙ্গে তাঁর প্রেম হয়। কী এক অজ্ঞাত কারণে উরেতা-র আত্মহত্যা লুসিলার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয়। প্রথম প্রণয়ের অবসান ঘটে প্রগাঢ় হতাশায়। সেই প্রথম ও শেষ। গভীর সন্তাপে দগ্ধ প্রথম যৌবন মৃত্যুর প্রতি আশ্চর্য শান্ত প্রেমানুভূতির কয়েকটি কবিতা রচনা করে।

উরেতা-র প্রতি ভালবাসা, তাকে হারিয়ে যে অতলান্ত বিবিক্তির অনুভব— এই কবিতা কটি যেন তারই স্বরলিপি। আরো আশ্চর্য, এই বিবিক্তির যে তিক্ততা, যে হাহাকার, তাকে ছাপিয়ে উঠেছে একটি শান্ত প্রেমময় পূর্ণতার অনুভূতি। সন্তান কামনায়, মাতৃত্বে নিবিড় অনুভবে নায়িকার দেহ হয়ে উঠেছে দেউল।

যে-ছেলে কোলে এসে তাঁর প্রেম-কে নারীত্বের সার্থকতা দান করল না— সেই অনাগতের প্রতি গভীর টানে, মমতায় এক পরিশ্রুত জীবনবোধে তাঁর কাব্য সার্থক।

তাই ব্যক্তিমনের শুদ্ধ বিষাদ অন্ধকারের দুয়ার পেরিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে আলোকে। রিল্কের কাব্যে মৃত্যুর যে জগৎ—তা যেমন পর্যায় ভেদে মৃত্যুর মালিন্যবিহীন চলমান জীবনেরই অপাপবিদ্ধ শুদ্ধতা ও শান্তিতে অভিষিক্ত। এই কবির মৃত্যুপ্রেমেও সেই শুদ্ধতার স্পর্শ আছে। 'রাত্রির শিশির ফোঁটায় ফোঁটায় ধরতে মেয়েরা যেমন কলস পেতে রাখে'—বিষয়-পরিকল্পনার সঙ্গে এই ধরনের 'মিথ'-এর মিলনে মিস্ত্রাল-এর কাব্য আরো আবেগবহ হয়ে ওঠে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর মাতৃত্বের অনুভূতির কবিতা। এই কবিতা প্রসঙ্গে বলা হয় 'She became a poet of motherhood by adoption' তাই 'প্রার্থনা' 'ছেলের জন্যে কবিতা মূলতঃ' এই অংশ থেকেই কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ দেওয়া গেল। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় ইতিমধ্যে কবিতাগুলি অনূদিত হয়েছে। মূল স্প্যানিশ থেকে ল্যাংস্টন্ হিউজ ইংরেজিতে সম্প্রতি অনুবাদ করেছেন। বর্তমান অনুবাদের প্রাথমিক প্রেরণা ল্যাংস্টন হিউজের বই থেকেই।

পৃথিবীর প্রতিরূপ

পৃথিবীর প্রকৃত রূপ আগে কখনো দেখিনি।
পৃথিবীকে দেখায় যেন মা—
যে সন্তান কাঁখালে দাঁড়িয়ে
(তার প্রসারিত দু বাহুর আশ্রয়ে জগতের সব জীবকে ধারণ করে)।

মায়ের অনুভব সব এখন আমার জানা
আমার দিকে তাকিয়ে যে উঁচু পাহাড়
সেও তো এক মা,
বিকেলে কুয়াশা দামাল ছেলের মতো
তার কোলে-পিঠে চড়ে খেলা করে।

উপত্যকার বুকে একটা ফাটল দেখেছিলাম, মনে পড়ে।
তার অনেক অনেক নীচে
শিলা আর কাঁটাগুল্মের আড়ালে-আব্ডালে
রূপোলী স্রোত কুলু কুলু গান গেয়ে যেত।

আমিও যেন সেই ফাটল ;
আমার বুকের অতলে
এই ক্ষীণজলধারার গান শুনতে পাই
শিলা আর কাঁটাগুল্মের বদলে
তিলে তিলে শরীরের মাংস দিয়ে তাকে ঢেকে রেখেছি
যতদিন না সে
আলোকের পানে এগিয়ে আসে ।

প্রার্থনা

না, না ! আমার বুকের কুঁড়ি অকালে কেন শুকোবে
ঈশ্বর আমায় এই স্ফীতি দিলেন যদি—
আমার বক্ষ স্ফীত হয়
দীঘির জল যেমন বাড়ে
তেমনি নিঃশব্দে ।
তাদের পীন সঞ্চার আমার কটি ঘিরে
নিবিড় ছায়া ফেলে
একটি প্রতিশ্রুতির।

যদি স্তনযুগল আর্দ্র না হয়
সারা উপত্যকায় আমার মতো দীন তবে আর কে ?
রাত্রির শিশির ফোঁটায় ফোঁটায় ধরতে
মেয়েরা যেমন কলস পেতে রাখে
আমি ঈশ্বরের কাছে
নিজের বুক পেতে দিই ।

তাকে এক নতুন নামে ডাকি—
বলি, পর্জন্য ! তুমি আমায় পূর্ণ করো
জীবনের অন্তহীন জারক-রসে !
এর জন্যে তৃষ্ণার্ত বাছা আসবে
আমার নয়নের মণি ।

অনুভব

এখন জানি, রৌদ্রমতী কুড়িটি বসন্ত মাথায় নিয়ে
মাঠে মাঠে আমায় কেন ফুল কুড়োতে হল ।
কেন ? সুখের দিনে একদা নিজেকে প্রশ্ন করেছিলুম—
উষ্ণ সূর্যের, স্নিগ্ধ ঘাসের এ আশ্চর্য দান
আমায় কেন দিলে ?

সুনীল মৌমাছির মতো আমি আলোক পান করেছি,
বদলে দিয়ে যেতে হবে মধু ।
যে আমার সত্তার ভিতরে লীন
আমার শিরার বিন্দু বিন্দু দ্রাক্ষাসারে
গড়ে উঠছে তার অস্তিত্ব ।

আরাধনা করে আমি সে মৃত্তিকা গ্রহণ করেছি
যাতে তিলে তিলে তার প্রতিমূর্তি গড়ে তুলব ।
আর দুরু দুরু বুকে যখন তাকে একটি কবিতা পড়ে শোনাই
কবিতার ভাব জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো আমাকে জ্বালায়
আমার শরীর থেকে সে আগুন ছড়িয়ে যায় তার শরীরে
অনির্বাণ এই শিখা নিভবে না কোনোদিন ।

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

রাজ্যেশ্বর মিত্র

আজকাল বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনে সঙ্গীতের স্থান নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের যে নিবিড় যোগসূত্র আছে সে সম্বন্ধে সাহিত্যিক সম্প্রদায় সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু আমাদের অতি আধুনিক সঙ্গীত সমাজ এ সম্বন্ধে কতটা সচেতন এবং সেই সচেতনতা আমাদের চলমান সঙ্গীতকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করছে সেটা ভাববার বিষয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে এ চিন্তা মনে উদিত হত না কেননা তখন সাহিত্য এবং সঙ্গীত একসূত্রে গ্রথিত ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে ঐ দুটি বিষয়ের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নানা কারণে ক্ষীণ হতে আরম্ভ করে এবং আজ সাহিত্য ও সঙ্গীতের সম্বন্ধ কতটুকু সেটি চিন্তা করে নির্ণয় করতে হয়। যে সঙ্গীত বাংলাদেশে গত পনেরো কুড়ি বছর ধরে চলে এসেছে, সে সঙ্গীতে সাহিত্যের প্রশ্ন তোলা বোধ হয় নিরর্থক। কেননা তা গ্রামোফোন সিনেমা এবং রেডিওর প্রয়োজন মেটাবার জন্য রচিত হয়েছে। অতএব যে সঙ্গীতে কাব্যটা গৌণ সেখানে সুরের মাধুর্য যে কতখানি প্রকাশ পাবে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। আজ বর্তমান কাব্যসঙ্গীতের মূল্যায়নে সঙ্গীত-সমাজ ভয় পান। যদি কেউ যাচাই করে তার অকিঞ্চিৎকরত্বকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন তবে তাকে আমাদের সঙ্গীতসমাজ ক্ষমা করেন না। কিন্তু, যা আমাদের সেবার বস্তু, যে সেবায় আত্মনিয়োগ করে বহু বৎসর ধরে জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তিরা ধন্য হয়েছেন সেই সঙ্গীত যদি আজ সুবিধাবাদীদের অবলম্বন হয়ে দাড়ায় তাহলে তা পরম ক্ষোভের কথা এবং এই ক্ষোভের প্রকাশ না করেও পারা যায় না।

এ যুগের সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠালে আধুনিক সঙ্গীতসমাজ বলবেন, 'কেন, আজ গানের কত বিভিন্ন রূপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন—কত বৈচিত্র্য আমরা সৃষ্টি করে চলেছি।' উত্তরে বলব, 'হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পারছি—অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র প্রোগ্রামে বিচিত্র নামের নামাবলী অথবা সিনেমার পর্দায় ভঙ্গিসর্বস্ব গানের বৈচিত্র্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, কিন্তু তার আয়ু কতটুকু?

এ বৈচিত্র্য কেবল বৈচিত্র্যের জন্যই—সৃষ্টির প্রেরণা থেকে নয়, উপলব্ধি থেকেও নয়। অনেক বিচিত্র গান আজকাল শুনি তাতে অনেক রকম মিউজিকও থাকে কিন্তু এত সমারোহ সত্ত্বেও বহু বৎসর পূর্বের চার লাইনের গানে যে মানবিক আবেদন ছিল তার এতটুকুও ফোটে না। কেন ফোটে না? তার কারণ উপলব্ধির অভাব। আর, এই উপলব্ধি এবং উপলব্ধিগত প্রেরণা আসে সাংস্কৃতিবোধ থেকে। এই কারণেই শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

যে যুগে রেডিও ছিল না, সিনেমা ছিল না, এমন কি থিয়েটারও ছিল না—সে যুগেও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং সঙ্গীতের একটা পাকা ভিত্তিও ছিল। যাঁরা গান রচনা করতেন তাঁরা অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন না কিন্তু দেশের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় তাঁদের ছিল। দেশের পৌরাণিক ইতিকথা, দেশের প্রচলিত সঙ্গীত, দেশের সামাজিক পরিস্থিতি, দেশের সাধারণ মনোভাব—এইসব মিলিয়েই তাঁরা সঙ্গীত সৃষ্টি করতেন। দাশরথি রায় তেমন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না কিন্তু একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতিবোধ তিনি অর্জন করেছিলেন যার জন্য গানগুলির প্রচুর সমাদর হয়েছে। অপরপক্ষে নিধুবাবু ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি কিন্তু উৎকট রকমের নতুনত্ব তিনি বরাবরই পরিহার করে গেছেন। এমন কি যে হাফ আখড়াই নিয়ে সেকালে ভীষণ হৈচৈ হয়েছিল তাও তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি হিন্দী গান ভেঙে স্বাভাবিক রীতিতে বাংলা গান রচনা করে গেছেন। সে বাংলা গানের সঙ্গে তাঁর স্বকীয়তাও কম যুক্ত নেই। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, দিলীপকুমার—সকলেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন কিন্তু সে বৈচিত্র্যের মূলে আছে গভীর উপলব্ধি। গিরিশচন্দ্রও খুব একটা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না কিন্তু নাটকের গানে সত্যিকারের কিছু বস্তু যাতে থাকে সেদিকে তাঁরও লক্ষ্য ছিল কেননা তিনি পরিশ্রম করে এই সংস্কৃতিবোধ অর্জন করেছিলেন।

আমাদের সঙ্গীতের যে ক্রমিক পরিবর্তন হয়েছে তা লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে একজন সুরকার অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন বটে কিন্তু একজন অপরের নকল করেন নি। এটি সম্ভব হয়েছে, কেননা প্রকৃত শিক্ষা এবং সংস্কৃতিবোধ -জনিত একটি স্বকীয় সঙ্গীত চিন্তা তাঁদের প্রত্যেকেরই ছিল। রবীন্দ্রনাথ পুরানো ঢঙে অনেক টপ্পা, আড়-খেমটা গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মায়ার খেলার গান বা "মরিলো মরি আমার বাঁশিতে ডেকেছে কে" এই ধরনের গানে কখনো পুরানো গানের পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, দিলীপকুমার—প্রত্যেকের সম্বন্ধে এক কথাই বলা যায়।

প্রখর চিন্তাশক্তির দ্বারা প্রত্যেকেই নিজস্ব পথ স্বাভাবিকভাবে বেছে নিয়েছেন।

এত আদর্শ সামনে থাকতেও আজকে যে আদর্শবিচ্যুতি ঘটেছে তার কারণ এযুগের শিক্ষায় যে জিনিস ব্যুৎপত্তির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়—তার অভাব ঘটেছে। আমাদের দেশের গায়কগায়িকারা আমাদের দেশের সঙ্গীত-স্রষ্টাদের গান ধারাবাহিকভাবে শেখেন না। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিবৃত্তির সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ও অল্প। অর্থাৎ দেশের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ নেই। বর্তমান সাধারণশিক্ষার ব্যবস্থা এমনি যে তা চিন্তা বা জ্ঞানকে উদ্বুদ্ধ করে না—কতিপয় পাঠ্যপুস্তকের আবৃত্তিতেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সাধারণশিক্ষার কিছুটা গ্রহণ করে যাঁরা সঙ্গীতজগতে প্রবেশ করেন তাঁরা এক ধরনের শিক্ষালাভ করেন যাকে রাজশেখর বসু মহাশয় বলেছেন বৃত্তিমুখী শিক্ষা। কিছু গান এবং সঙ্গীতের কয়েকটি রূপবদ্ধ তাঁদের মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয় যাতে সঙ্গীতকে তাঁরা বৃত্তি স্বরূপ অবলম্বন করতে পারেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতও আজকাল বৃত্তিমুখী বিদ্যার অন্তর্গত। রেডিওতে প্রোগ্রাম বা গানের ইস্কুলে চাকরি পাবার জন্য ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রসঙ্গীত রীতিমত মুখস্থ করে শেখেন। যারা ধ্রুপদ-খেয়াল শেখেন তাঁরা কাব্যসঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করেন না। যারা কীর্তন শেখেন তাঁরাও তাই নিয়েই থাকেন। সঙ্গীত বৃত্তি অনুসারে নানা সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে গেছে। অন্যান্য বৃত্তিমুখী শিক্ষারও একটা ধারাবদ্ধ প্রণালী থাকে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাও নেই। অথচ, সঙ্গীতের দিক থেকে সেই শিক্ষারই সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল, যাকে বলা হয় বিশেষ শিক্ষা অর্থাৎ যে শিক্ষা সর্বব্যাপী এবং ব্যক্তির নিজের প্রয়োজনে আনন্দের সঙ্গে অর্জিত হয়। পূর্বযুগের সুরকারগণ এই বিশেষ শিক্ষাটিকেই বেছে নিয়েছিলেন, আমাদের ইউনিভার্সিটি বি-এ পর্যন্ত সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন—একটি অ্যাকাডেমি অফ ড্যান্স, ড্রামা অ্যাণ্ড মিউজিকও কলকাতায় আছে ; কিন্তু সবাইকারই উদ্দেশ্য খুব সাধারণ বৃত্তিমুখী শিক্ষা বিতরণ এবং তাও যথোপযুক্ত নয়।

এই পরিস্থিতিতেও যে সঙ্গীত সম্বন্ধে গবেষণা হচ্ছে, সঙ্গীত-সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে এটা সুখের ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গীত প্রয়োগশিল্প সেদিক দিয়ে সমৃদ্ধি না হলে সঙ্গীত অগ্রসর হতে পারে না। সাহিত্য যেমন সঙ্গীতকে ভাবের দিক থেকে মনোহর করে তুলবে সুরও তেমনি স্বীয় মাধুর্যে ভাষাকে যথার্থ সঙ্গীত করে তুলবে সেটাই আমাদের কাম্য। রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যিক

নৃত্যনাট্যে সাহিত্যকে সঙ্গীতের মাধ্যমেই মহত্তর করে তুলেছিলেন। আজকের দিনে আমাদের এই রকম বিচিত্র রীতিতে সার্থক সঙ্গীতসৃষ্টির প্রচেষ্টা করতে হবে। যে সঙ্গীত রামনিধি গুপ্তের যুগ থেকে রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত বহু প্রতিভার প্রযত্নে সুরে এবং সাহিত্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে আজ তার ব্যাপ্তিতে ছেদ পড়েছে। এটা ভাবতেও কষ্ট হয়। এ যুগে সঙ্গীতজগতে রাজত্ব করছে কতকগুলি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী প্রচার-প্রতিষ্ঠানও তাদেরই অনুসরণ করে চলেছে; আর আমাদের গায়কগায়িকারা বৃত্তিমুখী বিত্তার্জন করে তাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করছেন। এ ছাড়া কি আর পথ নেই? এইভাবেই কি আমাদের সঙ্গীতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে? দেশের প্রতিটি সঙ্গীতপ্রতিষ্ঠান, প্রতিটি সুরশিল্পীকে অনুরোধ করি তাঁরা ভেবে দেখুন দেশকে তাঁরা কতটুকু দিয়েছেন আর কতটুকু দেবার যোগ্যতা বা সামর্থ তাঁদের আছে। আজকের দিনে এই আত্মবিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন। সঙ্গীত সম্বন্ধীয় যে শিক্ষা বিতরিত হচ্ছে তাকে সর্বাঙ্গীন করতে হবে, তাকে বৃহত্তর পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে সত্যিকারের সফল রচনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা থেকে যে আগ্রহের অভ্যুদয় হবে একমাত্র সেই প্রেরণাই অবাঞ্ছিত বস্তুকে পরিবর্জন করে স্থায়ী সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হবে।

মার্কিন ফিল্মের ময়নাতদন্ত

প্রদ্যোৎ গুহ

কলকাতা শহরের আটটি চিত্রগৃহে সারা বছর ইংরেজি ছবি দেখান হয়ে থাকে। এর মধ্যে ছটিতে দেখান হয় নতুন ছবি আর বাকী ছটিতে পুরনো ছবি। তাছাড়া উত্তর-দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার অনেকগুলি চিত্রগৃহেই ছুটির দিন সকালে বাছাই-করা ইংরেজি ছবি দেখাবার ব্যবস্থা আছে।

নতুন ইংরেজি ছবি সাধারণত এক সপ্তাহের বেশী দেখান হয় না—এইটা ধরে নিয়ে হিসাব করলে কলকাতা শহরে মাসে প্রায় ২৪টি এবং বৎসরে ২২৮টি ইংরেজি ছবি মুক্তিলাভ করে। আজকাল অবশ্য প্রধাণত বিদেশী মুদ্রার কড়াকড়ির জন্যই পূর্বোল্লিখিত ছটি চিত্রগৃহে মাঝে মাঝে ভারতীয় ছবি দেখান হয়, মাঝে-মাঝে একই ছবি একাধিক সপ্তাহ ধরে রাখা হয়, মাঝে মাঝে এমন কি পুরনো ছবির পুনঃপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। হিসেব থেকে এইগুলি বাদ দিলে প্রদর্শিত নতুন ইংরেজি ছবির সংখ্যা কিছু কমবে। তাহলেও বছরে শ দুই নতুন ইংরেজি ছবি যে কলকাতা শহরে দেখান হয়ে থাকে তাতে সন্দেহ নেই।

আজকাল কিছু কিছু ইতালীয়, ফরাসী এবং রুশ ছবির ইংরেজি সংস্করণও কলকাতায় দেখান হচ্ছে। বিলেতী ছবিও কিছু দেখান হয়। তার সংখ্যা নগণ্য হিসেব করলে দেখা যাবে দুশো বিদেশী ছবির মধ্যে একশো-দেড়শোই হচ্ছে মার্কিন ছবি। বিদেশী মুদ্রা সম্পর্কে কড়াকড়ি হবার আগে পর্যন্ত ভারতের চিত্রগৃহগুলিতে দেশীর চেয়ে আমেরিকান ছবিই বেশী দেখান হত। এখন হয়তো এই সংখ্যা কিছু কমেছে তবু বিদেশী মুদ্রার দুর্ভিক্ষের বাজারেও যে আমেরিকানরা এক ছবি দেখিয়েই আমাদের এই গরীব দেশ থেকে মোটা টাকা মুনাফা লুটে নিয়ে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু ছবি আর পাঁচটা পণ্যের মতো শুধু যে টাকাই লুটে নিয়ে যায় তাতো নয়, জনসাধারণের মনের উপরও রেখে যায় এমন একটা ছাপ—সমাজজীবনে যার প্রতিক্রিয়া হয় সুদূরপ্রসারী। কাজেই কি ছবি আমরা দেখি, কি তার বক্তব্য—সামাজিক স্বাস্থ্যের খাতিরেই তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

॥ দুই ॥

ত্রিশের যুগে এডগার ডেল নামে এক ভদ্রলোক মার্কিন চলচ্চিত্রে বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু অনুসন্ধানাদি করেছিলেন। তারপর আমেরিকার চলচ্চিত্র জগতে কোনো বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটেছে বলে জানা নেই। ডেল সাহেব তখন যে সব ঝোঁক লক্ষ্য করেছিলেন এখন তা শুধু আরও সুস্পষ্ট হয়েছে। কাজেই ডেল সাহেবের অনুসন্ধানের ফলাফল এখনও বলবৎ আছে ধরে নেওয়া যায়।

এডগার ডেল ৫০০ নমুনা ছবি বেছে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানাদি করে দেখেছিলেন তার মধ্যে শতকরা ২৭টি হচ্ছে অপরাধ-বিষয়ক, শতকরা ১৫টি যৌনরসাশ্রিত এবং শতকরা ২৯টির বিষয়বস্তু প্রেম। অর্থাৎ ১৯৩০ সালের নির্মিত আমেরিকার ছবির মধ্যে শতকরা ৭০টি ছিল অপরাধমূলক, আদিরসাত্মক বা প্রেমমূলক। ১৯২০ সালের তুলনায় এই সংখ্যা অনেক বেশী। এ সময় যুদ্ধমূলক ছবি নির্মিত হয়েছিল শতকরা মাত্র ৫টি এবং ইতিহাস-বিষয়ক ছবি শতকরা ২টি। পরবর্তীকালে অবশ্য এই সংখ্যা বেড়েছে। যুদ্ধের ছবির কাজ দাঁড়িয়েছে একদিকে জঙ্গীবাদ প্রচার করা এবং অন্যদিকে মানুষের মনের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলিকে আঘাত-আঘাতে ক্রমশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলা। আর ইতিহাস-বিষয়ক ছবি চেয়েছে ইতিহাসকে বিকৃত করে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সাফাই গাইতে। ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রিত ছবিতে ইতিহাসের এই বিকৃতি যে অজ্ঞতা-প্রসূত নয়, স্বেচ্ছাকৃত—Film in the Battle of Ideas গ্রন্থে হলিউডের একদা বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার জন হাওয়ার্ড লসন প্রচুর তথ্যাদি সহযোগে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। উৎসাহী পাঠক বইটি পড়ে দেখতে পারেন। অবশ্যই এর ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু এ কথা তো সুবিদিত, ব্যতিক্রম বিষয়কেই সপ্রমাণ করে।

১৯৩০ সালে যত ছবি নির্মিত হয়েছে তার শতকরা ৫০টির ঘটনাস্থল আমেরিকা। এর মধ্যে অর্ধেকের ঘটনাস্থল নিউ ইয়র্ক। শতকরা ৪৩টি ছবিতে শয়নকক্ষের দৃশ্য আছে। লাইব্রেরির দৃশ্য আছে যেসব ছবিতে—তাতে কখনও কোনো চরিত্রকে পাঠরত অবস্থায় দেখেন নি এডগার ডেল।

মার্কিন সিনেমায় পাত্রপাত্রীদের যেসব বাসগৃহ দেখান হয় তার মধ্যে শতকরা ২২টি হচ্ছে ধনকুবেরদের প্রাসাদ, শতকরা ৪০টি বিত্তশালীদের গৃহ, শতকরা ২৫টি মোটের উপর স্বচ্ছল অবস্থার সাক্ষ্য বহন করে আর শতকরা মাত্র চারটিতে দারিদ্রের ছাপ আছে।

একশো পনেরোটি ফিল্মের ৮১১টি চরিত্রের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন নায়ক এবং ৪৪ জন নায়িকা ধনী বংশোদ্ভূত। মোটের উপর স্বচ্ছল অবস্থার নায়কের সংখ্যা শতকরা ৪৪ এবং দরিদ্র নায়কের সংখ্যা শতকরা ১১। নায়িকাদের মধ্যে শতকরা ৪৪ জনের অবস্থা মোটের উপর স্বচ্ছল। শতকরা মাত্র ১৩ জন নায়িকা দরিদ্র বংশোদ্ভূত। খল-নায়কদের মধ্যে শতকরা ৪৪ জন ধনী এবং শতকরা মাত্র ৪ জন দরিদ্র। খল-নায়িকাদের মধ্যে ধনীর সংখ্যা শতকরা ৬৩ এবং দরিদ্রের সংখ্যা শতকরা ৫।

ছবির পাত্রপাত্রীদের পেশা সম্পর্কে খোঁজখবর করলেও এই একই ঝোঁক পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। মার্কিন ছবিতে শ্রমিক বংশসম্ভূত প্রধান চরিত্রের দেখা মিলবে কদাচিৎ—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেশাদার লোক শিল্পপতি কি সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসার কি টাকার কুমির ও তাদের স্ত্রীদের দেখা যাবে—কালহরণ ছাড়া তাদের অন্য কোনও কাজ নেই। মেক্সিকান, নিগ্রো কি চীনাদের কদাচ ভালো চোখে দেখান হয় না। ফরাসী পাত্রপাত্রী যদি কখনও থাকে তবে তাদের দেখান হয় কৌতুক চরিত্ররূপে।

এইভাবে এই তথাকথিত প্রমোদ চিত্রগুলি একদিকে যেমন সূক্ষ্মভাবে জাত্যাভিমান প্রচার করে অন্যদিকে তেমনি মোহসৃষ্টি করে বিত্তশালীদের সম্পর্কে।

মার্কিন চলচ্চিত্রের কাহিনী বিশ্লেষণ করেও ডেল সাহেব মোটের উপর একই ছবি দেখতে পেয়েছেন। মার্কিন চলচ্চিত্রের মূল বক্তব্য—প্রত্যেকে আমরা নিজের তরে। স্বার্থই হচ্ছে জগতের চালিকা-শক্তি। স্বার্থসিদ্ধির নামই সাফল্য। সকল শ্রমিক কিংবা যে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেছে, যে নায়িকা ঈপ্সিত নায়কের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে, যে গোয়েন্দা অপরাধীকে ধরতে পেরেছে—এদেরই কেন্দ্র করে বিবর্তিত হয় মার্কিন চলচ্চিত্রের কাহিনী। যে বড়ো গোছের একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পেরেছে তারপক্ষে আমেরিকান চলচ্চিত্রের নায়ক হওয়া সহজ—কিন্তু যে জোরদার একটা শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পেরেছে তার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার কোনো আশা নেই।

জীবন সম্পর্কে কোনো বিশেষ মনোভঙ্গি বা কোনো বিশেষ মূল্যবোধ গ্রহণ বা বর্জন করতে দর্শকসাধারণকে প্রভাবিত করাকে যদি প্রচার বলি তাহলে এই সব তথাকথিত প্রমোদ-চিত্রেও এক ধরনের প্রচার নিশ্চয়ই স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে অনুস্যূত হয়ে আছে। ডেল সাহেবের জরীপের ফলাফল আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ল্যাস্কি স্পষ্ট লিখেছিলেন : In the total result, the cinema

is thus bound to be weapon that, in all normal circumstances, is used to preserve the *status quo*. It is not a challenge but an anodyne. (The American Democracy, pp. 694)

তথাকথিত মার্কিন প্রমোদ চিত্র স্থিতাবস্থা বজায় রাখার স্বপক্ষে প্রচারকার্য চালাবার হাতিয়ার। আর এই স্থিতাবস্থা যে পুঁজিবাদ তা বোধ হয় না বললেও চলবে। আমাদের "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের" সঙ্গে মার্কিন ছবির এই ছাঁচ কি করে খাপ খায় জানি না। অথচ দেখছি ঢালাওভাবে এই সব ছবি এ দেশে প্রদর্শিত হচ্ছে বিনা প্রতিবাদে।

॥ তিন ॥

এতক্ষণ আমরা এ প্রবন্ধে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যে সূক্ষ্ম ধরনের প্রচারকার্য চালান হয়ে থাকে তার সম্পর্কেই আলোচনা করেছি। তার মানে এই নয় যে মার্কিন ছবির প্রচারকার্য সব সময়ই খুব সূক্ষ্ম। নেহাত স্থূলধরনের প্রচারমূলক ছবিও এদেশে দেখান হন। কিন্তু এই ধরনের ছবির ক্ষতি করবার ক্ষমতা কম, কেননা দর্শকসাধারণ খালি চোখেই এই প্রচার ধরে ফেলতে পারেন। তবু এ সম্পর্কে একটা-দুটো কথা না বলে পারছি না।

মনে পড়ে, ১৯৫৭ সালে 'ক্যালকাটা' নামে একটি হলিউডের ছবি কলকাতার কোনো এক চিত্রগৃহে দেখান হয়েছিল। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, একটা ভয়-মিশ্রিত কৌতূহল নিয়েই দেখতে গিয়েছিলাম ছবিটা। আশঙ্কা ছিল, হলিউডের চশমায় কলকাতার যে ছবি ধরা পড়বে তা হয়তো আমাদের পক্ষে সম্মানজনক হবে না। আমার আশঙ্কা মিথ্যা হয় নি। সে ছবিতে চোর-ডাকাত-গুণ্ডা-বদমায়েসের শহর হিসেবেই চিত্রিত হয়েছিল কলকাতা। মনে আছে, অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এই ধরনের কুৎসাপ্রচারের প্রতিবাদ করে খবরের কাগজে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। ছাত্রবন্ধুদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ফলত, ছবিটির প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং এখানেই এর সমাপ্তি ঘটে নি। প্রাচ্যের বড়ো বড়ো শহরগুলির নাম দিয়ে হলিউড আজ পর্যন্ত যে সব ছবি তৈরি করেছে—তার সবগুলিই এই ধরনের কুৎসামূলক ছবি। দুঃখের এবং লজ্জার কথা এই যে এ-সব ছবি এদেশে বিনা বাধায় প্রদর্শিত হয়েছে এবং হচ্ছে। দর্শকসমাজ দু-একবার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু তাতে ফল হয়নি।

বলা হয়ে থাকে, ভারতবর্ষ সহ-অবস্থান-নীতিতে বিশ্বাসী, পঞ্চশীল ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতির বনিয়াদ। অথচ আমাদের উদারচরিতানাম 'সেন্সর বোর্ড' সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার বিকৃত কুৎসামূলক এবং যুদ্ধবাদী ছবি চোখ বুজে পাশ করতে কখনও দ্বিধা করেছেন বলে শুনিনি। বিদেশী পরিচালিত সিনেমাগুলিতে ভারতীয় সংবাদচিত্র না দেখিয়ে দেখান হয় মার্কিন বা বিটিশ সংবাদচিত্র—নির্জলা ঠাণ্ডালড়াইয়ের রাজনীতি প্রচার করাই যার লক্ষ্য। সরকার এ-সম্পর্কেও কোনোরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

সৌভাগ্যের বিষয় যে এইসব ছবি সাধারণত এত স্থূল প্রচারমূলক হয়ে থাকে যে জনচিত্তে তার প্রতিক্রিয়া হয় সামান্যই। এদেশে একদল লোক অবশ্য আছেন মার্কিন নর্দমার যে কোনো নোংরা যারা উপাদেয় ভোজ্যরূপে গলাধঃকরণ করে থাকেন। তাদের কথা আমরা এখানে ধরছি না। তারা সংখ্যায় এত নগণ্য যে মার্কিন প্রেমে ডগমগ হয়ে যদি তারা দুবাহু তুলে নৃত্য করতেও শুরু করেন তাতে বরং বঙ্গদেশে রঙ্গরসই জমবে ভালো!

কিন্তু দুঃশ্চিন্তার কারণ ঘটে আর এক ধরনের ছবি সম্পর্কে। তা হচ্ছে যৌনরসাত্মক ও অপরাধমূলক ছবি। তরুণ বয়স্কদের অপরিণত মনের উপর এই ধরনের ছবির প্রতিক্রিয়া যে বিশেষ ক্ষতিকারক—হয়তো খোদ মার্কিন দেশের সমাজবিজ্ঞানীরাও আজ না স্বীকার করে পারছেন না।

আমাদের দেশের সেন্সর বোর্ডের রক্ষণশীল এবং নীতিবাদী বলে দুর্নাম আছে। শোনা যায়, মা সন্তান চুম্বন করছে এ-দৃশ্যও তারা কোনও বাংলা ছবি থেকে কেটে বাদ দিয়েছিলেন। অথচ রোমহর্ষক সব মার্কিন ছবি তাঁরা যে-রকম অবলীলাক্রমে পাশ করে দেন তা দেখে সত্যই বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

চ্যাপলিন ও লাইমলাইট

ভবানী চৌধুরী

সম্প্রতি কলকাতার মিনার্ভা সিনেমায় প্রদর্শিত লাইমলাইট দেখে অভিভূত হই, কারণ দুঃখে-সুখে, জীবনের নব নব পরিণতির এক হৃদয়গ্রাহী ছবি মেলে একটি বয়স্ক ভাঁড় (ক্যালভেরো) ও একজন যুবতী নর্তকীর (টেরী) কাহিনীতে। পরিচালক চার্লি চ্যাপলিন স্পৃষ্ট ক্যালভেরো ও টেরী, তাদের আশা ও হতাশা, হর্ষ ও বিষাদ আমাদের মন গভীরভাবে আলোড়িত করে।

কবির ভাষায় বলতে হয় ক্যালভেরো ও টেরী "উভয়ে উভয়ত সম্বন্ধের নদী এক বিচ্ছেদ-মিলনে।" দিনে দিনে ঐ সম্বন্ধের বিস্তার ও নব নব বিকাশ দেখি লাইমলাইটে। ক্যালভেরো কর্তৃক টেরীর প্রাণরক্ষায় কাহিনীর শুরু এবং শেষ রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বে ক্যালভেরোর মৃত্যুতে যখন লাইমলাইট (মঞ্চ আলোকিত করার জন্য ব্যবহৃত অতি প্রখর আলো) নৃত্যপরা টেরীর ওপর। ঐ নাটকীয় পরিণতির দিকেই এগিয়ে নিয়ে যায় মাঝখানের ঘটনাসমূহ। যেমন ক্যালভেরোর সাহায্যে টেরীর আত্মবিশ্বাস অর্জন ও ক্রমশ রঙ্গমঞ্চে প্রধান নর্তকীর সম্মানলাভ আর ক্যালভেরোর (অতীতে প্রহসনের অভিনেতা হিসেবে যার খ্যাতি ছিল) পতন ও আবিষ্কার, যে জীবনটা কেবল ভাঁড়ামো নয়।

চ্যাপলিনের মহত্ত্ব এই যে তিনি ক্যালভেরো-টেরীর কাহিনী কোনও সংকীর্ণ ছকে ফেলেন নি, কেননা, তিনি জানেন যে জীবনের ব্যাপ্তি তাতে ধরা পড়ে না। লাইমলাইটের প্রতিটি মুহূর্ত বিচিত্র রঙে রঙিন; দর্শক কখনও হাসিতে ফেটে পড়েন, আবার কখনও বেদনায় তাঁর চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত দেখায়। বৈচিত্র্য মেলে ছোট বড় নানা ঘটনায় ও দৃশ্যে: জুতোর তলা শুঁকে ক্যালভেরোর গ্যাসের গন্ধ পরীক্ষায়; অচেতন অবস্থায় শায়িত টেরীর পবিত্র মুখখানিতে; স্বপ্নে শূন্য প্রেক্ষাগৃহ দর্শনে হাস্যরসাত্মক অভিনেতার ছলছল চোখ; মমতায় ভরা দৃষ্টিতে ক্যালভেরোর নিদ্রিত টেরীর দিকে তাকানোয়: ঘরভাড়া বাকীর কথা মনে হওয়ার পর স্থূলাঙ্গী বাড়িওয়ালীর সঙ্গে তার প্রেমের অভিনয়ে; থিয়েটার থেকে ফিরে অকৃতকার্য ক্যালভেরোর ভেঙে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অজান্তে পঙ্গুভাব কাটিয়ে টেরীর দাঁড়ানোয়; ক্যালভেরোর প্রতি ভালবাসা ও

আনুগত্যের তাগিদে টেরীর তরুণ সুরকারকে না চেনার ভান করায় ; দুর্বল মুহূর্তে টেরীর সাফল্যের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেও কিছু নয় বলে ক্যালভেরোর তা অস্বীকার করার প্রচেষ্টায় ; ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যেও ওর বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত রচনার প্রয়াসে এবং মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েও টেরীকে শিল্পকর্মের সাথী করে পৃথিবী ভ্রমণের কল্পনায়।

হাসি-কান্নার যে মিশ্র সুরে চ্যাপলিন ক্যালভেরো-টেরীর কাহিনী রূপায়িত করেন তার ফলেই ছবিটির নাটকীয়তা দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করে। অথচ সহজ পথে দর্শককে ভোলাতে চান না বলেই ওঁর ছবি ভাবপ্রবণতার আধিক্যে বা কুৎসিত ভাঁড়ামোয় কিংবা অপ্রয়োজনেও ক্যামেরার চমকপ্রদ ব্যবহারে দুষ্ট নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখযোগ্য স্বপ্নের দৃশ্যটি—কল্পিত একটি কীট, ফিলিসের সঙ্গে ক্যালভেরোর সংলাপে (যেমন প্যান্ট হাতড়াতে হাতড়াতে বলা : "ফিলিস, তুমি বহুদূরে চলে গেছ")। যখন সিনেমার দর্শকরা আর হাসি চেপে রাখতে পারছে না ঠিক সেই মুহূর্তেই হঠাৎ ক্যালভেরোর মুখে বেদনার ছায়া পড়ে আর পর্দায় দেখা যায় শূন্য একটি প্রেক্ষাগৃহ। স্বপ্ন যখন শেষ হয় তখন দেখি ক্যালভেরো ঘরে শুয়ে আছে আর দেয়ালে অভিনেতার পোশাকে তার একটি ছবি (ছবিটি সম্ভবত তোলা হয়েছিল যখন হাস্যরসাত্মক অভিনেতা হিসেবে ক্যালভেরোর খ্যাতি ছিল)। এখানে শূন্য প্রেক্ষাগৃহটি পর্দে দেখানোয় অযথা দর্শককে চমকে দেবার কোনও ইচ্ছে পরিচালকের নেই। বরং হাসির বৈপরীত্যে, চার্লির মুখভঙ্গি পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, শূন্য প্রেক্ষাগৃহটি একটি তীব্র বেদনার মুহূর্তকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ দিতে সাহায্য করে।

প্রকৃতপক্ষে ছবিটিতে এমন কোনও পরিস্থিতি চ্যাপলিন নির্বাচন করেন নি—যা একটি সরল রেখায় আঁকা। নর-নারীর সম্পর্ক আবিষ্কার যেখানে শিল্পসৃষ্টির প্রধান আধার সেখানে যে সরলীকরণের সুযোগ খুব কম একথা পরিচালক জানেন।

ওঁর ঐ বিশ্বাসের স্বাক্ষর মেলে "পক্ষাঘাতগ্রস্ত" টেরীর উঠে দাঁড়াবার দৃশ্যটিতে, প্রধান নর্তকীর ভূমিকায় নির্বাচিত হবার পর (ইতিমধ্যে নর্তকীর চেহারার মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে, মুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ পড়েছে) টেরীর ক্যালভেরোর প্রতি প্রেম-নিবেদনের অংশে এবং ক্যালভেরোর মৃত্যু দৃশ্যে। প্রত্যেকটি দৃশ্যই পূর্ণ তাৎপর্য পায় দুটি নর-নারীর চলিষ্ণু সম্পর্কের টানাপোড়েনে এবং তাদের ব্যক্তিগত শিল্প-জীবনের আশা-হতাশার পরিপ্রেক্ষিতে। টেরীর

উঠে দাঁড়ানোর দৃশ্য নর্তকী হিসেবে ওর প্রতিষ্ঠার সূচনা করে। কিন্তু এই দৃশ্যের নাটকীয়তা সার্থক হয় ক্যালভেরোর এক মুহূর্ত পূর্বের হতাশার বৈপরীত্যে (থিয়েটারে সেদিন ক্যালভেরোর হাসাবার চেষ্টা একেবারে সফল হয়নি, দর্শকরা একের পর এক রঙ্গমঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেছে)।

টেরীর প্রেম-নিবেদনের মুহূর্তের গভীরতা উপলব্ধি করা যায় না কয়েকটি ঘটনাপরম্পরা ব্যতীত (যেমন, একই থিয়েটারে টেরীর প্রধান নর্তকীর এবং ক্যালভেরোর ভাঁড়ের পদ প্রাপ্তি এবং টেরী কর্তৃক তরুণ সুরকারকে চিনতে অস্বীকার করা)। অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে (যে মঞ্চতর লাইমলাইট একদিন ওর ওপর পড়ত) বসে টেরীর নাচ দেখতে দেখতে ক্যালভেরো কিন্তু অনুভব করে কেন অনেকদিন পর তরুণ সুরকারের সাক্ষাতে টেরীর হাত ঠাণ্ডা হওয়া সত্ত্বেও সে তাকে চিনতে চায় না (এখানে যে ক্যালভেরো তাকে স্নেহমমতা দিয়ে শিল্পী হিসেবে তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করেছে, তার প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য টেরীর কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায়)। ক্যালভেরো টেরীকে একজন সত্যি-কারের শিল্পী বলে অভিনন্দন জানায় কিন্তু যুবতী নর্তকীর বিয়ের প্রস্তাব তার কাছে অসম্ভব মনে হয় (লাইমলাইটের গোড়াতে চ্যাপলিন বলেই দিয়েছেন যে যৌবনের আগমনে বার্ধক্যকে পথ করে দিতে হয়; তাইতো ক্যালভেরো চায় যে টেরী তরুণ সুরকারকেই জীবনের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করুক)।

হাসি-কান্নায় মেশানো নর-নারীর সম্পর্কের যে নাটকীয় রূপ দিতে চ্যাপলিন সচেষ্ট তারই স্বাভাবিক পরিণতি দেখি ছবিটির শেষ দৃশ্যে, ক্যাভেরোর মৃত্যুতে। পরিণতির স্বাভাবিকতা মানে এই নয় যে ক্যাভেরোর মৃত্যু ঘটে এমন একটি ছকে যা দর্শক মাত্রেই প্রথম থেকে অনুমান করে। ঐ মৃত্যু আসে এমনি একরাতে যখন পর্দায় দেখি অনেকদিন পর ক্যালভেরো এত হাসাতে সমর্থ হয় যে তারা তাকে মঞ্চ ছেড়ে যেতে দিতে রাজী নয় (সিনেমার দর্শকরাও ক্যাল-ভেরোর হঠাৎ পা ছোট হয়ে যাওয়াতে, বেহালার ছড় দিয়ে গোঁফ মোছাতে এবং পিয়ানোর বেসুরো শব্দে হাসি চেপে রাখতে পারে না)। বেহালা বাজাতে বাজাতে ক্যালভেরো যখন মঞ্চের নিম্নস্থিত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আটকা পড়ে শির-দাঁড়ায় গুরুতর আঘাত পায় তখনও রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের তুমুল হাততালির মধ্যে সে বেহালা বাজিয়ে যায়। এমন কি কয়েকজন কর্মীর ওপর ভর করে মঞ্চে পুনঃপ্রবেশের পর ক্যালভেরো যখন বলেন, "আমি চেয়েছিলাম চালিয়ে যেতে কিন্তু আমি আটকা পড়েছি" তখনও তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। রঙ্গমঞ্চে

বহুদিন পর ক্যালভেরোর এই অসামান্য সাফল্যের বৈপরীত্যে মঞ্চের অভ্যন্তরে ওর মৃত্যুর (শায়িত অবস্থায় মঞ্চের পার্শ্ব থেকে টেরীর নাচের শুরু দেখতে দেখতেই ক্যালভেরো মারা যায় আর সেই মুহূর্তেই ওর দেহ আচ্ছাদিত করা হয়) পূর্বের কয়েকটি মুহূর্তের নাটকীয়তা আমাদের চিত্ত মথিত করে। থিয়েটারের কর্মকর্তার ক্যালভেরোকে অভিনন্দন জানাতে এসে দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া, এ্যাম্বুলেন্স ডাকার জন্য তৎপরতা, টেরী, তরুণ সুরকার ও ডাক্তারের উপস্থিতি, সব মিলিয়ে ঐ কয়েকটি মুহূর্ত যেন আমাদের বেদনার পাত্র পূর্ণ করে।

ক্যালভেরোর মৃত্যু যে আমাদের মন এত স্পর্শ করে তার কারণ আমরা ছবিটির ঘাত-প্রতিঘাত দেখি প্রধানত ঐ ভাঁড়টির চোখে। চ্যাপলিন-অভিনীত ক্যালভেরো প্রহসনের অভিনেতাও, আবার (টেরীর ভাষায়) দার্শনিকও বটে। হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে নিজের ব্যর্থতায় যেমন সে ভেঙে পড়ে তেমনি জানে যে বেশী গুরুগম্ভীর হয়ে পড়ার জন্যই তার ঐ ব্যর্থতা। বাঁচার আকাঙ্ক্ষাই যে মূল কথা, জীবনের অর্থ খোঁজা নয়, টেরীকে এই কথাই সে বারবার বোঝায়। এ চরিত্র কখনও এক জায়গায় থেমে যায় না, নিজেকে ভেঙে গড়ে, এগোয়, মৃত্যুর পূর্বেও যার নব পরিণতি দেখি একটি বেহালা ও একটি ভাঙা পিয়ানো কেন্দ্র করে বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত রচনায়। সর্বোপরি ক্যালভেরোর চরিত্রের যে বিষাদ ও মাধুর্য টেরীকে আকর্ষণ করে সেই একই গুণে সিনেমায় দর্শকের চিত্তও সে জয় করে। এই ক্যালভেরোকে আবার কল্পনা করা যায় না চার্লির অত্যাশ্চর্য অভিনয় ছাড়া (চ্যাপলিনের পাশাপাশি টেরীর ভূমিকায় ক্লেয়ার ব্লুমের কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয়ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য)। ক্যালভেরোর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, তার দুঃখ ও সুখ, জীবনের প্রতি তার অসীম মমতা মূর্ত হয়ে ওঠে চার্লির কণ্ঠের বৈচিত্র্যে, দ্রুত মুখভঙ্গি পরিবর্তনে এবং চলাফেরায়। অভিনয়ের ঐ সুর—বৈচিত্র্যের ফলেই ক্যালভেরোর চরিত্রের গভীরতা অনুভব করা যায়। এমনই চার্লির অভিনয়-ক্ষমতা যে দীর্ঘ সংলাপও তিনি এমনভাবে ক্যালভেরোর চরিত্রে মেলান যে কোনও সময়ই দর্শকের পক্ষে তা পীড়াদায়ক হয় না। চার্লি (ক্যালভেরো) যখন জানালায় বসে টেরীর সঙ্গে তরুণ সুরকারের পুনর্মিলনের কাল্পনিক চিত্র আঁকেন (টেরীকে যখন বলেন কি করে প্রদোষকালে সুরকারের সঙ্গে তার প্রেম বিনিময় হবে) তখন তাঁর মুখে এক আশ্চর্য নরম ও মধুর আভা দেখি কিন্তু পরমুহূর্তেই, ক্যালভেরোর সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, চার্লির মুখভঙ্গির পরিবর্তন হয়, স্মিতহাস্যে তিনি ক্যালভেরোর কল্পনাপ্রবণ

স্বগতোক্তি শেষ করেন এই বলে, "আমি কোথায় ?" ক্যালভেরোর চরিত্রের যে দিক ফুটিয়ে তুলতে চ্যাপলিন সবচেয়ে যত্নবান তা ওর অসীম মমতা যা প্রকাশ পায় বিশেষ করে টেরীর প্রতি তার ব্যবহারে, অসুস্থ অবস্থায় ওর বিছানার চাদর ঠিক করে দেওয়ায়, খাবার তদারকে এবং ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করায়। টেরী যে শিল্পী এই আবিষ্কারে টেরীর প্রতি ক্যালভেরোর মমতা আরও গভীর হয়।

বস্তুতপক্ষে জীবনের প্রতি যে মমতা চার্লি আরোপ করেন ক্যালভেরোর চরিত্রে (যার পরিচয় ছবির প্রথমেই পাই, যখন মাতাল অবস্থা সত্ত্বেও বাড়ির বাইরে কয়েকটি শিশুকে দেখে স্নেহপূর্ণ হাসিতে ক্যালভেরোর মুখ উদ্ভাসিত হয় এবং সে হয়তো ঈষৎ উঠিয়ে ওদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করে) তাই পরিচালককে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে মানুষকে বুঝতে। স্বভাবতই চার্লি-সৃষ্ট ক্যালভেরো জোরের সঙ্গে বলে ঘৃণাই জীবনে অনর্থের মূল। ক্যালভেরোর মতে জনতার আচরণ কখনও কখনও বোধগম্য না হলেও (এখানে কালভেরোর প্রতিক্রিয়া বিচার করতে হয় থিয়েটারে ওর প্রহসন অভিনয়ের প্রতি জনতার অবজ্ঞা প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে) ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেক মানুষই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন।

তিনটে চড়ুই ও একটা মাছি

সত্য গুপ্ত

মাছিটা বারবার উড়ে এসে বসে।

মুখের চারদিকে বার কয়েক চক্কর দিয়ে এসে বসে পড়ে নাকের ডগায়। সামনের সরু সরু পা দুটো ঘসে ঘসে সুড়সুড়ি ছড়াতে ছড়াতে কি যেন পরখ করে খুঁটেখুঁটে। দারুণ অস্বস্তি লাগে। দু চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সুড়সুড়ি ছড়াতে ছড়াতে অমনি খুঁটেখুঁটে পরখ করে দেখত বাণেশ্বর। গা ঘিনঘিন করে, কাঁটা দিয়ে ওঠে। নাকের ডগাটা কুঁচকে ওঠে চন্দ্রার। সঙ্গে সঙ্গেই মাছিটা উড়ে যায়। দু পাক ঘুরে, দুবার ওঠবোস করে আবার নেমে আসে গালের উপরে।

বিশ্রী মদা গন্ধ উঠছে স্নোটার। অনেক দিনের পুরানো। পুরানো হলেই পচে যায়। গন্ধ ওঠে। অনেক দামী ছিল স্নোটা। দামী জিনিসও পচে যায়। পচন ধরলেই ঝাঁঝ ওঠে, গন্ধ ছড়ায়। প্রথমে ঝাঁঝ ওঠে পরে গন্ধ ছড়ায়। দুর্গন্ধ আর দুর্নাম। চন্দ্রার মেজাজেও ঝাঁঝ উঠত। তিড়বিড় করে উঠত কারণে-অকারণে। বিগড়ে যেত। কে এনে দিয়েছিল স্নোটা? বাণেশ্বর না শিলাদিত্য? না ও নিজেই কিনে এনেছিল নিউমার্কেট থেকে? কিছুতেই মনে করে উঠতে পারে না চন্দ্রা। জানা কথা তবুও মনে পড়ে না। পারে না স্মৃতির কৌটা খুলে কথাটাকে টেনে বের করে আনতে। মাছিটা গালের উপরে হেঁটে বেড়ায়। ডানার অস্ফুট ক্ষীণ কাঁপনের মতো মিহি একটু সুড়সুড়ি লাগে। ইচ্ছে করলে এক্ষুনি মাছিটাকে উড়িয়ে দিতে পারে। একটু হাততোলা ইশারা করলেই উড়ে পালাবে মাছিটা। কিন্তু পারে কি হাত তুলতে? কেমন যেন অসাড়। শুধু হাত দুটো নয়, সারা গায়ের সমস্ত স্পন্দনই জমে গিয়ে অসাড় হয়ে গেছে। শিলাদিত্য সেন। ভারি অদ্ভুত লেগেছিল নামটা শুনে। অদ্ভুত, একক। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল চন্দ্রা। চমকে উঠেছিল। কবে এসেছিল জোড়-ছাড়া চড়ুইটা? বেজোড়, বাউণ্ডুলে, দামাল চড়ুইটা?

তাকিয়ে থাকতে থাকতে শুকনো চোখ দুটো জলে ভরে আসে। জ্বালা করে, কান্নার ভেজা জলে নয়। চোখ জ্বালা-করা বাষ্প-গলা গরম জলে।

তবুও কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারে না চন্দ্রা। দেখতে দেখতে কত তুচ্ছ জিনিসের ভিতরেও কত যে বিশাল পৃথিবী এসে ধরা দেয় তা কি আগে কোনোদিন লক্ষ্য করেছে চন্দ্রা? কেউ কি লক্ষ্য করে? রঙ বদলায়, রূপ বদলায়, বদলায় গতি, প্রকৃতি আর সম্পর্ক। কত দিন ধরে দেখছে ওদের? দু মাস, তিন মাস, না ছ মাস? না অনন্তকাল ধরেই দেখে আসছে চন্দ্রা? মনে হয় অনন্তকাল ধরেই দুটো চোখের অপলক একাগ্র দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে চন্দ্রা, আর ওর চোখের সামনে অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের অনন্ত পৃথিবী এসে ধরা দিচ্ছে। জানালার ওপারের তিনতলা বাড়িটার শ্যাওলা ধরা দেয়ালের ফোকরে এসে বাসা বেঁধেছিল ওরা। জোড়ের এক জোড়া। ভোরের আলোর ইশারায় ফোকর ছেড়ে বেরিয়ে এসে বসে দোতালার ভাঙা কার্নিশের উপরে। অস্থির, চঞ্চল। এক মুহূর্ত বসে কি শান্ত হয়ে? নাচে লাফালাফি করে। না লাফালেও লেজ নাড়ে ঘনঘন আর ডাকে চিরিপ চিরিপ করে। দারুণ বিরক্তি লাগে চন্দ্রার। বড্ডো বেশি অস্থির, বেশি চঞ্চল। আর তেমনি বকবক করে দিনরাত। কান দুটো ঝালাপালা হয়ে ওঠে, হাঁপ ধরে। কেন একটু চুপ করে, একটু শান্ত হয়ে বসতে পারে না? চুপচাপ পাশাপাশি বসে নীরবতা মুখর করে তোলে না নিবিড়তায়? বুকের ভিতরটা ছট্‌ফট্‌ করে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে। উড়ে যায় মাছিটা। কাঁপা কাঁপা ডানার বাদ্যি বাজিয়ে আরতি জুড়ে দেয় ওর মুখটাকে ঘিরে। কয়েক পাক ঘুরে আবার নেমে আসে গালের উপরে। এতক্ষণে নেমে আসে চড়ুইটা—বেজোড় বাউণ্ডুলে আর দামাল চড়ুইটা। প্রথমে ছিল না। আগে কোনোদিন দেখেনি চন্দ্রা। হঠাৎ একদিন উড়ে এসে জুড়ে বসে। জোড়ের মরদটা তখন ঘরবাঁধার নেশায় বিভোর। ঘর বাঁধে আর ফাঁকে ফাঁকে দু পাক নেচে নেয় মেয়েটাকে ঘিরে। দু পাক নেচেই আবার উড়ে চলে যায়। প্রথম দেখেই বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠেছিল চন্দ্রার। হাতুড়ি পিটতে শুরু করেছিল হৃদপিণ্ডটা। কিছুতেই চোখ দুটো ছিঁড়ে আনতে পারেনি। আজও পারে না। ভোর না হতেই জানালার ওপারের তে-তলা বাড়িটা টানতে থাকে ওকে। কার্নিশের ওপরের ফোকরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে। দু চোখে শবরীর প্রতীক্ষা। রোজই আসে। রোজই আসত শিলাদিত্য, তবুও দুচোখে জেগে থাকত শবরী। দূর থেকে ঘাড় বাঁকিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকে চড়ুইটা। তারপর আপন মনেই নাচতে শুরু করে। ভঙ্গিটা গম্ভীর, তেজালো-অহমিকায় ঋজু। অহমিকা? না, লাজুকতা? কাতমেরে

আড়েআড়ে দেখে মেয়ে-চড়ুইটা। একবার এ-চোখে, একবার ও-চোখে। নাচতে নাচতে দুপা এগিয়ে যায়, পরক্ষণেই ফোকরের কাছে ফিরে এসে পিছন ফিরে ডাকতে শুরু করে। গলাটা কেমন যেন বেসুরো মনে হয় চন্দ্রার—কাঁপা কাঁপা, ভারি। চুপ করে আরো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে বেজোড় চড়ুইটা। দুপা এগিয়ে আসে। দুবার ডাকে চিরিপ চিরিপ করে। তারপর কাটা শেকড়ের গোড়া থেকে নতুন শিস-গজানো আগাছা-অশথের লাল-সবুজ পাতার উপরে নেমে এসে দুলতে শুরু করে। দুবার দুলে, দুবার দোল খেয়েই জিব দিয়ে বুড়ো পেঁপে গাছটার লম্বা পাতার ডাঁটার উপরে নেমে গিয়ে দরকচা-মারা ফুল-কচি ফলগুলোর গায়ে ঠোকরাতে থাকে।

ক্রমেই যেন অস্থিরতা বেড়ে যায় জোড়ের মরদটার। ছটফট করে। মেয়েটাকে ঘিরে লাফাতে লাফাতে আচমকা থেমে গিয়ে তাকিয়ে থাকে বেজোড়টার দিকে। দু পা এগিয়ে যায়। পরক্ষণেই ফিরে এসে আরো জোরে জোরে লাফাতে শুরু করে। মেয়ে চড়ুইটাও লাফায়, নাচে, কিন্তু অস্থির নয় মরদটার মতো। গম্ভীর মন্থরতায় পাদুটো ভারি হয়ে আসে। দুপাক ঘুরে দুপাক নেচেই মাথা নিচু করে ঝিমমেরে পড়ে থাকে। নেশা লাগে, আরো উদ্দাম হয়ে ওঠে জোড়ের মরদটা। আরো বেশি লাফঝাঁপ শুরু করে মেয়েটাকে ঘিরে। ককিয়ে ওঠে মেয়েটা। গালের উপরে হাঁটতে হাঁটতে মাছিটা এগিয়ে আসে কশের কাছে। সুঁচের মতো সরু ঠোঁটটা ডুবিয়ে দেয় দু ঠোঁটের ফাঁকে। গা মুচড়ে বমি আসে। কাঁটা দিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে। ফাটাফাটা শুকনো ঠোঁটদুটো সুঁচলো করে প্রাণপণে চেপে ধরে বাণেশ্বর। ইচ্ছে হয় দুহাত দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়। ছুঁড়ে ফেলে দেয় মুখটা। পারে না। হাতদুটো অসাড়। সর্বাঙ্গ অসাড়। রাগ, দুঃখ, ঘৃণা বিরক্তিও জমে অসাড় হয়ে যায়। একটা ক্লেদাক্ত চেতনা দেহ-মন পুড়িয়ে পুড়িয়ে চলে। এক সময়ে গা-ঝাড়া দিয়ে ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে এলোমেলো পাখনাগুলোর প্রসাধন সেরে ক্লান্ত উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে মেয়ে চড়ুটই!
নির্জীব ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে বাইরের নিকষ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে চন্দ্রা। কিছুতেই চোখ তুলে মুখের দিকে তাকাতে পারে না। গলা ফুলিয়ে বারকয়েক ঘুরে আড়চোখে বেজোড়টার দিকে তাকিয়ে দেখে। তারপর ঘনঘন লেজ নাড়তে নাড়তে চিরিক চিরিক করে ডাকতে শুরু করে মরদটা। আর নিদারুন ক্লান্তিতে ইঁটখসা নোনাধরা দেয়ালের ফাটলে ফাটলে ঠোঁট ডুবিয়ে মৃদু টোকায় ঠুকরে চলে মেয়েটা।

যন্ত্রণায় বুকের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে চন্দ্রার। সেদিনের সর্বাঙ্গ পুড়ে-ওঠা জলুনির যন্ত্রণায় পুড়ে ওঠে।

দুদিন পরেই হয়তো মরদটা খড়কুটো বয়ে আনতে শুরু করবে ঠোটে করে। আর ঐ ফোকরটার ভিতরে বন্দী হয়ে থাকবে মেয়েটা রাত দিন। কতদিন? এক মাস? এক মাস, না এক যুগ? না চিরজীবন? চির জীবনই কি নোনাধরা ভাঙা দেয়ালের ফোকরে বসে তা দিয়ে চলবে? মুছে যাবে নীল আকাশ? নতুন শিস-গজানো পাতা-মেলা আগাছা অশথের লালচে সবুজ রঙ?

ডানা কাঁপিয়ে চোখের পাতা ছুঁয়ে উড়ে যায় মাছিটা। বেরিয়ে যায় জানালার শিকের ফাক গলে। অস্বস্তির বোঝাটা পিছলে পড়ে বুকের উপর থেকে। এক চিলতে আলো-আঁধারী হাসিও পিছলে পড়ে ঠোঁটের কোণ বেয়ে: রাম না জন্মাতেই রামায়ণ!

চামড়ার তলায় রক্তের ঢল নামে। মুখটা লাল হয়ে ওঠে। সব রাম-ই কি জন্মায়? তবুও রামায়ণ রচনা হয়। স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস হয়। স্বর্গের সিঁড়ি ধ্বসে পড়ে। গলাটা কাঠ হয়ে গেছে। জিভটা শুকিয়ে আঠা হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে হাত তোলে। হাত বাড়ায় চন্দ্রা। কার স্বর্ণলঙ্কা? বাণেশ্বরের? হাতে গরম লাগে। এখনো ধোঁয়া উঠছে। কখন রেখে গেছে? গ্লাসটা তুলে এনে চুমুক দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা বেঁকে ওঠে। হরলিকস নয়, দুধ। গরম দুধ। ঘন আর মিষ্টি। আঠার মতো লেগে আছে গ্লাসের গায়ে। গা ঘুলিয়ে ওঠে। তলায় চিনি জমে আছে। এত চিনি? গ্লাসটা চোখের সামনে তুলে ধরে একটু নাড়া দেয়। তলা বেয়ে টপ করে এক ফোঁটা ঝরে পড়ে কোলের উপর। ঝরে-পড়া ফোঁটার শূন্য জায়গায় আর এক ফোঁটা এসে জমা হয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভালো করে দেখে চন্দ্রা। চিড় খেয়ে ফেটে গেছে গ্লাসটা। ভালো বিলিতি কাচের গ্লাস! বটের আঠার মতো মোটা মিষ্টি দুধ। গায়ে লেপটে আছে ঘন হয়ে। তাতেই কি চিড় খেয়ে গেল? অকেজো হয়ে গেল দামী গ্লাসটা? একবার চিড় খেলে দাগ মেলায় না। ফাটলই বেড়ে চলে। দুখান হয়ে যায়। শতখান হয়ে যায়। চিড় খাওয়া কাচ জোড়া লাগে না। লাগাতে গেলে শতখান হয়ে যায়, ফুটে যায়, রক্তারক্তি হয়। চিড় খাওয়া মন? জোড়া লাগে না। খানখান হয়ে যায়, রক্ত ঝরে। কিন্তু মন তো আর কাচ নয়। চিড় খায়, ফাটল ধরে। চুলের মতো হিলহিলে কিলবিলে ফাটলের পথে কত ব্যথা, কত জ্বালাই-তো শিষিয়ে ওঠে। কত ফাটল চুইয়ে রক্ত ঝরে।
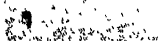
চিড় খেলেই কি কাচের মতো খানখান হয়ে যায় ? রক্ত-ঝরা ফাটলের মুখে কি নতুন পলি পড়ে না ? মুছে যায় না ? মুছে যায়। তবুও মরে যায় কি ?

চমকে ওঠে চন্দ্রা। ক্রমেই যেন বেপরোয়া হয়ে ওঠে বেজোড় দামড়া চড়ুইটা। ক্রমেই দুরন্ত মরে যায় ব্যবধান সংকীর্ণ হয়ে আসে। মরীয়া হয়ে ওঠে মেয়ে চড়ুইটা। পাখসাটে প্রতিবাদের ঝড় তুলে তেড়ে আসে গায়ের কাছে ঘনিয়ে আসা জোড়ের মরদটার দিকে। অবাক হয়ে যায়। অদ্ভুত লাগে। ভারি অদ্ভুত। প্রথমে চমকে ওঠে তারপর অবাক হয়ে যায়। কিন্তু কোনো কিছুতে অবাক হওয়ার মতো আছে নাকি কিছু এ যুগে ? মা ঠাকুমা অবাক হন, থমেবে যান। কিন্তু একালের ছেলেমেয়েরা অবাক হয় না উৎসুক হয়, উচ্ছল হয় কিন্তু অবাক হয় না। নটা গ্রহের জায়গায় দশটা হয়েছে শুনে অবাক হন, অমঙ্গলের আশঙ্কায় আঁৎকে ওঠেন মা ঠাকুমারা। কিন্তু একালের বাচ্চা ছেলেটাও অবাক হয় না। মা অবাক হয়েছিলেন, আঁৎকে উঠেছিলেন। না খেয়ে, না দেয়ে দোরে খিল এঁটে তিন দিন, তিন রাত্রি পড়েছিলেন ঘরে। আর কেঁদেছিলেন এক মাস ধরে। কেমন করে লোক সমাজে মুখ দেখাবেন, পেটের মেয়ে যার—? দু পা এগিয়ে আসে বেজোড়টা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে মেয়েটার দিকে। তারপর উড়ে গিয়ে নতুন শিকড় গজানো আগাছা অশথের কচি ডালের উপরে বসে। মেয়েটা ঘুরে দাঁড়া ভারি পায়ে এগিয়ে যায় মরদটার দিকে। পরক্ষণেই পিছিয়ে এসে ডানা মেলে দেয়। ডানা আছড়ে গা ঝাড়া দিয়ে উড়তে গিয়ে আবার চুপ করে তাকিয়ে থাকে মরদটার দিকে। মরদটা এগিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটা উড়ে গিয়ে আগাছা অশথের লালচে সবুজ পাতার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মাছিটা আবার ফিরে আসে। কানের কাছে ভনভন করতে করতে মুখের চারদিকে চক্কর দিয়ে নেমে এসে বসে দুধের গ্লাশের উপরে। ঝিম মেরে মরদটা বসে আছে ফোকরের তলায়। কার্নিশ বেয়ে এক ফালি পড়ন্ত আলো ঝরে পড়ে আগাছা অশথের নতুন-মেলা পাতার উপর। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরে চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে চন্দ্রার। কানের পাশে ভনভন শব্দ করে মাছিটা আর চক্কর দিয়ে ফিরছে না। চোখ দুটো নেমে আসে চন্দ্রার। গ্লাশের গা বেয়ে নেমে যেতে যেতে পা পিছলে পড়ে গেছে মাছিটা। গরম দুধের ভিতরে পড়ে গিয়ে বার কয়েক ঘোরে। তারপর স্থির হয়ে যায়।

একটু পরেই তলিয়ে যাবে।

ঘরের মধ্যে

অরুণ মিত্র

বাইরে কেউ একজন মোক্ষম কিছু একটা বলে আর অমনি পাথুরে হাওয়া গ'লে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমার চেয়ার-টেবিলে ব'সে সেটা আমি টের পাই। কিন্তু সেই আশ্চর্য কথাটা যে কি তা ধরতে পারি না। আলো নিয়েও এক কাণ্ড। আশপাশে গাছের পাতাগুলো কোন এক সময় অসংখ্য প্রদীপ হ'য়ে যায়, তাদের রোশনাইয়ের একটা রেশ আমার চোখ দুটোকে ছুঁই-ছুঁই করে। আমার চেয়ার টেবিলের উপর যে অন্ধকারের ঝোপ তার কিন্তু নড়বার নাম নেই। কাজেই বিজলী বাতি আমার নেবানো চলে না। খরা বছরের বৃত্তান্তে যখন আমার নিশ্বাশ আটকে আসে তখন বাইরে এক উচ্ছ্বাসের জোয়ার লাগে। বেশ বুঝতে পারি মাটি হেসে উঠেছে প্রাণ খুলে। কিন্তু কোন মন্তরে ?

চেয়ার আর টেবিলটাকে কোথায় বা সরিয়ে নিয়ে পাতব ? আমার ঘরের মধ্যে এক কোণের সঙ্গে আর এক কোণের সত্যিকার তো কোনো তফাত নেই। একমাত্র এই আশা নিয়ে আমি টিঁকে আছি যে কাঠের চেয়ার-টেবিল দুটো একদিন শিকড় গজিয়ে মাটি থেকে রস টানতে সুরু করবে এবং সেই সঙ্গে আমি ঐ সব আলো হাওয়ার শরিক হ'য়ে যাব।

অমলেশের সন্তাপ ও শান্তি

মণীন্দ্র রায়

সারাদিন বৃষ্টি ছিল। এখনো সন্ধ্যায়
ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে, ঘোলাটে আকাশে
বিদ্যুতের চাপা হাসি জ্বলে আর নেভে।
হকার্স কর্নারে কাদা, লোক নেই, গ্যাসের আলোয়
পোকার ফুলঝুরি শুধু। বন্ধ বেচাকেনা।
এবার দোকান তুলে বাড়ি যাবে অমল, হঠাৎ
কে এক যুবক এসে বলে গেল, সীতেশ সান্যাল
হাসপাতালে, বাঁচে কি বাঁচে না।

দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠে কয়েকটি মশাল
স্মরণের আনাচেকানাচে। আর লাল অন্ধকারে
উদ্যত বর্শার বেগে সীতেশের আততায়ী লোভ
ছুটে আসে অমলের হৃদ্‌পিণ্ডের দিকে।
মুহূর্তে বিপ্লব ঘটে। নীরব চিৎকারে
বলে ওঠে অমলের মন, বেঁচে আছ?
সাতটি বছর গেছে তোমাকেই ভুলতে, এখন
কী চাও? যা ছিল সবি নিয়েছ তো, আজ
চাও কি জীবন?

সে ছিল সবার প্রিয়, বলিষ্ঠ সুন্দর
গ্রামের কিশোর। তাকে আজো মনে পড়ে
অমলের পাশাপাশি ইস্কুলের খেলায় উচ্ছল।
মনে পড়ে নদীতীরে উধাও মাঝির গান শোনা;

মেঠো পথে আখ চুরি ; বনেঢাকা পুরনো মন্দিরে
পাথরের নুড়ি খুঁজে কত কী যে প্রত্নের বিস্ময়।
সেদিন যে-ছিল বন্ধু, একপ্রাণ, স্বপ্ন দিয়ে বোনা,
নিয়তি, সে আজ শুধু ভয় !
যাবে না, যাবে না ঐ যন্ত্রণার উৎসে আর,

যে ডুবে গিয়েছে, ডুবে যাক।
অমলেশ ক্লান্ত আজ, অমলেশ বধির, নিঃসাড়,
খুলবে না মনের কপাট।
অথবা এ প্রতিহিংসা ?　যে তার গভীরতম মূলে
হেনেছে দংশন জ্বালা, ঝরিয়েছে সবুজ পল্লব,
কলেপড়া ইঁদুরের আর্তনাদে সে দেখ এখন
হাওয়ায় ছড়ায় তার উদ্ধারের স্তব !

মনে কি ছিল না বন্ধু, সেইদিন একা
রানাঘাটে অমলের ঘরে
রুগ্ন, নিরাশ্রয় তুমি উদ্বাস্তুর দল থেকে এসে
পেয়েছ ক্ষুধার অন্ন, শুশ্রূষা, জীবন—
আর বিনিময়ে দিলে লজ্জা, গ্লানি, লাঞ্ছনা চরম
নিঃসঙ্গ কারার কক্ষে ?　মনে পড়েনি কি
যখন প্রমত্ত তুমি ব্যাভিচারে সুখের শয্যায়,
নিদ্রাহীন অমলেশ জ্বলে, শুধু জ্বলে ধিকিধিকি !

তবে আর কেন ডাক ?　তুমি তো জান না,
এ সাতবছর কত মুহূর্ত-যে নিঃশব্দ কান্নায়
সমুদ্র উজাড় অশ্রু লোনা !
তুমি তো জান না, এই হকার্স কর্নারে
দোকান সাজাতে, কত রৌদ্রজ্বলা পথ
ছিটের কাপড় কাঁধে কেটেছে, উদ্বাস্তু কলোনীর

শ্বাসহীন পরিবেশে বাঁচার সংগ্রামে প্রতিদিন
কত মৃত্যু পার হয়ে আজ সে কঠিন।

না, আজো ভোলেনি অমলেশ
দূর পদ্মাপারে সেই সমব্যথী যুবার হৃদয়।
সে তুমি দারুণ ছিলে, কোমল হয়তো তারো চেয়ে—
অমলের নিন্দা শুনে সুধীরের ভেঙেছ চোয়াল ;
ঝড়ের পাখির ছানা কাদা থেকে তুলেছ বাসায়।
অনেক অনেক ঋণে, পাকে পাকে কত কি আদরে
বেঁধেছিলে দিনে দিনে। কে বুঝেছে হায়,
সে দেনার উদ্‌যাপন লোহার নিগড়ে !

আরো এক নাম আছে—মাধবী—সে জ্বলন্ত হরফ
সূর্যাস্তের মেঘে আঁকা, ফিরে আসে প্রতিটি সন্ধ্যায়।
যেদিন সে অমলের হাত ধরে এল নববধূ,
সীতেশ, মনে কি পড়ে, কত হাসি হেসেছ সেদিন ?
অথবা সে বুঝি শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা ?
সব হাসি হাসি নয়, কিছু তাতে ছিল হাহাকার !
না হলে কি মন্ত্রে তুমি, আগন্তুক, অতদিন পরে
লুঠ করে নিলে ঐ সুধার ভাণ্ডার !

এখন তো সবি স্বচ্ছ। কতদিন কত-যে প্রশ্রয়ে
মাধবী মুখর ! তুমি সাহসী, দুর্বার—
আনন্দ শতধা বেগে উৎসারিত তোমার হৃদয়ে !
তাই অসময়ে এসে খাবে বলে জানাও আব্দার ;
আমি নেই একা তুমি তাকে নিয়ে ঘুরেছ মেলায়।
এবং এতই অন্ধ—মদে চুর, নিষিদ্ধ পাতালে
যেদিন নেমেছ তুমি, মাধবী তা শুনেও শোনেনি।
কে জানে তখন, সেও বাঁধা ঐ জালে।

অকস্মাৎ এরি মাঝে আত্মছলনের
রণরোল বাজে। তার তীক্ষ্ণ ছুরিকায়
দেশ দ্বিখণ্ডিত। ছোটে রক্তাক্ত মানুষ।
সীমান্তের এপারে ওপারে।
অমলেশ রানাঘাটে, আর তুমি সীতেশ কোথায়
সর্বস্ব হারিয়ে এলে দুর্দিনের দুর্বহ অতিথি।
দুমাস যেতে না যেতে প্রতিদানে তার
রেখে গেলে কৃতঘ্নের স্মৃতি।

মাধবী নিখোঁজ। তুমি উধাও। আইন এল নেমে
ঘৃণ্যতর দায়ে—কোথা কোথা গণিকার চোরাই গহনা
অমলেরই ঘরে—সেও চোরের দালাল!
ছ মাসের ঘানি টানা। বেরিয়ে সে ভেবেছে নিজেই
মুছে দেবে এ জীবন—একটি মানুষ
বাঁচাল মুমূর্ষু আশা, কাছে টেনে তাকে
দেখল, কত যে গ্লানি ঘূর্ণির অতলে টানে, তবু
মানুষ ডোবে না দুর্বিপাকে।

স্থান পেল কলোনীতে। কাঁটাবন, সাপের ডেরায়
হোগলা, বাঁশের চালা ; দিনেরাতে সতর্ক পাহারা ;
কখন বর্গীর ঝড়ে মালিকের পেয়াদা জুলুম
লাঠিতে বসতি ভাঙে, মাটি রাঙে রক্তের ধারায়।
তখনি তো অমলেশ বুঝেছিল, মানুষের মন
কী দুর্জয় শক্তির আধার!
অতীনের ডাকে যারা প্রাণ দিতে রাজি, সেই দলে
তাই তো দাঁড়াল সেও উদ্ধত পাহাড়।

সে আজ অনেকদিন, কেটে গেছে ছ-সাত বৎসর।
জীবনের পোড়া পথে ল'ড়ে আর স্বপ্ন গ'ড়ে গ'ড়ে
শিখেছে কত না ক্ষমা! প্রশস্ত হৃদয়ে
ধ্বংসের সৃষ্টির দুই পদপাতে কালের ঈশ্বর
বাজায় বিচিত্র রাগ। জীবিকার হাটে
যদিও দোকানী, দেখ মন তার ছোটে ত্রিভুবনে।
একটি কাঁটার মুখ তবুও কেন যে প্রতিদিন
বিঁধেছে গোপনে।

সে রাতেই হাসপাতালে সীতেশ সান্যাল
মারা গেল। অমলেশও ছিল তার পাশে।
দেখেছে সে, মৃত্যুপথযাত্রী বারে বারে
অস্থিসার হাত মেলে কী খোঁজে আকাশে।
মাধবী অদূরে বসে, নিস্পন্দ পাথর।
দৃষ্টি তার শূন্যতায় বোবা
যেন কারো চেনা নেই, ডুবন্ত জাহাজে দুটি প্রাণী
একই গুড়িঁ ধরে স্তব্ধ সমুদ্রের ঢেউয়ে আধোডোবা!

শ্মশান। চিতার জ্বালা নেভে। গাছে পাখি
ন'ড়ে বসে। রাত্রি হল ভোর।
অমল রাস্তায় নামে, সহসা পিছনে
শোনে—'কিছু বলে যাবে নাকি?'
হায়রে, এ কোন আশা! কার কাছে দাঁড়ালে বিচারে?
একবার শ্বাস টেনে, তবু সে উষার ছলোছলো
স্নিগ্ধ আকুলতা দেখে, নিজেকে ছাড়িয়ে বলে ধীরে—
'চলো, বাড়ি চলো!'

আগুন আমার ভাই

সিদ্ধেশ্বর সেন

সময়ের ডানার ভিতরে
তুমি ছিলে চলচপল অগ্নি
সেই ডানা ঘ্রাণ লেগে পুড়ে গেলে, পাবক
তোমার উলঙ্গ আত্মা চিনি

তোমার বর্বর আত্মা
যা রইল সভ্যতার আগুয়ান মূলে
কিম্বা যা সভ্যবর্বরতা ভেদ করে বিশুদ্ধ মৌলিক অন্তঃপুরে
মানুষের হৃদয়কে পুড়লে

অরণির থেকে আমি কোন আলো জ্বেলে নিয়ে
গুহা থেকে গুহার বিবরে ফিরে, ফের
অবারিত গুহায়
সমাহিতি চেয়ে নয়, সমাধান নিরর্থক চেয়ে
হয়ে গেছি চিত্ররূপময়

বাইসন-তিমিরপীঠ পার হয়ে, দ্রুত হরিণীর
পলায়নপর দ্যুতি পেলে
শেষ চিত্রকল্পে কিম্বা বারবার প্রথম প্রতীকে
অতিকায় প্রশ্নে ছায়া ফেলে

আমিই কী রয়ে যাব চিরকাল শিকারীকে ছেড়ে, সেই
শিকারের অন্তিম
প্রশ্নের বাহক
দশহাজার হাজার বছরের তাম্রপ্রস্তর সব নির্বিবেকে ভোগ
করে এসে
হিমের বলয় ভেঙে বারবার, হিমেরই বলয়ে পলাতক

তুমি স্বত্বহীন সত্তা তবু দীপ্র-ব্রাত্যঅগ্নি, অন্ত্যজ নায়ক

'মা নিষাদ' বলে আমি প্রথম আদি কোন বাণী
উদ্গাতার মতো
শুদ্ধ উচ্চারণে ভরে পৃথিবীর দিগন্তকে একবারও শুনিয়েছি, এমনকি
সে আদেশ স্মরণরহিত

তমসার থেকে, কোন তমসায় আমি
কোন তমসায় আমি
নেমে
জলে জ্বালি হৃদয়ের শোক

সময়ের কোন্ ডানা গরুড়ের চেয়ে বৃদ্ধ, পরিণামহীন, ভ্রাম্য,
অনুতাপকামী
আমিই দাহ্য আর আমিই সে একক দাহক ॥

কালীয়দমন

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

মা বিষহরির রাজ্যে ঢল নেমেছে বিষের। ফণিমনসার ঝোপঝাড় বাড়-বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে, বিষবৃক্ষে বিষফল ধরেছে। বেদনাভার সেই পৃথিবীর বুক জুড়ে নাগানাগিনীর চিক্কির-কাটা আঁশ-খোলস আর ডিমের ভাঙা-খোলা অজস্র কুচি-কুচি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

একদিকে তার নিম-তেঁতুলের জট, জম্পেস করে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় খানা-ডোবা, খন্দ-জলা। তারই মাঝে পানা-কচুরি আর সোলা-সাপলার লতা লতিয়ে লতিয়ে ডাগর-ডোগর হয়ে উঠেছে, হাওয়ায় হাওয়ায় দুলতে শিখেছে। আর, অন্যদিকে মাজাভাঙা মান্ধাতার আমলের এক ইঁটের পাঁজা! হয়তো কেউ কোঠা-দালান তুলতে চেয়েছিল, আহা, সব সাধ তার বিষহরির পায় এলিয়ে পড়েছে! এখন সেই পাঁজার গায় ছুবলিয়ে ছুবলিয়ে দাঁতের জোর পরখ করে নাগ-নাগিনীরা। নাগ-নাগিনীদেরই দিন পড়েছে।

মা বিষহরির রাজ্যে ঢল নেমেছে বিষের। কলকাসুন্দি, জলশেওড়া, বিছুটি মাথা দোলায়, মাথা দোলায় আকন্দ-তুলসী। বাঁশের ডগা বাঁকতে বাঁকতে মাটি ছোঁয়, আবার লাফিয়ে উঠে আকাশ ধরতে চায়, পারে না, যন্ত্রণায় মটমট মটমট শব্দ করে। এখন যেমন করছে।

কি রাত্রে কি দিনে, কি পঞ্চমীতে কি অমাবস্যায়, কি পূর্ণিমা-একাদশীতে বিষহরি বাথান ঢলে থাকে নেশায়। থরথর করে কাঁপে বিষ বাতাস, কাঁপতে কাঁপতে বুঝি বন্দনা গায়:

জয় বিষহরি মাগো, জয় বিষহরি মা
কাউরে কামাক্ষ্যা মা তোর বিষে ভরা গা।

কথিত আছে, বেদে-বেদেনীরা বলে ফি-অমাবস্যায় বিষহরির বাথান জাগ্রত হয়ে ওঠে। মা বিষহরি তার দণ্ড তুলে নেন হাতে, মাথায় পরেন নাগ-মণির মুকুট। অদৃশ্যলোক থেকে সুর বর্ষণ হতে থাকে। সেই সুরে কান পাতলে শোনা যায় চৌষট্টি সাপের দাপুনি কাঁপুনি হিসহিস, ফিসফিস, সোঁসোঁ। সাঁসাঁ।……

চৌষট্টি সাপের বিষ এক অঙ্গে ধরি
ত্রিভুবন জয় করে জয় বিষহরি।
অষ্ট নাগ ষোল চিতি দশদিকে ধায়
স্বর্গ-মর্ত-পাতালের আসন কাঁপায়।

মা বিষহরি এই দিনে তার অষ্ট নাগ নিয়ে বসেন বলেন, ওহে কুলশ্রেষ্ঠ নাগ সন্তান তোমরা তো নিশিদিন জল-জাঙ্গাল জনপদ ঘুরে বেড়াও, তোমরা কি লক্ষ্য কর না মানুষের প্রতাপ নিত্য নতুনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

কালা অঙ্গ কালীনাগ, পদ্ম অঙ্গ পদ্মনাগ, শঙ্খ অঙ্গ শঙ্খনাগ ফণা দুলিয়ে সমর্থন করে, হ্যাঁ ঠিক ঠিক।

তবে তোমরাই বল মানুষের দর্প হরণ করি কি করে, কি করে তার দণ্ড ভাঙি। তক্ষক বলে, নাগকুলের দুর্বলতা আগে দূর কর মা, নইলে .

কালীনাগ বলে, আমাদের বিষের ধার ওরা বুঝতে শিখেছে, তুমি আমাদের নতুন বিষ দান কর মা .

শঙ্খিনী বলে, এখন থেকে আমাদের লক্ষ্য হোক মস্তক শিরে হইলে সর্পাঘাত ডোর বাঁধবে কোথায়।

নির্বিষ জলঢোঁড়াও তার বক্তব্য জানায়।

মা বিষহরি বলেন, আমার চৌষট্টি সন্তান চৌষট্টি বেশ ধারণ কর। শঙ্খচূড় তুমি বেশ ধর ক্ষুধার, পদ্মনাগ তুমি হও মণ্ডল, চন্দ্রনাগ তুমি ব্যাভিচার . অমনি চৌষট্টি নাগ চৌষট্টিরূপে প্রকাশিত হও।

সাজ সাজ রব পড়ে যায়। বিষহরির বাথান জুড়ে হিসহিস ফিসফিস সোঁ সোঁ সাঁসাঁ—সে কি শোষানী সে কি ফোসানী। সেই পৃথিবীর মাটি টলতে থাকে। ধুতুরার কলি পাঁপড়ি খুলে বাকা হয়ে দোলে, বুনো জলায় বাদুড় দাপাতে থাকে ইঁটের পাজা ভেঙে ঝুরঝুর ঝরঝর করে কয়েক চাপ পোড়া মাটি গড়িয়ে পড়ে মাকড় মাছি-মশা বিদ্যুৎপৃষ্ট হওয়ার মতো লাফিয়ে ওঠে শূন্যে।

বাতাস দাপায়, বিষ বিষ। বিষের বুদবুদ বেনিয়মে ছটফট করে ওঠে কর কর কট-কট, কর-কর কট-কট, .

জয় বিষহরি মাগো জয় বিষহরি মা
. কাউরে কামাক্ষ্যা মা তোর বিষেভরা গা।

বিষহরির রাজ্যে বিষবেদী টলতে থাকে। দেখতে দেখতে নাগ-নাগিনীর রূপ যায় পাল্টে। মুহূর্তের মধ্যে তারা হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যায়। হাওয়ার

মতোই অবাধ গতি হয়ে খুঁজতে শুরু করে মানুষের আস্তানা। নগর-গঞ্জ, হাট, ঘাট, মাঠ······

এসব কথা বেদে-বেদেনীদের মুখেই শোনা যায়। বিশ্বাস কর আর নাই কর, যায় আসে না কারো। প্রমাণ চাও, প্রমাণও ওরা দেখায়, দেখ না হাওয়া কেমন ছোবল দেয়। সারা অঙ্গ রীরী করে ওঠে। হাওয়ায় এমন জ্বলুনী পুড়ুনী কই ছিল আগে, বল ছিল আগে, এঁ্যা ?

বেদে-বেদেনীরা বলে, বেশ তো ছিলাম এতদিন, সাপ ধর, ঝাঁপি বন্ধ কর, বিষ ঝাড়, বিষ উড়াও, কড়ি চলে, ফুঁ দেও, মা মনসার আখ্যান গাও··· কই গো মাঠান্, বেদে-বেদেনী শুকনো মুখে চলে যাবে তাও কি হয়, ছান বাবুমশাই পরনের ধুতিখান, সোনাদানা দান কর গো মা-ঠাকুরুণ · তা ছিলাম একরকম মন্দ নয়। কিন্তু একি হল দেশকাল বল দিকিনি। আহা কি ছিরি ! মুষ্টিভিক্ষা দিতেও কারো হাত সরে না। মা-ঠাকরুণরাই ছেঁড়া শাড়ি সিলিয়ে-ফুড়িয়ে পরেন, কানের মাকড়ি নাকের ফুল বিলোবে কে ! চোখের পানি শুকনো মুখ দেখে বেদে-বেদেনীরা ভাবে, আহা কি ছিরি হয়েছে দেশের, ছিরি হয়েছে কালের।

তা, তেমনি এক বেদের নাম কালা শেখ, আর বেদেনীর নাম টগর। বেদের হাতে লাউ-বাঁশি, পিঠে ঝোলা ঝুলি, মাথায় জড়ানো গামছা আর বেদেনীর হাতের তামার বয়লা মাথায় থাক থাক সাপের ঝাঁপি।

বেদে গায় :

কাউরে কামাক্ষ্যা মা দিয়াছেন বর
মন্ত্র লয়ে ওঝা আমি হইনু অমর।

বেদেনী বলে আহা পেটেপিঠে সাপটে যাচ্ছি দিনকে দিন। অমর হওয়ার মুখে নুড়ো জ্বালি। আটা ছেনে চাপড়ে চাপড়ে রুটি বানায় বেদেনী। বেদে তার তিন-ইঁট সাজানো উনুনের ফাঁকে কাঠি গুঁজে আগুন বার করে নেয়, সেই আগুন মুখের কাছে এনে বিড়ি ধরায়। গজ-গজ ঘ্যানঘ্যান কমেই না আর।

মুরগি ডাকল কি না ডাকল নাস্তা-পানি সেরে ডাকাডাকি হাঁকাহাকি শুরু করে দেয় কালা শেখ, ও টগরমণি, টগরমণি !

কি ! গলায় যেন সোডা-পানির ঝাঁজ।

হবে না ! ভোর থেকেই পায়ে মল বেঁধে ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর···কে যায় গো ? টগরমণি । আর কে ? কালা ওঝা । কান পচে গেছে শুনতে শুনতে ।

টগরমণির কপাল আর কপাল কালা শেখের ।

ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস হারিয়েছে এ কালের লোক । কি করবে কালা শেখ । পুত্রকামী বন্ধ্যারা পুত্র কামনায় টগরমণিদের ডাকে না, মামলাবাজ মোড়ল মশাই কিংবা গ্রহের কোপে-পড়া মুমূর্ষু চক্কোত্তি কেউই আর ডাক দিয়ে চেয়ে নেয় না তাবিজ-কবজ, জড়ি বুটি, মশলা-মালিশ । কারো ভিটেয় কি দুটো একটা সাপও ঢোকে না মা বিষহরি, নিদেনপক্ষে বোলতাও কি কামড়ায় না···

কই গো মাঠান, কাঁচি এনেছি, খোকাখুকুর মাজার তাগা এনেছি, একবার মুখ তুলে গ্যাখ ! ও বাবুমশাই, টগরমণির হাসি এনেছি, একবার মুখ তুলে চাও !

বেরো বেরো নষ্ট মাগি, দুড়ুম দাড়ুম করে দাওয়ায় ওঠে গ্যাখ না, একবার বসলে শুতে চাইবে ।

ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর···কে যায় ? বেদে বউ টগরমণি যায়, আর যায় কালা শেখ । মাথার ওপর রোদ চড়ে । গ্রাম থেকে গ্রাম ঘুরে কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ । আলোর পথে হেঁটে হেঁটে ছাল-বাকল ওঠে পায়ের । টগরমণি বলে, আর পারি না । কালা শেখ বলে, হাওয়ার মধ্যে পাপ লুকিয়েছে । বাতাস কেমন ছোবলায় গ্যাখ না ।

দুপুর গড়াতে গড়াতে বিকেল, বিকেল থেকে রাত । বড় কষ্ট, বড় অনটন, আর পারি না দিন টানতে । বেদে-বেদেনী আর পারে না ।

কালা শেখ বলে, টগরমণি পদ্মনাগটার দাঁতে আবার বিষ জমেছে কিনা গ্যাখ তো ।

না দেখেই টগর বলে, জমবে কি রকম ! গ্যাখো গে যাও থিকথিক করছে ।

তা, কালা শেখ বলে, চ তবে লুকিয়েচুরিয়ে গেরস্থ ঘরে ওটাকে ঢুকিয়ে দি । ভোরবেলা ডাক পড়বেই বেদে-বেদেনীর । মাসেরটা কামিয়ে নেওয়া যাবে ।

টগরমণি চমকে ওঠে । বলে কি কালা শেখ ! গুরুর কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছিল, ভুলে গেছে নাকি ! না না, জান থাকতে এমন গুনাহ, না না, টগরমণি কাঁপে । ঝাঁপির মধ্যে পদ্মনাগের নড়াচড়ার শব্দ পায় যেন । জয় মা বিষহরি, গুনাহ মাপ করিস মা, বেদের আজ মাথার ঠিক নেই ।

কইগো মাঠান, কাঁচি নয় নাই নিলে, চাকু নয় নাই নিলে, তাই বলে খালি হাতেই বিদেয় হই কি করে ! কই গো বাবুমশাই, মুখ তুলে চাও, সোনা-দানা দর-

দালান হাতি-ঘোড়া না হয় দান নাই করলে, বলি, বেদে-বেদেনীর চোখের দিকে তাকিয়ে একখান ছেঁড়া প্যান্টলুনই দাও।

কালা শেখের গুরু ছিল আত্মা ফকির। দশ গাঁয়ের লোক আজও বলে আত্মা ওঝা। সাপ দিয়েই সাপের বিষ তুলত। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল যে কুলেই থাকুক সাপ, আত্মা ওঝার এক বাণে সুড়সুড় করে বাবাজীবন এগিয়ে আসত। ফকিরের পায়ের তলায় লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদত, তারপর সাপে কাটা দেহ থেকে নিজের বিষ নিজেই চুষে চুষে তুলে নিত। হ্যাঁ, ওঝা ছিল আত্মা ওঝা। কড়ি-চালান, সিঁদুর-পড়া, হলুদ-পোড়া, বশীকরণ বল, বশীকরণ-সম্মোহন বল, স্তম্ভন বল, যা চাই সব।

সেই আত্মা ফকির আজ আর নেই। আজ তার কবরখানায় প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ দেয় টগরমণি। ঘরের লাগোয়া গোরস্থান, মুঠো মুঠো ফুল ছড়িয়ে দেয় টগরমণি। আর হাঁটু গেড়ে বসে সকালে সন্ধ্যায় অন্তর নিংড়ানো শ্রদ্ধা বিছিয়ে দেয়।

কই গো মাঠান, একমুঠ চাল দাও, নইলে আটা দাও, দিয়ে বেদে-বেদেনীর মুখের দিকে একটু তাকাও। আর পারি নাগো, আর পারি না।

কালা শেখ বলে, না পারলে পেট চলবে কি করে?

টগরমণি বলে, মা বিষহরি, এ কেমনতর বিষ ছড়িয়ে দিলি মা, তুই রাজ্যি জুড়ে। মা, ওমা, একবার মুখ তুলে চা, চা, চা।

মা বিষহরির রাজ্যে বিষ নেমেছে নদীর ঢলের মতো। ঢলতে ঢলতে ফুলতে ফুলতে দু কূল ছাপিয়ে ডাঙায় বসেছে লেপটে। শঙ্খচূড় বেশ ধরেছে ক্ষুধার, পদ্মনাগ হয়েছে মারীমড়ক, চন্দ্রনাগ ব্যাভিচার, চৌষট্টি নাগের চৌষট্টি রূপ। বিষের বুদবুদ ঠোকাঠুকি করে ফুটছে। যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাচ্ছে আকাশ, মাটি চোয়াড়ে হয়ে ফেটে বাঁকা চোরা খোঁদল সৃষ্টি করছে। বিষের ঢল নেমেছে গো, ঢল নেমেছে বিষের, কাল পেঁচা চিৎকার করে জানান দিচ্ছে তাই। মা বিষহরির বেদী টলছে······থরথর থরথর বাতাস কাঁপছে, জয় বিষহরি মাগো, জয় বিষহরি মা, কাউরে কামাক্ষ্যা মা তোর বিষে ভরা গা।

মা বিষহরি তার অনুচর নিয়ে বসলেন, বললেন, ওহে কুলশ্রেষ্ঠ নাগসন্তান, মানুষেরকি কি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছ বল?

নাগ-নাগিনীরা একবাক্যে জানান দেয়, মা বিষহরির জয়জয়কার ছাড়া আর কিছুই তো নজরে পড়ে না।

খলবল খলবল করে বিষহরির রাজ্য মুখর হয়ে ওঠে।

কালা শেখ বাড়ি আছ নাকি গো?

টগরমণি বাইরে আসে। বলে, আছে, কেন?

শীগ্‌গির একটু খবর দাও। দাওয়ার সাপ বার করতে হবে।

কার বাড়ি? টগরমণি চোখের তারা দুটো এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে বলে।

মধু কামারের বাড়ি। নিবাস ঝাউতলি, ঝাউতলির পুবপাড়া।

অ। টগরমণি হাতের আঙুল তুলে বলে, তা পাঁচ টাকা লাগবে, আর সের খানেক চাল দাও ভালো নয়তো আটা, আর নতুন ধুতি বেদের জন্য, আমার জন্য রাঙা শাড়ি।

মধু কামার দাঁতে দাঁত চাপে, তা হবে'খন। আগে চল তো!

তিন গ্রাম দুই মাঠ ভেঙে ঝাউতলি আসতে আসতে বেলা দু পহর। দাওয়ায় নেমেই কালা শেখ বলে, জল আন এক বদনা। একটু কাঁচা হলুদ আন, এক চিলতে ভিত-মাটি আর দু-তিন টুকরো চালের খড়।

দাওয়ার এক কোণে সত্যি সত্যি একটা সরু গর্ত হয়ে আছে। গর্তের চার পাশে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কালা শেখ বললে, কাল নাগিনী গো, কাল নাগিনী। জাতসাপ।

দর্শকরা চমকে ওঠে, বলে কি ওঝা, কি সর্বনাশ!

কালা শেখ বলে, তা পাঁচ টাকা লাগবে, চাল লাগবে একসের, আটা লাগবে একসের, ধুতি লাগবে একখানা আর রাঙা শাড়ি একখানা।

হবে হবে, আগে বার কর দেখে নেই।

বাঁশি এগিয়ে দিল টগরমণি। গর্তের চারপাশে নেচে নেচে সেই বাঁশি বাজাতে শুরু করল কালা শেখ। আহা কি মধুর সুর, সাপ তো সাপ, মানুষই বশ করে ফেলতে পারে ওঝা।

টগরমণি বসল ভিত-মাটি দিয়ে মাদুলি বানাতে। গেরস্তের অমঙ্গল দূর হবে। এই মাদুলি হাতে থাকলে সাপা-খোপ, ভূত-দানো আর ধারে কাছেও ঘেঁষবে না। রুদ্ধ নিশ্বাসে সবাই লক্ষ্য করছে কালা শেখকে। শেখ দুলে দুলে বাঁশি বাজাচ্ছে। আবার হঠাৎ বাঁশি বন্ধ করে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে।

আয় আয় আয়, আয় নাগিনী আয়
উত্তর দক্ষিণ, পুব পশ্চিম কালুর মন্ত্র যায়
সূর্য মোর বাপ, চন্দ্র মোর খুড়া আর বসুমতী মা
আয় আয় আয় নাগিনী বান্ধি সকল গা।

তারপর হঠাৎ সে চেঁচিয়ে হাঁক দেয়, ও বেদেনী, নাগ দেখছিস না নাগিনী ?

টগরমণি উত্তর করে, নাগিনী গো নাগিনী।

রাজ না পাতি ?

রাজ গো রাজ।

মণি আছে, না নেই ?

আছে গো আছে।

তা হলে তোর সাহস তো কম নয়। হাত পা বেঁধে নিয়েছিস, না অমনি সাপ ধরতে এয়েছিস ? বলেই আবার মন্ত্র পড়া শুরু করে—

হাত বন্ধন গলা বন্ধন, পেট পিঠ বুক
আর চরণ বন্ধন
অষ্টাঙ্গ বাঁধিলাম আমি মনসার বরে
সাপা-খোপা, বিছা-চেলা কি করিবে মোরে।

গর্তের মুখে তিনবার ফুঁ দিয়ে আবার বাঁশি বাজাতে শুরু করে। অনেকক্ষণ ধরে কসরত চলল। কথোপকথন চলল বেদে আর বেদেনীতে। দর্শকরা গোগ্রাসে ওদের ক্রিয়াকলাপ গিলছে। এইবার বেরুবে। দেখছ না, কালা ওঝা কেমন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

বেদেনী হঠাৎ চিকন গলায় হাঁক দিল, ও নিষ্কর্মা বেদে !

কালা শেখ উত্তর করল, হুঁ !

কে তোমার গুরু ! অমন যে ফোঁসফোঁস করছ, নাগিনী ধরে দেখাও।

দর্শকরা মনে মনে বলে, হ্যাঁ দেখাও, দেখাও।

কালা শেখ সুর চড়িয়ে বলে, কি বললি ? আমার গুরু আত্মা ফকির জানিস ? বাণ মেরে মুখ বাঁকা করে দেব, সামলে কথা বলিস।

টগরমণি হেসে ওঠে খিলখিল করে, যেমন গুরু তার তেমন চেলা।

বটে ! কালা শেখ তার টোপর থেকে বার করে সরু হাত-চারেক লম্বা একটা বেতের কাঁটা। আর ঝাঁপি খুলে একটা ব্যাঙ। তারপর ব্যাঙটার পেটের মধ্যে কাঁটাটা ঢুকিয়ে দেয় দেখতে দেখতে। ব্যাঙটা ছটফট করে ওঠে। কালা শেখ

বলে, থাম থাম, নড়িস না বাপু, থাম। বলতে বলতেই সে গর্তের মুখে ব্যাঙটাকে ছেড়ে দেয়। ছাড়া পেয়ে ব্যাঙটা গর্তের মধ্যে ঢুকতে থাকে। বেতের কাঁটার একপ্রান্ত ধরে থাকে কালা শেখ।

হঠাৎ চমকে উঠল কালা শেখ। ঠোঁটে আঙুল চেপে সবাইকে ইশারা করল, চুপ চুপ!

টগরমণি বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। সাপে টোপ গিলেছে। যাক, ইজ্জত বাঁচল তা হলে। ঘামতে শুরু করল টগরমণি। সাপে টোপ গিলছে, সঙ্গে সঙ্গে গিলছে বেতের কাঁটা। গিলবার সময় কাঁটার ধার বুঝতে পারবে না সাপ, কিন্তু বেদে যখন টান দেবে ধীরে ধীরে তখনই বুঝবে সে, গলায় যেন কি তার আটকে যাচ্ছে।

কালা শেখ বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে শুরু করেছে। কপালে ঘাম জড়িয়ে যাচ্ছে তার। কেমন এক উত্তেজনায় তাকে পেয়ে বসেছে। একবার সে টগরমণির মুখের দিকে তাকাচ্ছে আবার তাকাচ্ছে গর্তের দিকে। চোখ জোড়া তার এখনই যেন ফেটে পড়বে। যাক, আর খানিকক্ষনের মধ্যেই সাপ বার করে দেখাবে কালা শেখ। আর সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটা টাকা, একসের চাল, একসের আটা, একটা রাঙা শাড়ি, একটা ধুতি, সবার উপর ইজ্জত।

এই সরে যাও, সরে যাও, কাছে ঘেষো না। এইবার মা বিষহরি, মান রাখিস মা। বেতের কাঁটা ধরে টানতে শুরু করল কালা শেখ। আঙুল কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে জোরও লাগছে, নাগমশায় তবে ছোটমোট নয় নিশ্চয়ই! টানতে লাগল কালা শেখ, বেরো বেরো, জয় মা বিষহরি মান রাখিস, মান রাখিস মা।

শেষ পর্যন্ত মান ইজ্জত সবই বাচল কালা শেখের। সত্যি সত্যি ডুমড়াতে ডুমড়াতে কাঁটায় আটকে-যাওয়া কালনাগ বেরিয়ে পড়ল সবার চোখের সামনে। যন্ত্রণায় বিষধর সরীসৃপের লেজের ঝাপটা পড়ছে মাটিতে। মুখ দিয়ে লাল তরতাজা রক্ত পিচ্ছিল দেহের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

কালা শেখ হাঁপাতে লাগল। একবার সে সাপের লেজে পা দিয়ে তাকে টানটান করে তুলে ধরল। দেখুন বাবুমশাইরা, দেখুন মা ঠাকরুনরা, কত বড় কালসাপ বাসা বেঁধেছিল ঘরে।

টগরমনি চেঁচিয়ে উঠল, বেদে ভাই, বেদে ভাই, সাপিনী কি গর্ভবতী?

কালা শেখ উত্তর করল, গর্ভবতী।

তবে তাকে আর নির্যাতন দিও না গো, নির্যাতন দিও না।

না না, দেব না।

তবে তার কাঁটা খুলে তাকে বিদেয় দেও গো বিদেয় দেও।

দিচ্ছি, দিচ্ছি।

সত্যি সত্যি কৌশলে কাঁটা খুলতে বসল কালা ওঝা।

আহা হা, কর কি কর কি? মেরে ফেল না বাপু। গেরস্থ মধু কামার হা হা করে ওঠে।

কি কন বাবুমশাই, গর্ভবতী যে—

নিকুচি করেছে গর্ভবতীর। কে যেন হঠাৎ এক লাঠির খোঁচায় সাপটাকে উঠোনে এনে পিটতে শুরু করে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে। কালা শেখ আর টগরমণি বাড়ি ফিরে এসেছে। মুখে বাক নেই কারো। কি করেই বা থাকবে; টগরমণি শুয়ে পড়েছে মাদুর বিছিয়ে। কালা শেখ তামাক টানতে টানতে আকাশপাতাল ভাবতে বসেছে।

অনেক্ষণ পর বিড়বিড় করতে করতে কালা শেখ বলে উঠল, দেখলি তো টগর, বাবুদের আক্কেলটা দেখলি! সারাদিন খেটে এলাম আটগণ্ডা পয়সা ধরিয়ে বিদেয় করলে! গজরগজর করতে লাগল কালা শেখ, একমুঠ চালও দিলে না, একটা ছেড়া নেকড়াও না। কি জানিস টগরমণি, পাপ ঢুকেছে হাওয়ায়। তেমন দিন আর নেই।

সত্যিই নেই। অনেক কথাই মনে পড়ছে কালা শেখের।

তখন আত্মা ওঝারই দিন।

একদিন ডাক পড়ল ওঝার, যেতে হবে মুহুরি বাড়ি। কি ব্যাপার? না, সিঙ্গি মাছের কাঁটা ফুটেছে বউমার হাতে। বিষের যন্ত্রণায় আহা বেচারী নীলবর্ণ হয়ে গেছে।

চল চল যাচ্ছি, আত্মা ওঝা ডাকল কালা শেখকে, কৈ রে কালা, খবর পেয়েছিস? ওঝা ফকিরের এই এক দায়, সাপে কাটুক, বিছাই কামড়াক একবার কানে শুনলে যেতেই হবে বিষ ঝাড়তে। যত বাধাই আসুক না কেন, ঝড় হোক, জল হোক, রাত হোক, দুপুরই হোক, যেতেই হবে। আর যদি সে না যায়, যদি সে অবহেলা দেখায়, সব মন্ত্র তার নিষ্ফল হয়ে যাবে, আর কখনো ফল ধরবে না তাতে।

অগত্যা কালাকে নিয়ে আত্মা ওঝা ছুটল মুহুরিবাবুর বাড়ি। এক ফুঁয়ে সব বিষজ্বালা তার উড়িয়ে দিল। জলের মতো সেসব মন্ত্র আর প্রক্রিয়া সোজা, তবু দেখ, দুহাত ভরে দিয়েছিলেন সেদিন মুহুরিবাবু। মাঠাকরুন দিলেন দুপাত অন্ন-ব্যাঞ্জন, গাছের এক কাঁদি কলা, লাল গামছা এক জোড়……আরো কত কি……তেমন দিন আর নেই।

গো মড়ক শুরু হল একবার। এলোপাথাড়ি মড়তে শুরু করল গেরস্তবাড়ির গাই-গরু-বাছুর। আত্মা ওঝা শাশ্মনে-মশানে তিন রাত ছুটোছুটি করে পাপ বাতাসের টুঁটি টিপে ধরল। বল্, গাঁ ছেড়ে পালাবি কি না বল্? ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছিল ওঝা সেই অবদেবতার বাতাস।

এ মন্ত্রও কালা ওঝা সংগ্রহ করেছে তার গুরুর কাছ থেকে। কিন্তু আজ, এখন, কিছুই স্পষ্টভাবে বুঝে উঠতে পারছে না কালা ওঝা, হাওয়ার মধ্যে এখন যেন অন্য এক রকমের সাপ ঢুকেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে ছোবল দেয়, কি করে এই সাপগুলোকে ধরবে ওঝা, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।

কালা ওঝা হাঁটুথুতনি এক করে বসে তামাক টানে আর ভাবে, ভাবে আর তাকায় টগরমণির দিকে। কাঠের মতো শক্ত অনড় হয়ে পড়ে আছে টগর।

অপদেবতার বাতাস তাড়াল আত্মা ফকির। জমিদার বাড়িতে তার ডাক পড়ল। ওঝা সেবারই ভিটের এই মাটিটুকুই দান পেল জমিদারের কাছ থেকে। আজ সেই ভিটের উপরই কালা ওঝা বসে বসে ভাবছে। তেমন দিন আর নেই, ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে কালা ওঝা।

অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। আকাশের ডুবুরি হয়ে যে পাখিগুলো লাট খেয়ে খেয়ে নাচছিল এতক্ষণ তারা কেমন যেন ভয় পেয়ে আশ্রয় খুঁজতে উঠে পড়ে লেগেছে। ফণিমনসার ঝোপঝাড় শক্ত শির তুলে এখন মা বিষহরির রাজ্য প্রহরা দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আকাশবাতাস বেদনায় ভার হয়ে উঠেছে।

মা বিষহরি তার অষ্টনাগ নিয়ে বসলেন, বললেন ওহে কুলশ্রেষ্ঠ নাগ সন্তান, বল বল মানুষের আর কি কি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছ বল।

খলবল খলবল করে নিম তেঁতুলের পাতা নেচে উঠল। ইঁটের পাঁজা থেকে ঝুরঝুর করে নোনা-লাগা দানা ঝরে পড়তে শুরু করল। কাশঝোপ থরথর

করে শিউরে উঠল, যেন জানান দিল, মা বিষহরির জয়জয়কার চারদিকে। জয় বিষহরি মাগো, তোরই জয়জয়কার।

প্রদীপ জ্বালতে জ্বালতে কালা ওঝা স্বগতোক্তি করল, বুঝলি টগর, হাওয়ার মধ্যে পাপ ঢুকেছে। দেখছিস না সন্ধ্যার বাতাসও কেমন ছোবল দেয়, বিস্বাদ লাগে। জ্বালা করে চোখ মুখ……দেখছিস না ··

টগরমণি অবসাদে ভেঙে পড়ে আছে, আর পারা যায় না।

কালা শেখ ডাকল, টগর, ও টগর, প্রদীপ দিবি না আজ?

পাশ-মোড়া দিয়ে নিরুত্তর হয়ে পড়ে রইল টগর। কি হবে প্রদীপ দিয়ে, কি হবে তেলটুকু খরচ করে। না না, কথাটা ভাবতে গিয়ে টগরমণি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কালা শেখই প্রদীপ হাতে এগিয়ে এল কবরের কাছে। অন্ধকার জমাট বেঁধে আত্মা ফকিরের গোরস্থানটা ঢাকা দিয়ে রেখেছে! ঘাস জমেছে কবরের ওপর। কালা শেখ উবু হয়ে বসল। বসে সেই ঘাসের ওপর হাতে চেটো বুলাতে লাগল। আর প্রদীপটা লাফিয়ে লাফিয়ে অন্ধকার কাপতে লাগল।

কত স্মৃতি, কত বিস্মৃতি সব কিছু জট পাকিয়ে গুমরে গুমরে কেঁদে বেড়াচ্ছে যেন যেন এখানে। কালা ওঝা বসে বসে রোমন্থন করতে লাগল।

একদিন দুধরাজ ধরেছিল কালা শেখ। আনাড়ীর মতো মুঠো পেতে ধরে তাই দেখাতে এসেছিল আত্মা ফকিরকে।

দুধরাজ ধরেছিস, এঁ্যা দুধরাজ! আত্মা ফকির লাফিয়ে এসে সাপটা ছিনিয়ে নিয়েছিল ওর হাত থেকে। এই ত্থাখ, বুঝিয়ে দিয়েছিল তারপর দুধরাজের কি কি লক্ষণ। তারপর আশ্চর্য ভঙ্গিতে তাকে সম্মোহন করে নানা রকম কৌশল দেখিয়েছিল। দেখতে দেখতে কালা শেখ কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

সম্মোহন, স্তম্ভন, বশীকরণ সব শিখল কালা ওঝা। কি অক্লান্ত শ্রম করল, কি অটুট ধৈর্য তাকে ধরতে হল। কিন্তু ·····

প্রদীপের আলো চুষে চুষে অন্ধকারটা যেন নিঃশেষ করে ফেলছে। আর কতক্ষণই বা জ্বলবে। কতটুকুই বা তেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কালা শেখ, নাঃ তেমন দিন আর নেই।

একদৃষ্টে সে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রথমে চোখে তার রঙের ধাঁধা লাগল, তারপর সবকটি রঙ মিলে একটিই মাত্র রঙ হল, সেই রঙটার জ্যোতিতে সমস্ত অনুভূতি তার লোপ পেয়ে বসল যেন।

একি, কাকে দেখছে কালা শেখ, এ যে তার গুরু আত্মা ফকির তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে ভীষণ কান্না পেল কালা শেখের। ঠোট দুটো তার থরথর করে কাঁপতে লাগল। কালা শেখ ঝাঁপিয়ে পড়ল কবরের উপর, তারপর চেঁচিয়ে ওঠে, গুরু গো, বাতাসে যে সাপ লুকিয়েছে মনে হয়, ওদের সঙ্গে লড়ব এমন মন্ত্র কেন শিখিয়ে দিলে না গুরু, গুরু গো—কবরের উপর মাথা ঠুকতে লাগে কালা শেখ।

সংস্কৃতি-সংবাদ

পঁচিশে বৈশাখের ডাক

বৈশাখ আসে। এবং বারে বারে পঁচিশে বৈশাখ আমাদের ডাক দেয়। শুধু সেদিনটি উদ্‌যাপনের কথাই এবার আমাদের ভাবতে হচ্ছে, তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে হচ্ছে—রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী মহোৎসবের কী পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি, কতটাই বা উদ্যোগ সেদিকে দেখা যাচ্ছে। অনেক কাজের মতো আমাদের জাতীয় অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছে কোনও আয়োজনের জন্য প্রথম থেকেই যথারীতি প্রস্তুত না হয়ে 'শেষ মুহূর্তের' জন্য তা ফেলে রাখা, পরে সেই 'শিয়রে সংক্রান্তি' অবস্থায় বায়ুগ্রস্ত মানুষের মতো একটা অতি-ব্যস্ততায় যে করে হোক তা 'পার করে' দেওয়া। যতই 'পরিকল্পনার' মন্ত্র আওড়াই আমরা সুনিবদ্ধ রীতিতে কার্য পরিচালনা অভ্যাস করিনি—কি রাজনীতিতে, কি ব্যবসা-বাণিজ্যে। হিস্টিরিয়া সম্মত পদ্ধতিতে উৎসব উদ্‌যাপন করা যায় না—দায় শোধ করা যায়। এখন থেকে প্রস্তুত না হলে আমরা শেষ অবধি অপ্রস্তুতই হব।

কবি-পূজার বাঙালী পথ

রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালনের প্রয়াস গত পনেরো-ষোলো বৎসরে স্তিমিত না হয়ে ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হয়েছে—এটি দেশের শুভবুদ্ধি ও সুস্থ চেতনারই পরিচায়ক। নব-বর্ষ, বিজয়া বা সরস্বতী-পূজার অপেক্ষাও বাঙালীকে রবীন্দ্র-জয়ন্তী বেশি করে অধিকার করেছে—এখন বাঙালীর জাতীয় উৎসবে তা পরিণত হচ্ছে—শুধুমাত্র হুজুগে বা অভ্যাসে পরিণত হলে তা আর উৎসব থাকত না। তা ছাড়া এ উৎসব সর্বশ্রেণীর আপনার জিনিস হয়ে উঠছে—রবীন্দ্রনাথকে শুধুমাত্র রাবীন্দ্রিক ব্যবসাদার বা কাল্‌চারিস্ট স্নবগণ নিজেদের সম্পত্তি করে রাখতে পারে নি, তাদের তাই খেদের অন্ত নেই। অর্থাৎ উৎসবটি প্রাণবন্ত।

এই জাতীয় উৎসব পালনে তথাপি সর্বক্ষেত্রে যে আমরা বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দিই না, তাও সত্য। নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠী নিজেদের

আগ্রহানুযায়ীই এ উৎসবের আয়োজন করবেন তা স্বাভাবিক। কিন্তু উৎসবটি শুধুমাত্র বিশেষ প্রতিষ্ঠানের বা গোষ্ঠীর বিজ্ঞাপনী—অথবা সভাপতি, প্রধান অতিথি, দ্বিতীয় অতিথি বা বক্তা প্রভৃতিদের ভাষণ আবর্তে ঘোলা হয়ে না ওঠে, তা দেখা আজ প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, ক্লাবে ক্লাবে রবীন্দ্রজয়ন্তী প্রতিপালিত হোক তা আমাদেরও কামনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই যেন উৎসবের উৎস হন—তিনি শুধু উপলক্ষ্য হয়ে না পড়েন—এই কথাটি সর্বক্ষণ লক্ষণীয়। অনেক উৎসবেই, মনে হয় বক্তাদের, উদ্যোক্তাদের, এমনকি শিল্পী ও গায়কদের প্রত্যেকেরই চক্ষে রবীন্দ্রনাথ উপলক্ষ্য মাত্র, প্রায় প্রত্যেকেরই লক্ষ্য উত্তম পুরুষ। এমন কথা বলব না যে, রবীন্দ্র-সংস্কৃতির আলোচনা একেবারে নিষ্প্রোয়জন। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সে আলোচনার জন্য সাধারণতঃ কোনো পণ্ডিত, কোনো সাহিত্যিক, কোনো প্রচার-কাণ্ডারী সাংবাদিক বা সম্পাদককে মুখপাত্র না করলেও চলে—রবীন্দ্রসাহিত্য সে পক্ষে যথেষ্ট। কোনো উকীল-মোক্তারের রবীন্দ্রনাথের জবানীতে কথা বলা নিস্প্রয়োজন। তিনি নিজের কথা বলতে জানতেন—গঙ্গা পূজা ডোবার জলে না করলেই ভালো। রবীন্দ্রজয়ন্তী ও রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি (শুধু বই দেখে কবিতা 'পাঠের' নাম 'আবৃত্তি' নয়), প্রবন্ধ পাঠ, গল্প পাঠ, নাট্যাভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য ও নৃত্যনাট্যের অভিনয়ের ব্যবস্থা দ্বারাই প্রতিপালিত হওয়া সমীচীন। আর আলোচনাই যদি অভিপ্রেত হয়, তাহলে যথাসম্ভব সঙ্গীত-নৃত্য-নাটকের আসরে আলোচনার ঠাঁই করে দিয়ে তাকে বিড়ম্বিত ও বিহসিত না করাই শ্রেয়।

সকল রকমের আলোচনা, অভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতির পৃথক ও স্বচ্ছন্দ অবকাশ থাকে একমাত্র আমাদের মেলায়—যা ছিল রবীন্দ্রনাথের অতীব প্রিয় জিনিস। কিন্তু 'মেলা' আর একালের সভাসমিতি, বাসর প্রভৃতি এক জিনিস নয়। তেমন করে বৈশাখী মেলার মতো—কিংবা এককালের 'জাতীয় মেলার' মতো—যথাযথই কোনো 'রবীন্দ্র-মেলা' যদি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়, সম্ভবত তা হলে রবীন্দ্রজয়ন্তী একটি সার্থক অনুষ্ঠানে পালিত হতে পারবে। কেঁদুলীতে জয়দেবের মেলা কবে থেকে চলেছে, ঠিক নেই। এমন ধারাবাহিক কবি-পূজার ঐতিহ্য যে জাতির আছে তারা কি একালে 'রবীন্দ্র-মেলার' শুভ সূচনা করতে পারে না? রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষেই এই অনুষ্ঠানের সূচনা হোক না!

শতবার্ষিকীর-উৎসব আয়োজন

রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকীর উৎসব কীভাবে পালিত হবে, যতদূর জানি এখনো কোনো ভারতীয় প্রতিষ্ঠানই তা সুস্থির করেন নি। বিদেশে কোনো কোনো দেশ কিন্তু সেদিকে অধিক অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। সোবিয়েত দেশে এ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র-নৃত্য-নাট্য-অভিনয় থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-স্মরণী গ্রন্থ প্রভৃতি প্রকাশনের নানা আয়োজন স্থিরীকৃত হয়েছে, সোবিয়েত প্রচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের থেকে এপ্রিল মাসেই আমরা তা শুনেছি। এদেশে সে-সময়ে অজস্র আয়োজন নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু প্রধানত কেন্দ্রীয় উৎসব-সমিতির নেতৃত্বেই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে, এ আমরা মেনে নিতে পারি। এদিকে শতবার্ষিকী-উৎসবের জন্য রবীন্দ্রভবনের পক্ষ থেকে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ বহুদিন ধরে সাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন। তাতে কতটা উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে জানি না; তবে তাঁর পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালনের যথার্থ আগ্রহ দেখা গিয়েছে, এ কথা স্বীকার্য। নয়াদিল্লীর 'সাহিত্য-অ্যাকাদেমি'র প্রকাশন আয়োজনের কথাও আমরা জানি। কিন্তু শুনেছি—কেন্দ্রীয় উৎসব-সমিতির আবেদনানুযায়ী উৎসবের জন্য অর্থাগম এখনো হয় নি। সে সমিতি পণ্ডিত জওহরলাল, ডাক্তার রাধকৃষ্ণণ প্রমুখদের নেতৃত্বে গঠিত। তাঁদের সঙ্গে চিরদিনের আমলাতান্ত্রিক ঐতিহ্যানুযায়ী স্থান পেয়েছেন নেতাদের পার্শ্বচর আমলা-প্রধানরা। আমরা তাঁতে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হব না যদি দেখি যে—উদ্যোগে, সংগঠনে, পরিচালনায়, দৈনন্দিন কার্যে এই নেতৃ-শোভিত ও আমলা-সেবিত সমিতি যথার্থ কর্মক্ষমতার পরিচয় দেন। ভারতবর্ষের কোনো ক্ষেত্রেই আজ এ শ্রেণীর নেতৃত্বের ও কর্মচারীচক্রের সেরূপ কর্মশক্তির চিহ্ন দেখতে পাই না। তাই শুনে আশ্চর্য হইনি—সমিতির আবেদনে এখনো আঠারো (?) লক্ষ টাকার মধ্যে এক লক্ষ টাকাও সংগৃহীত হয় নি। তবে এও আমরা জানি পণ্ডিতজী যখন শিরোভূষণ তখন শেঠজীরা ইঙ্গিতমাত্রই যথাসময়ে ভাণ্ডার পূর্ণ করবেন। অবশ্য সেই ইঙ্গিতের মূল্য হবে প্রাইভেট সেক্টারে আরও কিছু লুণ্ঠন আর ইনকামট্যাক্স সুপারট্যাক্স থেকে শুরু করে আরও কিছু ট্যাক্স লঙ্ঘন। যাই হোক, ইঙ্গিতও যাই হোক, অর্থ-ভাণ্ডার পূর্ণ হোক, আর সমিতির উৎসব পরিকল্পনাও যথারীতি অগ্রসর হয়ে চলুক—এবারের পঁচিশে বৈশাখে আমরা বারেবারে তা কামনা করি।

কিন্তু রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব শুধু কেন্দ্রীয় সমিতি বা কোনো সরকারী আধা-সরকারী সমিতিই সম্পূর্ণ করতে পারবেন, এ আমরা মনে করি না। আসলে উৎসব সম্পূর্ণ হবে যদি বিশ্বের ও ভারতবর্ষের জনসাধারণের মনে রবীন্দ্র-প্রতিভার আবেদন পৌঁছয়, আর তারও ভিত্তি রচিত হতে পারে যদি বাঙলার জনচিত্তের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার ঐশ্বর্যকে আমরা সঞ্চিত করতে পারি ও সেই মহামানবীয় সাধনার সত্যকে আমরা সঞ্জীবিত করতে পারি। কিছু করতে হলেই প্রথমত: তাই চাই এই জন্মশতবার্ষিকী উৎসবেও বাঙালী জনসাধারণের উদ্যোগ—অন্ততঃ সকলের সহযোগিতায় জনতার রবীন্দ্রমেলা সমিতি বা পঞ্চায়েত গঠন। অন্যান্য সাংস্কৃতিক আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রামে শহরে সর্বত্র পালনোপযোগী একটি উৎসবসূচী প্রণয়ন করা, প্রকাশ করা, ও তা উদ্‌যাপনে জনসাধারণকে সহায়তা করা।

অবশ্য এ কথায় অর্থ এই নয় যে, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী রবীন্দ্রউৎসব নিজের মতো করে পালন করবেন না। বরং ঠিক তার বিপরীত। শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, ছাত্র, বৈজ্ঞানিক, পল্লীকর্মী, কৃষক, শ্রমিক,— রবীন্দ্রনাথ কার ক্ষেত্রে তাঁর দান যোগাতে কার্পণ্য করেছেন? নিশ্চয়ই তাই আশা করব—(১) 'রবীন্দ্র-মেলার' প্রচলন ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এবং (২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অন্তত এ বৎসর থেকে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাঙলা ভাষাকেই শিক্ষার বাহনে পরিণত করতে উদ্যোগী হবেন। (৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্তত সে বৎসর থেকে বাঙলার প্রশাসনে বাঙলা ভাষাকেই প্রাধান্য দেবেন (এ বিষয়ে কতটুকু তারা উদ্যোগী হয়েছেন, প্রশ্ন করেও আমরা তার উত্তর পাইনি)। (৪) রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত জনশিক্ষার আয়োজনকে সংগঠিত করে তাকে সরকারী অনুমোদন দেওয়া হবে। (৫) বাংলার ভূমিসমবায় আয়োজনকে সমবায়-উদ্যোগী রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে কোনোরূপে যুক্ত করা যাবে (৬) নৃত্য ও নাট্যের অভিনয়োপযোগী 'জাতীয় মঞ্চ'ও তৈরি হোক আর তার নাম হোক—রবীন্দ্র-নাট্য মন্দির। (৭) সাহিত্যের অন্যান্য পরিকল্পিত আয়োজনের সঙ্গে বাঙালী সাহিত্যিক ও প্রকাশকরা একটি সমবায়মূলক বাঙলা সাহিত্য প্রকাশ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করুন—যার প্রধান কাজ হবে (ক) ইংরেজি ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষায় বাঙলা সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশ ও বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা প্রকাশ। এ গ্রন্থমালার নাম রবীন্দ্র-রশ্মিমালা হতে পারে কি? (খ) ভারতীয় অন্য ভাষায়ও (যেমন হিন্দী, তামিল, মারাঠী) ওরূপ

অনুবাদ ও আলোচনা প্রকাশ, (গ) এবং বিশ্বের তাবৎ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ-গ্রন্থ বাঙলা অনুবাদে প্রকাশ করে বাঙালী সৃষ্টি-প্রতিভাকে উদার দৃষ্টিতে ও নতুন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা (এ গ্রন্থমালার নাম গ্রন্থ-বিশ্বভারতী হতে বাধা আছে কি ?) (ঘ) বাঙলা ভাষার মারফত জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতি সর্ববিষয়ক সুলভ গ্রন্থ (ইংরেজি পেঙ্গুইন পেলিকান, বা এভরিম্যান সীরিজের মতো) প্রকাশ। (ঙ) বাঙলায় ও সমগ্র ভারতে একটি সাধারণ লেখক-সংঘ স্থাপিত হোক, যার কাজ হবে ভারতের ও বিশ্বসাহিত্যের লেখক-গোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতা করা, নিজ সাহিত্যে ও বিশ্বসাহিত্যে সর্ব-সমস্যার আলোচনার ব্যবস্থা করা এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি, আলোচনা, বিশ্বসাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে বিশ্বমানবের মৈত্রীর ও সৃষ্টির পথকে প্রশস্ত করা।

নিশ্চয়ই রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসব বিশ্ব-সংস্কৃতির ও ভারত-সংস্কৃতির সমন্বয় উৎসব হওয়া প্রয়োজন, আর তার বনিয়াদ হওয়া প্রয়োজন মহামানব—'সকল মানুষকে মিলিয়েছে' যে মহামানব। এই আদর্শ মনে রেখে এখন থেকে আমাদের রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকীর জন্য সচেতনভাবে প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। উৎসব-সূচীর আলাপ-আলোচনাও তাই এখন থেকে না করলে নয়—এবারকার পঁচিশে বৈশাখের ডাক এই।

বারীন্দ্র কুমার ঘোষ

বারীন্দ্রকুমার ঘোষের জীবনের সঙ্গে বিগত যুগের স্মৃতি ও বর্তমান যুগের কথা জড়িয়ে ছিল ; তাঁর বিদায়ের সঙ্গে তাই স্মৃতি মথিত করে অনেকের মনে অনেক কথা জাগবে। বয়ঃকনিষ্ঠ একটি পর্যায়ের নিকট বারীন্দ্রকুমার ছিলেন একটা আইডিয়া—সে আইডিয়া সশস্ত্র বিপ্লবের, বোমা ও পিস্তলের। মানিকতলা বোমার মামলার শেষে ব্যক্তি বারীন্দ্রকুমার যৌবনের সেই রৌদ্র-রসের অধ্যায়টি উত্তীর্ণ হয়ে আর এক অধ্যায়ে উপস্থিত হন—ক্রমে আরও নতুন-নতুন অধ্যায়ও উত্তীর্ণ হয়ে যান—পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে এসে সাংবাদিকের জীবিকাও গ্রহণ করেন। আবাল্যের অস্থিরচিত্ততার বশে তিনি সাধারণের নিকট কখনো কখনো প্রহেলিকা হয়ে উঠেছেন। এ-জন্যই, বাঙলা ও ইংরেজি চমৎকার লিখলেও বারীন্দ্রের লেখা সাহিত্যের শ্রীলাভ করে নি, তবে তা তখনকার বিপ্লব আন্দোলনের তথ্যের ও ধারণার উৎস—আর যাই বলুন বা করুন বারীন্দ্র সর্ব ক্ষেত্রে বেপরোয়া রকমের অকপট। লোকমনে যে বারীন্দ্রকুমার আইডিয়া

হয়ে উঠেছিলেন সে বারীন্দ্রকুমারকে তিনি হাসিরঙ্গে উড়িয়ে দিতে কম চেষ্টা করেন নি। তাতে অবশ্য বিপ্লবের আইডিয়া কিছুমাত্র লঘু হয় নি—বরং তার এককালের মোহা-বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে বারীন্দ্রকুমার সহায়তাই করেছেন। এই অকপটতা ছাড়াও বারীন্দ্রকুমার ছিলেন আজন্ম উদার হৃদয় ও দেশপ্রেমিক—তাঁর পরিচিত প্রত্যেকটি মানুষই এ কথা আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে।

রঙ্গমঞ্চে পাবলবের প্রয়োগ

'পাবলব ইন্‌স্টিটিউটে'র নাম অনেকেই হয়তো জানেন না ; অবশ্য তার সম্পাদক ডাঃ ধীরেন গাঙ্গুলীর নাম লেখকসমাজে একেবারে অপরিচিত নয়। মনের রোগের চিকিৎসা এদেশে যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে ফ্রয়েডপন্থীদেরই কথা নানা কারণে সুবিদিত। মতবাদের দিক থেকে ফ্রয়েড প্রায় মার্কসের উল্টো পিঠ। সেদিক থেকে রুশ বৈজ্ঞানিক পাবলব মার্কসের নিকটতর। যাইহোক, এ যুগের নানা দ্বন্দ্বের মতো মনোবিচারের ক্ষেত্রে চলেছে প্রধানতঃ ফ্রয়েড ও পাব্‌লবের দ্বন্দ্ব—স্বভাবতই প্রতিক্রিয়া-পন্থীরা ফ্রয়েডের অর্ধ রহস্যবাদের পরিপোষক ; আর সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদীরা পাবলবের বাস্তব বিদ্যার সমর্থক। এই মূল তত্ত্বটিকে অবলম্বন করে পাবলব ইন্‌স্টিটিউটের পক্ষ থেকে সেদিন রঙ্‌মহলে 'সম্রাট' নামে একটি উপভোগ্য নাটকের অভিনয় হয়। নাটকটির লেখক ডাঃ গাঙ্গুলীই। অভিনয় সম্বন্ধে বলতে হবে প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই সুন্দর অভিনীত, দু-এক জন অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নাটকটির বিষয়ে আমাদের বলবার এই মুনাফা-সম্রাটেরা কিভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সবকিছু নিজেদের অর্থবলে করায়ত্ত করে এবং সাহিত্য ও মনোবিজ্ঞানের বস্তু-বিরোধী মতবাদকে কেমন করে নিজেদের মুনাফার স্বার্থে পরিপোষণ করেন, নাটকটি তা চমৎকার রূপে উদ্ঘাটন করেছে—সেইখানেই তার সার্থকতা। এই মূল আখ্যান যথার্থরূপে প্রকাশিত হলে আর আলাপে-বক্তৃতায় পাবলবের মতবাদ ব্যাখ্যা ও ফ্রয়েডের মতবাদ নিন্দা করা নিষ্প্রয়োজন হত। এই নিষ্প্রয়োজনের ভাবটা আরও একটু লঘু করলেই নাটকটি আকারে ও চরিত্রে আরও ঘণ ও দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠতে পারবে। একটি সার্থক নাটক সার্থক অভিনয়ের সহযোগে পাবলবের তত্ত্বকে সার্থক রূপ দেবে।

গোপাল হালদার

যেখানে দুজনের রুচির মিল, সেখানেই বন্ধুত্ব বেশী স্থায়ী হয়। এই সাইকেলের বেলাতেই দেখুন না! র‍্যালে সাইকেলের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সকলেই একমত। কারণ সুদৃশ্য ও নিখুঁত এই সাইকেলটি বছরের পর বছর ব্যবহারের পরেও সমান নির্ভরযোগ্য থাকে।

THE RALEIGH
ASANSOL INDIA

বিশ্ববিখ্যাত বাইসাইকেল

SAC-59 BEN

জ্যৈষ্ঠ : ১৩৬৬

আহারের পর
দিনে দু'বার..

SADHANA
Mritasanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বৎসরের পুরাতন)
মৃতসঞ্জীবনী

সূচীপত্র

২৮শ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮১ ; ১৩৬৬ ॥ ১১শ সংখ্যা

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং 'পরিচয়' কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
২৮ বর্ষ ॥ ১১শ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৮৮১ ; ১৯৫৯

বাংলায় মেঘদূত

শীতাংশু মৈত্র

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুসলমানদের ও ফার্সীর প্রভাব যখন বাংলা ভাষা ও বাঙালীর ওপর থেকে সরে গেল এবং নতুন-ওঠা ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে লাগল, এমন কি মাঝে মাঝে ইংরেজ-বিদ্বেষীও হয়ে উঠল তখন নিজের ঐতিহ্য আবিষ্কারের দিকে তার নজর গেল। ধর্মগ্রন্থের দিকেই অবশ্য দৃষ্টি গেল আগে কিন্তু Secular অর্থাৎ ঐহিক সাহিত্যের দিকেও ফিরতে বেশী সময় লাগল না। সেই অনুবাদের ধারায় মেঘদূতকে পাচ্ছি ১৮৫১ সালেই। কিন্তু ১৮৫৮ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদেই সত্যিকারের সাড়া পড়েছিল ; মধুসূদন দত্ত পর্যন্ত সেই অনুবাদ পড়ে বাংলা ভাষার সম্ভাবনায় আস্থাবান হয়ে উঠেছিলেন। সে অনুবাদের নমুনা দিচ্ছি—একেবারে প্রারম্ভিক শ্লোকেরই অনুবাদ :

কুবেরের আজ্ঞায় কোন যক্ষরাজ
কান্তা সনে ছিল সুখে ত্যজি কর্মকাজ।
ক্রোধভরে ধনপতি দিল তারে শাপ—
বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ !

দ্বিজেন্দ্রনাথ এখানে গতানুগতিক পয়ারেরই প্রয়োগ করেছেন কিন্তু উত্তর মেঘে ব্যবহার করেছেন ললিত ত্রিপদী ; যথা :

অট্টালিকা কত শত সাজিয়াছে তোমা মত
দেখিবে হে গিয়া অলকায় ;
তোমার তড়িত মালা সেথায় ললিত বালা
তুল্য শোভে কি বা দুজনায় ;
তোমার গর্জন স্বর শুনিতে কি মনোহর,
সেথায় মৃদঙ্গ বাজে তায় ;

তোমার অন্তরে জল প্রকাশিছে নিরমল,
মণিময় ভূতল সেথায় ;
ইন্দ্রধনু তোমা দেহে অলকার গেহে গেহে
চিত্রলেখা তেমনি প্রকাশ ;
হর্ম্যগণ সুশোভন, উচ্চাকার আয়তন,
তোমা মত ছুঁয়েছে আকাশ ।

এটি উত্তর মেঘের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ ।

দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে অক্ষর-মাত্রিক বাংলা ছন্দে, সংস্কৃতের কাছ থেকে প্রচুর ঋণ করেও, মন্দাক্রান্তা কেন, সংস্কৃতের কোনো ছন্দেরই প্রতিরূপ বাংলায় দেওয়া যায় না। জ্যেষ্ঠের প্রায় ৩০ বছর পরে সত্যেন্দ্রনাথও এই অক্ষর-মাত্রিক ছন্দেই আবার মেঘদূতের অনুবাদ করেন। সে অনুবাদের নমুনা দিই :

স্বকার্যে কি দোষ গণি প্রভু দিলা যক্ষে গুরুশাপ,
'বর্ষেক ভুঞ্জিবি তুই কান্তা ছাড়ি প্রবাসের তাপ ;
নিবসে বিরহি যক্ষ রামগিরি আশ্রমে অধীর,
স্নিগ্ধ ছায়াতরু যেথা, জানকীর স্নানে পুণ্য নীর ।

এ অনুবাদের আপেক্ষিক উৎকর্ষ স্বতঃস্ফুট। সত্যেন্দ্রনাথ অষ্টাদশাক্ষর-মাত্রিক পয়ারে অনুবাদ করেছেন, যতি ৮ মাত্রা ও ১০ মাত্রার পর। এ কথা ভুললে চলবে না যে, দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্য প্রকাশের পূর্ববর্তী কিন্তু মেঘনাদবধে মধুসূদন বাংলা ছন্দের মুক্তি না ঘটালে সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে ১৮ অক্ষরের পয়ার লেখা সম্ভব হত না। ১৪ অক্ষর ১৮ অক্ষরে দীর্ঘায়িত হবার ফলে মন্দাক্রান্তার আয়ত ধ্বনির কিছু রেশ বাংলায় আসছে। তার ওপর সত্যেন্দ্রনাথ দীর্ঘস্বর এবং যুক্তাক্ষর ব্যবহারেও সচেতন কৌশল প্রয়োগ করেছেন। যেমন মূলের 'কশ্চিৎ' কথাটির ধ্বনি-মূল্য বাংলায় প্রায় পুরোপুরি বজায় রয়েছে 'স্বকার্যে' কথাটিতে ; এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে 'কান্তা' কথাটি মূল থেকে হুবহু গ্রহণ করায় তার সংস্কৃত অনুষঙ্গ থেকে তো বঞ্চিত হয়ইনি বরং বাংলায় অপ্রচলিত বলে অভাবিতের আস্বাদযুক্ত হয়েছে। সবার ওপর লক্ষ্য করার বিষয় সত্যেন্দ্রনাথের বাক্-পরিমিতি। ১৭টি ধ্বনির ঘনবদ্ধ মন্দাক্রান্তাকে ১৮ মাত্রায় পুরো ধরে দেওয়া এবং তাও চার পংক্তির মধ্যেই—এ এক বিস্ময়কর কীর্তি সন্দেহ নেই। আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গ্রীক হেক্সামীটারকে ইংরেজীতে রূপান্তরের দীর্ঘ

প্রয়াসের কথা। ইংরেজী Heroic Verse ছাড়াও, ব্যালাড মীটার থেকে আরম্ভ করে টেনিসনের সপ্তচরণবদ্ধ গম্ভীর পংক্তি পর্যন্ত, আবার এদিকে মুক্তচ্ছন্দে বা Verse libre এ আধুনিক প্রচেষ্টা—সবেরই ঐ একই উদ্দেশ্য। অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রে মূল থেকে কিছু বেশী সরে গিয়েছেন। যেমন 'কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনিজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে?' তাঁর হাতে হয়েছে 'না জানি কি দশা তার, প্রিয়জন যার পরবাসে!' কিন্তু এতে খুব বেশী ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না কেননা বাংলাভাষার শিষ্ট অভ্যাস-অনুসারে 'কণ্ঠাশ্লেষ' ইত্যাদির হুবহু বাংলা রূপান্তরে আমাদের সম্ভবত অস্বস্তিই ঘটত। ১৮৮৫ সালেও যে সত্যেন্দ্রনাথ ঐ রুচির পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর মার্জনা-বিদগ্ধ ও মিতচারশীল মনেরই পরিচয় পাই।

সত্যেন্দ্রনাথের তিন বছর আগে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ পড়লে মনে হবে যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যে অর্জনসাপেক্ষ এ কথা সাংস্কৃতিক কর্মীরাই বোঝেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও মধুসূদন দত্ত যা অর্জন করে দিয়ে গেলেন বাংলাভাষার জন্যে, রাজকৃষ্ণবাবু তা থেকে কিছুই গ্রহণ করলেন না। নমুনা দিই :

> কার্য ফেলি অন্যমনা যক্ষ একজন,
> 'কান্তা ছাড়ি দূরে গিয়া থাক সংবৎসর'
> এ দারুণ প্রভুশাপে মহিমা আপন
> হারাইয়া রহে গিয়া রামগিরি পর,
> যথা জানকীর স্নানে পুণ্যময় জল,
> বিস্তারে শীতল ছায়া যথা তরুদল।

এ সেই পুরানো পয়ার ; শুধু একান্তর মিল আছে, এই যা, আর শেষে একটি যুগ্ম পংক্তি। মধুসূদন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের পরেও এ অনুবাদ যে সম্ভব হল, এইটাই আক্ষেপের কথা। কর্ণবান যে কোনো ব্যক্তি এই ছন্দের সঙ্গে মন্দাক্রান্তার গতি ও ভঙ্গির আত্যন্তিক পার্থক্যে অনুবাদকের রুচি সম্বন্ধেই সন্দিহান হয়ে উঠবেন। এঁদের পরে অন্যান্য অনুবাদ আরও হয়েছে। কিন্তু গতানুগতি এড়িয়ে যিনি বাংলা মাত্রাবৃত্তে মেঘদূতকে ধরবার চেষ্টা করলেন তিনি সত্যেন দত্ত। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মানসীর 'মেঘদূত'-এ অনুবাদের চেষ্টা না করে যতখানি দেওয়া যায় মেঘদূতকে ততখানিই আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন। দেখলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বুঝি সেই পয়ারেরই আশ্রয় নিয়েছেন কিন্তু কান অন্য রকম সাক্ষী দেয়। কয়েকটি পংক্তি নিয়ে দেখা যাক :

কোন পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত।
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে…
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ-ক্রন্দন
এক দিনে।…
সেই দিন ঝরে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি।

কান পেতে পড়লেই বোঝা যায় এখানে রবীন্দ্রনাথ পয়ারকে দিয়ে তাই করিয়েছেন যা ইংরেজীতে Iambic Pentameter করে Homerএর কি Virgilএর Hexameter এর ক্ষেত্রে। সংস্কৃত শব্দের, যুক্ত ব্যঞ্জনের এবং যতি-বৈচিত্র্যের সমাবেশে এ যেন কাশীদাসী পয়ারের বংশজাত বলে মনেই হয় না। উদ্ধৃতির তৃতীয় পংক্তিতে 'আঁধার'-এর পরে, ষষ্ঠ পংক্তিতে 'দিনে'র পরে, সপ্তমে 'পড়েছিল'-র পরে এবং শেষেরটিতে 'তোমার'-এর পরে যতিপাত ক'রে পয়ারের একঘেয়েমিকে কাটিয়ে উঠেছেন আবার প্রথাগত ৮।৬ ভাগও রাখবার ফলে এই ব্যতিক্রম আরও মনোরম হয়েছে। এ কথা না বললেও চলে যে, মধুসূদনের 'অকালে'-র পরে যুগান্তকারী যতিপাতই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই সাহস ও পরীক্ষার পটভূমিকায়। কিন্তু ধ্বনি-গাম্ভীর্যে এই পংক্তিগুলিকে সংস্কৃত-কল্প করে তুললেও রবীন্দ্রনাথ অমিত্রাক্ষর ব্যবহার না করে মিত্রাক্ষরেরই প্রয়োগ করলেন কেন? তার ওপর রবীন্দ্রনাথ স্তবক থেকে স্তবকান্তরে গিয়েছেন এই মিত্রাক্ষরের মাধ্যমে: যেমন প্রথম স্তবকের শেষ পংক্তি 'সঘন সংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে' এবং দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পংক্তি 'সেদিন সে উজ্জয়িনী প্রাসাদ শিখরে'। এই রকম মিল সমস্ত কবিতা ব্যেপে আছে। এত বেশী এবং এত বিচিত্র অন্ত্যানুপ্রাসের তাগিদ অনুভব করার কারণ কি এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতের মন্দাক্রান্তার ধ্বনি-সুষমার স্বাদ বাংলায় দিতে গিয়ে এই মিলকে অপরিহার্য মনে করেছিলেন। তা না হলে মধুসূদনের ধ্বনিগম্ভীর অমিত্রাক্ষরে অভ্যস্ত বাঙালীকে রবীন্দ্রনাথ অমিত্রাক্ষরে মেঘদূত দিলেন না কেন? তবু স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কালিদাসের মেঘদূতের আস্বাদ্যমানতা পেলেও রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের অনুবাদে হাত দেন নি। যদি কেউ সংস্কৃত না পড়ে কালিদাসের মন্দাক্রান্তার 'উদার

শ্লোকরাশির' রসানুভূতির ঈপ্সা, হয় তবে তার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের মেঘদূতই সর্বোত্তম পরিবর্ত বা বিকল্প। রবীন্দ্রনাথ কেন প্রত্যক্ষ অনুবাদে হাত দিলেন না তার কারণ তিনি ১৯৩১ সালে স্বর্গত প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লিখিত একখানি চিঠিতে খুলে বলেছেন। সে চিঠিখানি হুবহু উদ্ধার করছি: "সংস্কৃত কাব্য-অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, কাব্যধ্বনিময় গন্থে ছাড়া বাংলা পদ্যছন্দে তার গাম্ভীর্য ও রস রক্ষা করা সহজ নয়। দুটি-চারটি শ্লোক কোনোমতে বানানো যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ কাব্যের অনুবাদকে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা দুঃসাধ্য। নিতান্ত সরল পয়ারে তার অর্থটিকে প্রাঞ্জল করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে ধ্বনিসংগীত মারা যায়, অথচ সংস্কৃত কাব্যে এই ধ্বনিসংগীত অর্থসম্পদের চেয়ে বেশী বই কম নয়।

"মন্দাক্রান্তা ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবোধ বাঙালির কানের উল্লেখ করেছেন। বাঙালির কান বলে কোনো বিশেষ পদার্থ আছে বলে আমি মানিনে। মানুষের স্বাভাবিক কানের দাবি অনুসরণ করলে দেখা যায় মন্দাক্রান্তা ছন্দের চার পর্ব। যথা—

মেঘালোকে | ভবতি সুখিনো | প্যন্যথাবৃৎ | তি চেতঃ

অর্থাৎ মাত্রাহিসাবে আট+সাত+সাত+চার। শেষের চারকে ঠিক চার বলা চলে না। কারণ লাইনের শেষে একমাত্রা আন্দাজের যতি বিরামের পক্ষে অনিবার্য। এই ছন্দকে বাংলায় আনতে গেলে এই রকম দাঁড়ায়—

দূরে ফেলে গেছ জানি,
স্মৃতির বীণাখানি,
বাজায় তব বাণী
মধুরতম।
অনুপমা জেনো অয়ি,
বিরহ চিরজয়ী
করেছে মধুময়ী
বেদনা মম।

সংস্কৃতের অমিত্রাক্ষর রীতি অনুবর্তন করা যেতে পারে। যথা—

অভাগা যক্ষ কবে করিল কাজে হেলা, কুবের তাই তারে দিলেন শাপ,
নির্বাসনে সে রহি প্রেয়সী-বিচ্ছেদে বর্ষ ভরি সবে দারুণ জ্বালা।
গেল চলি রামগিরি-শিখর আশ্রমে হারায়ে সহজাত মহিমা তার,
সেখানে পাদপ-রাজি স্নিগ্ধ ছায়াবৃত সীতার স্নানে পূত সলিলধারা॥"

রবীন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তার বাংলায় রূপান্তরের অসম্ভাব্যতার কথা বলেও রূপান্তরের যে ছকটি দিয়েছেন শেষে, সত্যেন দত্ত 'যক্ষের নিবেদনে' সেই ছকই ব্যবহার করেছেন বছর কয়েক আগে—তফাত এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাঠামোতে শেষ পর্বে যে চার মাত্রা আছে, সত্যেন দত্ত তাঁকে পাঁচ মাত্রা করেছেন, তাও রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই, কেননা তিনি শেষ পর্বের অন্তে যতির জন্যে একমাত্রা ধরেছিলেন। সত্যেন দত্তের স্তবকের নমুনা :

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মুরতি ধরি আজ মন্দ্রমন্থর বচন কও ;
সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।

সত্যেন দত্ত-রবীন্দ্রনাথে কিন্তু এক জায়গায় লক্ষণীয় পার্থক্য : সে হল মিলে। সত্যেন দত্ত, রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের মত যুগ্মচরণে মিল রেখেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রথম নমুনাটিতে অন্ত্যানুপ্রাসের ছড়াছড়ি এবং সেটির ধ্বনি-সুষমা দ্বিতীয়টির চেয়ে বেশী মনোহারী। সত্যেন দত্ত তাই যুক্তব্যঞ্জন ও আয়তধ্বনি প্রয়োগ করেও আবার মিল ব্যবহার করেছেন ; না হলে যেন মন্দাক্রান্তায় মনোহরণের পথে ব্যাঘাত ঘটবে। তবু সত্যেন দত্ত ঐ ৮টি স্তবক ছাড়া বাংলা মন্দাক্রান্তায় পুরো মেঘদূত অনুবাদের চেষ্টা করলেন না। ঐ ৮ স্তবকেই তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত না হলেও কান নেতিয়ে পড়েছিল। তার একমাত্র কারণ যুক্তব্যঞ্জনের টঙ্কার না থাকায় শুধু আয়ত-ধ্বনিতে মন নেতিয়ে পড়ে—ঐ যেমন ঝিঁঝির ডাক প্রথম শোনার পরেই আর কানে বাজে না, সেই রকম।

এত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও বুদ্ধদেব বসু মশায় আবার মাত্রিক ছন্দে বাংলায় মেঘদূত অনুবাদ করেছেন কিন্তু এই বিশেষ গ্রন্থানুবাদক তাঁর পূর্বগামীদের কোথাও একটি বারের জন্যেও স্মরণ করেননি, এক প্রসঙ্গত সত্যেন দত্তকে ছাড়া। বাংলায় যে মেঘদূত অনুবাদের একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে তা তাঁর গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকায় অস্বীকৃত। স্পষ্টত স্বীকার না করলেও, আশা করা যেতে পারত যে তিনি সত্যেন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে ২৭ মাত্রায় এবং যথেষ্ট যুক্তব্যঞ্জন, তৎসম শব্দ ও আয়ত স্বরধ্বনি ব্যবহার করে অনুবাদ-কার্য সমাধা করে, সত্যেন দত্তের অসম্পূর্ণ কাজে কিছু সম্পূর্ণতা দান করবেন। কিন্তু তিনি নীতিগত কারণে তৎসম শব্দ একেবারে (দুই একটি অদ্ভুত প্রয়োগ ছাড়া) পরিহার করে, চলতি বাংলার উপর অনন্যনির্ভর হয়ে এবং মাঝে মাঝেই চলতি বাংলারও বাগ্ধারা

লঙ্ঘন করে এমন এক জিনিস পাক করেছেন যে তা থেকে কালিদাসের আদি মিষ্টান্নের ক্ষীণতম স্বাদও পাওয়া যাচ্ছে না। এ কথা নিয়ে আজ আর কেউ তর্ক করে না যে, কবিতার ভাষান্তর অসম্ভব, বিশেষ করে অন্য ভাষার ছন্দে। তবু ছন্দান্তর যে কেউ করেন না তা নয়। সেটা কৌতূহল মেটাবার জন্যে ততটা নয়, যতটা কাব্যিক ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তায়। কিন্তু যিনি করেন, যেমন সত্যেন দত্ত অথবা সত্যেন ঠাকুর, তিনি চেষ্টা করেন মূলের সঙ্গে ধ্বনি-সারূপ্য রাখতে—ছন্দে এবং শব্দবিন্যাসে। বুদ্ধদেব বসু 'অনুবাদকের বক্তব্যে' বলেছেন . "যে কোনো অনুবাদেই আমি রূপকল্পগত অবিকল সাদৃশ্যের পক্ষপাতী।' কিন্তু তাঁর অনুবাদে কালিদাসের মেঘদূতের পূর্বমেঘের প্রথম শ্লোক কি রূপ পেয়েছে তা দেখা যাক :

জনেক যক্ষের কর্মে অবহেলা ঘটলো বলে শাপ দিলেন প্রভু
মহিমা অবসান, বিরহ গুরুভার ভোগ্য হল এক বর্ষকাল ;
বাধলো বাসা রামগিরিতে, তরুগণ স্নিগ্ধ ছায়া দেয় যেখানে
এবং জলধারা জনকতনয়ার স্নানের স্মৃতি মেখে পুণ্য।

প্রথমেই লক্ষণীয় যে, প্রতি চরণে মাত্রা-সংখ্যার সমতা নেই। প্রথম চরণে ২৬, দ্বিতীয়ে, ২৬ তৃতীয়ে ২৪ এবং চতুর্থে ২৪। অনুবাদক বলেছেন তাঁর কানে এই বৈচিত্র্য সুশ্রাব্য ঠেকেছে ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি সত্যেন দত্ত কেউই এই স্বাধীনতার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অনুবাদকের মতে সত্যেন দত্ত মোটে আটটি স্তবক রচনা করেছিলেন এবং তাও অনুবাদ হিসেবে নয় : তাই তিনি সম-মাত্রার (২৭ মাত্রার) পংক্তি রচনক্ষম হয়েছিলেন। মেঘদূত অনুবাদ করতে বসলে তিনিও ঐরকম স্বাধীনতা দাবি করতেন। কিন্তু এই মাত্রার অসাম্যে অনুবাদ মূলের 'রূপকল্প' হারায় এবং পংক্তি থেকে পংক্ত্যন্তরে যাবার পথে কানের যে পূর্বসৃষ্ট প্রত্যাশা তা প্রতি পদে পদে ব্যাহত হওয়ায় ধ্বনি সুষমার বদলে ধ্বনিবিভ্রাট ঘটে। অনুবাদক এ কথা ভুলে গেলেন কি করে যে ছন্দের পক্ষে বৈচিত্র্যের চেয়ে ধ্বনিসাদৃশ্যই বেশী প্রয়োজন এবং বৈচিত্র্য শুধু একতান বা একঘেয়েমি দূরীকরণের জন্যই প্রধানত ব্যবহার্য। কিন্তু তার বদলে যদি প্রতি পংক্তিতে ক্রমান্বয়ে অসম-মাত্রা ব্যবহার করা যায় তাহলে মাত্রাসাম্যের ফলে উদ্ভাব্য ঐকতান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে কেবল চমক লাগে। এই চমক মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করায় কবিতা উপভোগের সামগ্রীর বদলে হয়ে ওঠে অস্বস্তিকর সামগ্রী ; অবিরাম চমকানিতে মন বিপর্যস্ত হয়ে পাঠে অমনোযোগ ঘটে। তাই

ঐ অসম-মাত্রা অনুবাদকের কানে ভালো লাগলেও সাধারণ পাঠকের কর্ণ-পীড়াদায়ক এবং সাধারণ পাঠক এই বিসদৃশ প্রয়োগে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছায় যে অনুবাদক রুচির ক্ষেত্রে নিতান্ত স্বৈরাচারী। অনুবাদক এই প্রকার মাত্রা-প্রয়োগের যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, আধুনিক অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় এই প্রকার স্বৈরাচার সম্ভব? আধুনিকদের মধ্যে বিষ্ণু দে-ই প্রথম অসম-মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে কবিতা রচনা করেন কিন্তু সে প্রয়োগ মুক্তচ্ছন্দের ধার ঘেঁষে গিয়েছে এবং সেখানে পংক্তির দৈর্ঘ্য অনেক কম। বুদ্ধদেববাবু যদি মুক্তচ্ছন্দে অনুবাদ করতেন, কেউ কিছু বলত না; কেন না মুক্তচ্ছন্দে লেখক মুক্ত। অন্যথায় তিনি সম-মাত্রিক নীতি মেনে নিয়ে তাকে আবার নীতিহীনতায় জলাঞ্জলি দেবেন —পাঠক এ অত্যাচার সইবে না, বিশেষ করে সেই বুদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে যিনি রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন কৃতী ছান্দসিক।

দ্বিতীয়ত তিনি যে সত্যেন দত্তের কাঠামোর প্রথম পর্বের এক মাত্রা কমিয়েছেন এবং তাঁরই স্বীকৃতি অনুযায়ী, অচেতনে কমিয়েছেন—তার কি কারণ? তিনি ভূমিকার ৬৮ পৃষ্ঠায় স্বীকার করেছেন যে "বাংলায় যতটা সম্ভব এই ছন্দে মন্দাক্রান্তার চরিত্র ততটাই প্রতিফলিত হয়েছে।" তাহলে সত্যেন দত্তের সেই কাঠামোর প্রথম পর্বের ৮ মাত্রার জায়গায় বুদ্ধদেববাবু ৭ মাত্রা কেন করলেন?

এর কারণ দুরনুসন্ধেয় নয় এবং এই কারণেই নিহিত রয়েছে বুদ্ধদেববাবুর অনুবাদের আসল দুর্বলতা। তিনি ভূমিকার ৬৯-৭০ পৃষ্ঠায় বলেছেন, যে 'আমি চেয়েছি রচনার ভাষা যতদূর সম্ভব বাংলা হোক, এবং আধুনিক বাংলা।' এইখানেই ঘটেছে বিপদ। বাংলাভাষা বিশ্লেষধর্মী অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে analytical কিন্তু সংস্কৃত ভাষা, ল্যাটিন বা গ্রীকের মতো সংশ্লেষ-ধর্মী বা synthetic। তার মানে বাংলাভাষার বাক্যগঠনে ভিন্ন ভিন্ন পদের অবস্থান অপরিবর্তনীয়: বাঘে মানুষ মারে আর মানুষে বাঘ মারে—এই দুই বাক্যে অর্থের আত্যন্তিক বৈষম্য শুধু এই পদের অবস্থানের অপরিবর্তনীয়তা থেকেই আসে। সংস্কৃতে এই বিভ্রাটের বালাই নেই। সংস্কৃতে বাক্যে পদের অবস্থান বিশেষ কোনো অপরিবর্তনীয় ক্রম অনুসরণ করে না। তাই মেঘদূতের প্রথম শ্লোকে কশ্চিৎ আসে প্রথমেই আর যক্ষ আসে তৃতীয় পংক্তির আরম্ভে। এই স্বাধীনতা বা সংশ্লেষ-ধর্মিতা শুধু বাংলায় কেন, প্রায় কোনো আধুনিক কথ্য ভাষাতেই নেই, শুধুমাত্র কিছু পরিমাণে জার্মানে ছাড়া। কথ্য ভাষার বিবর্তনের নিয়মই এই যে, সে ক্রমান্বয়ে analytical হয়ে ওঠে এবং inflexion বা প্রত্যয়

বর্জন করে করে শুধু অবস্থানক্রমের সাহায্যে বাক্যের অর্থস্ফূর্তি ঘটায়। সেই জন্যে সংস্কৃতে বাক্য-গঠনের রীতির সঙ্গে বাংলায় বাক্যগঠনের রীতির এত পার্থক্য। দ্বিতীয়ত দীর্ঘ, সমাসবদ্ধ বিশেষণ পদ বাংলায় একেবারে অচল, যেমন অচল ইংরেজীর relative clause। তার ফলে দীর্ঘ ও সমস্ত বিশেষণ পদের দ্বারা যে অর্থের ঘনত্ব এবং ধ্বনির গাঢ়তা আসে তা বাংলায় আনা কোনোমতেই সম্ভব নয়। বাংলায় আলাদা আলাদা করে সেই বিশেষণগুলিকে একের পর এক ছড়িয়ে দিয়ে তবে অর্থবোধ ঘটাতে হয়—সংহতির স্থান গ্রহণ করে এলিয়ে-পড়া বিস্তার। তৃতীয়ত সংস্কৃতের যুক্ত-ব্যঞ্জনের ধ্বনি-বৈচিত্র্য, গাম্ভীর্য, বৈষম্য (discord) ও সুষমা (concord) বাংলার ধ্বনিতে আনা একেবারেই দুঃসাধ্য ; যেমন আনা দুঃসাধ্য টিউটনিক গোষ্ঠীর ভাষায় ল্যাটিন গোষ্ঠীর ভাষার স্বরালুতা। উদাহরণ দেওয়া যায় দান্তের সেই বিখ্যাত পংক্তি 'E la sua volontate e nostra pace, যার ইংরেজী অনুবাদ হল In thy will is my peace। এখানে কিন্তু যে জিনিসটি লক্ষণীয় সেটি হল দুই ভাষার প্রাণকেন্দ্রের পার্থক্যহেতু তাদের মাধুর্যের প্রকৃতির পার্থক্য। ইংরেজীতে দান্তের পংক্তি অন্য প্রকারের ধ্বনি-সুষমা লাভ করেছে। তাই বাংলাভাষার প্রকৃতি যখন সংস্কৃতের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ধারণে অক্ষম তখন অনুবাদকের উচিত অবিকল রূপকল্পের নকল না করে বাংলাভাষার প্রকৃতির মধ্যে তাকে ধরবার চেষ্টা করা। সত্যেন দত্তের ৮ মাত্রাকে ৭ মাত্রায় আনার মধ্যে বুদ্ধদেব-বাবু বাংলাভাষার শব্দাবলীর স্বাভাবিক ত্রিমাত্রিকতা ও দ্বিমাত্রিকতাকে অচেতনেই মেনে নিয়েছেন ; সত্যেন দত্ত ৮ মাত্রা রেখে যে গাঢ়তা আনতে চেয়েছেন তা বুদ্ধদেববাবু অসাধ্য মনে করেন বলেই হয়তো। বাংলা শব্দের এই প্রবণতা, অনেক কাল আগেই প্রমথ চৌধুরী তাঁর সনেট শীর্বক প্রবন্ধে লক্ষ্য করেছেন। তবু বুদ্ধদেববাবু বলেছেন, 'যে কোনো অনুবাদেই আমি রূপকল্পগত সাদৃশ্যের পক্ষপাতী।' বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর, এমন কি একই গোষ্ঠীর, বিভিন্নভাষার মধ্যে, পার্থক্য সম্বন্ধে যিনি সচেতন তাঁর পক্ষে এ-কথা স্বীকার করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির হিন্দী অনুবাদের পরেও কি বুদ্ধদেববাবু এ-কথা বলবেন ? বরং রবীন্দ্রনাথ নিজে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদে যে পন্থা অনুসরণ করে অনেকখানি সার্থকতা অর্জন করেছিলেন সেই পন্থাই কি অনুসরণীয় নয় ? কথ্য বাংলায় যে রূপকল্পের একটুও আসবে না তা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে সত্যেন দত্ত সবাই বুঝেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ভালো করেই বুঝিয়েছিলেন। বুদ্ধদেববাবু যে সে কথা একেবারে বোঝেন না তা নয়। বোঝেন বলেই তিনি

কথ্য বাংলার সঙ্গে প্রচুর, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অতি সাধু বাংলাতেও অপ্রচল, বহু আভিধানিক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে এক অদ্ভুত গুরু-চণ্ডালী ঘটিয়েছেন। এ-কথা সবাই জানে যে গুরু আর চণ্ডাল দুটোই আপেক্ষিক শব্দ এবং যুগে যুগে গুরু আর চণ্ডালে মিশ্রণের রুচি ও রীতি পৃথক। যুগের রুচি ও রীতিকে রূঢ় আঘাত করলেই আমরা বলি গুরু-চণ্ডালী দোষ ঘটল। মহৎ সাহিত্যিক ভাষার রূপান্তর যেমন ঘটান তেমনি রুচিরও রূপান্তর ঘটান—অনেক প্রয়োগ তিনি করেন যা আগের যুগে অকল্পনীয় ছিল। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এর উদাহরণ। কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে যদি আভিধানিক ও কথ্য ভাষার এমন মিশ্রণ ঘটে যার কোনো নিদর্শন তৎকালীয় মৌলিক সাহিত্যে অপ্রাপণীয় তাহলে আমরা কি তাকে গুরু-চণ্ডালী বলব না? বুদ্ধদেব-বাবু কথ্য বাংলার প্রতি নাগর প্রেমের ফলে দুই নৌকোয় পা দিয়েছেন—কথ্য বাংলায় সংস্কৃতের ধ্বনির অপ্রাপ্যতা আবার অতি-সাধু শব্দে বাংলার চরিত্রহানি (বুদ্ধদেববাবুর মতে)—এই টানাপোড়েনে তিনি কথ্য আর আভিধানিকের দুষ্পাচ্য খিচুড়ি বানিয়েছেন। যেমন:

১। বপ্রকেলি করে শোভন গজরাজ আনত পর্বতগাত্রে
২। জানবে, অবিধবা, অম্বুবাহ আমি, তোমার দয়িতের বন্ধু
৩। সুহৃৎ-উপহৃত কান্ত-সমাচার অল্প ন্যূন মানে বধূরা
৪। নাসিকারন্ধ্রের মধুর বৃংহিতে গন্ধ নেয় তার হাতির পাল

কখনও বা আভিধানিক-কথ্য মিশ্রণ না হলেও এমন কথার সাযুজ্য ঘটেছে যা হাস্যোদ্রেক করে:

১। এবং মুকুলিত সদ্য ভুঁইচাপা জলার ধারে করে ভক্ষণ
২। উঁইয়ের ঢিবি থেকে বেরিয়ে এলো এই ইন্দ্রধনুকের টুকরো
৩। সদ্য কেটে-আনা দ্বিরদ-দন্তের গৌর আভা যায় তনুতে
৪। হৈম অম্ভোজ কত না ফুটে আছে, মৃণালে জলে বৈদুর্য

আর তৎসম বা আভিধানিক শব্দ যদি ব্যবহারই করলেন তাহলে 'ধূমজ্যোতিঃ সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ'-এর অনুবাদে মূলের ধ্বনির প্রতি কোনোই আনুগত্য না দেখিয়ে একেবারে বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুরের পর্যায়ে নেমে গেলেন কেন: "বাতাস, জল, ধোঁয়া এবং আলোকের কোথায় মেঘরূপী সমবায়?" অনেক ক্ষেত্রে আবার, কথ্যভাষা প্রয়োগের আগ্রহাতিশয্যে কিনা জানি না, অনুবাদের অর্থবোধই দুর্ঘট। "কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু'

হয়েছে "চেতনে-অচেতনে দ্বৈত অবলোপ, তাই তো কামুকের স্বাভাবিক ;" অথবা :

"অন্তঃসারং ঘন তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায়"

হয়েছে :

"বিফল হবে বায়ু তোমার পরাভবে, হে মেঘ, যদি হও সারবান,
কেবল পূর্ণতা দেয় যে গৌরব, লঘুতা রিক্তেরই আভরণ।"

অথবা

"বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণ-পর্ণেঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ॥"

হয়েছে "বেণীর মত ক্ষীণ জলের ধারা তার, তোমারই তাতে সৌভাগ্য" ইত্যাদি। এ সব ক্ষেত্রে সংস্কৃত মূলটি না জানলে অর্থোপপত্তি দুঃসাধ্য। আবার যখন পূর্বমেঘের ৬৪ সংখ্যক শ্লোকে কামচারীর বাংলা করা হয় "স্বৈরী" অথবা "কামার্তে"র বাংলা প্রতিরূপ দেওয়া হয় "কামুক", জেনেশুনে যে এগুলি শুধু ভুল নয়, মূলের অর্থ-বিঘাতী, তখনও কি অনুবাদকের যুক্তি হল তিনি, মূলের রচনাভঙ্গির পরিচয় দিতে চেয়েছেন? এ কেমন পরিচয় দিতে চাওয়া? অর্থের কথা ছেড়ে দিলে, রচনাভঙ্গি মানে যদি হয় (এবং তাই অনুবাদক বলতে চেয়েছেন) ধ্বনি-রূপ তাহলে বলব 'কামার্ত'-র আয়ত স্বরধ্বনির সঙ্গে কামুকের কোনো মিল তো নেইই, পরন্তু কামুক বলার ফলে যক্ষের চারিত্রিক গঠনের প্রতি মূলবিরোধী ইঙ্গিত করা হচ্ছে না কি? অবশ্য এই প্রকার ভুল বাংলা শব্দের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আরও উদ্ধার করা যায় এই অনুবাদ থেকে। যথা, 'কামুকত্ব' বাংলায় হয়েছে কামুক-বৃত্তি। আবার এমন শব্দের প্রযোগ হয়েছে যার বাংলায় কোনো অর্থই হয় না। সংস্কৃতে বেশ্যা অর্থে "বারমুখ্যা" শব্দের বাংলা প্রতিরূপ 'বারমুখী' বাঙালীর কানে একেবারেই অর্থহীন। এর ওপরেও আছে বাংলা ভাষার syntax বা পদপ্রয়োগ-ক্রমের যথেচ্ছ উল্লঙ্ঘন। অবশ্য কবিতায় গদ্যের syntax চলবে এই হাস্যকর ভ্রান্তির প্রশ্রয় আমরা দিচ্ছি না। কিন্তু এই ক্রমের উল্লঙ্ঘন যদি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে, শুধু অর্থবোধের অসুবিধাই ঘটে না, মনে হয় এ একেবারে অস্বাভাবিক, তখন এই রকম প্রয়োগকে বাংলা ভাষা-

বিরোধী বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। উদাহরণ দিচ্ছি, কৃত্রিমতার ক্রমবৃদ্ধি অনুসারে : । ১ । সন্ত শঙ্কায় পলায় বাতায়নে, ধোয়ার অনুকারে, শীর্ণ

(মূল : শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈ

ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণাঃ জর্জরা নিষ্পতন্তি)

এখানে 'শীর্ণ' পদটি যে সর্বনামের বিশেষণ সেটি আছে পূর্ববর্তী পংক্তির মাঝখানে।

। ২ । কোথায় ইন্দ্রিয়ে স্বপটু, সজ্ঞান প্রাণীর প্রাপণীয় সমাচার

(মূল : সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ)

এখানে ইন্দ্রিয়ে স্বপটু বাংলা ভাষায় অচল আর প্রাপণীয় ব্যাকরণানুগ প্রয়োগ হলেও ঐ রকম ণিজন্ত প্রয়োগ বাংলায় কি এখনও চলে? অথচ কিছুকাল আগে বুদ্ধদেব বসুই মধুসূদনকে পর্যন্ত বাংলা না জানার অপরাধে অপরাধী করেছিলেন।

। ৩ । চেতনে-অচেতনে দ্বৈত অবলোপ, তাই তো কামুকের স্বাভাবিক। মূলের প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু বলে দিলেও এই অনুবাদের প্রথম চারটি পদের অর্থবোধ হবে না। এরা কিম্ভূতকিমাকার।

। ৪ । স্রস্ত অঞ্চলে গঙ্গা নেমে আসে, ভূষিত উন্নত বিমানে,

এখানে মনে হচ্ছে চরণের দ্বিতীয় অংশটি বুঝি 'নেমে আসের' ক্রিয়াবিশেষণ এবং গঙ্গা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। মূলে কিন্তু ঐ শেষ তিনটি পদ 'অলকা'র বিশেষণ— যে অলকা অনুবাদে প্রথম চরণের প্রথমেই স্থান পেয়েছে আর এখানে উদ্ধৃত পংক্তিটি দ্বিতীয় চরণ।

কিন্তু এত স্বেচ্ছাচার সত্ত্বেও অনুবাদক মাত্রিক ছন্দকে তাঁর নিজের পরিকল্পিত রূপেও বাচাতে পারেননি ; কতকগুলিকে অপাঠ্য, কতকগুলিকে আয়াস-পাঠ্য, আরও কতকগুলিকে একেবারে নিশ্ছন্দ করে তুলেছেন। আবার উদাহরণ দিতে হয় :

১। বাধলো বাসা রামগিরিতে, তরুগণ স্নিগ্ধ ছায়া দেয় যেখানে

আমরা সত্যেন দত্তের 'চরণে পদ্ম-অতসী-অপরাজিতায় ভূষিত দেহ' স্বীকার করে নিয়েছি কিন্তু বুদ্ধদেববাবুর অনুবাদে রামের পরে যতিপাত অসহ্য।

২। তোমার মিলনের পুলকে থরে থরে মুঞ্জরিত হবে কদম্বেরা

অন্যান্য স্তবকের দ্বিতীয় চরণের শেষ পর্বে ৩ মাত্রা ব্যবহার করে এখানে হঠাৎ

৫ মাত্রা ব্যবহার করেছেন অনুবাদক। পড়তে না পারা গেলেও বৈচিত্রের খাতিরে এও বোধহয় সইতে হবে।

৩। বেণীর মত ক্ষীণ জলের ধারা তার, তোমারই তাতে সৌভাগ্য এখানে শেষ কথা সৌভাগ্যের সৌ-এর পরে যতিপাত।

৪। ব্যাপ্ত কোরো মণ্ডলের নিয়ে রূপ, সন্ধ্যাকিরণের জবায় রাঙা ; এই পংক্তিতে 'মণ্ডলের' মণ্-এর পরে যতি। এটি একেবারে অদ্ভুত।

৫। 'ধবল হরবৃষ শৃঙ্গ হেনে যেন উদ্‌ঘাটিত করে পঙ্ক' এখানে হিসাবমত পঙ্ক ত্রিমাত্রিক কিন্তু পাঠকের কানে পূর্ব চরণের স্মৃতির ফলে চতুর্মাত্রিকের আকাঙ্ক্ষা থাকায় ছন্দপতন ঘটেছে।

অতঃপর আলোচ্য বাংলা ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে অনুবাদকের একটি মৌলিক বক্তব্য। সে হল এবং; অতএব, কিন্তু, অথচ ইত্যাদি অব্যয়-শব্দের প্রয়োগ নিয়ে। অনুবাদক বলেছেন, "এদের দ্বারা বাক্যের বিভিন্ন অংশ পরস্পরে অন্বিষ্ট হয়, বাক্যসমূহের সম্বন্ধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, রচনাটিতে ঘনতার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।...... আমার বিশ্বাস এবং বাদ দিলে পংক্তি চারটি (পূর্ব মেঘের প্রথম শ্লোকের পংক্তিগুলি) শিথিলভাবে ঝুলে থাকবে, একটা নিবদ্ধ স্তবক বা শ্লোকের চেহারা পাবে না।" উপরের উদ্ধৃতিতে 'অন্বিষ্ট' পদটি বোধ হয় মুদ্রাকর প্রমাদ, পদটি হবে 'অন্বিত'। সে যাই হোক উল্লিখিত যুক্তিগুলি পড়ে কারও যদি মনে প্রশ্ন জাগে—রবীন্দ্রনাথ ঐ এবং, অথচ ইত্যাদি বাদ দিয়ে অত কবিতা লিখে গেলেন কি করে। তার উত্তরেও অনুবাদক বলেছেন যে আজকের যুগ হল গদ্যকবিতার (অর্থাৎ মুক্তছন্দের) যুগ, তাই রবীন্দ্রনাথের পদ্য-কবিতায় (গদ্য-কবিতার বিপরীতার্থক) যে সব অব্যয় চলে নি তা আজকের কবিতায় চলাই যুক্তিসঙ্গত। অতএব মেঘদূতের অনুবাদে অনুবাদক ঐগুলির বহুল প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু তিনি তো মেঘদূতের অনুবাদ গদ্যছন্দে করেন নি। সম-মাত্রিক না হলেও, প্রায়-নিয়মিত অসম-মাত্রিক ছন্দে করেছেন। অতএব তাঁর পূর্বের যুক্তি এখানে অচল। দ্বিতীয়ত বিধিবদ্ধ পদ্যেই যখন ভাষান্তর করা হল তখন রবীন্দ্রনাথের পন্থা পরিহার করার আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল না কি, কেন রবীন্দ্রনাথ ঐগুলি পরিহারের পথেই চলেছিলেন? প্রথমত 'এবং' অব্যয়টির প্রয়োগ চলতি বাংলায় এড়িয়েই যাওয়া হয়—বদলে 'আর' অব্যয়টির মাঝে মাঝে প্রয়োগ দেখা যায়। 'সুতরাং' 'অতএব'এর প্রয়োগ চলতি বাংলায় সচল তবে পারতপক্ষে কেউ 'তাই' ছেড়ে 'অতএব'-এ যেতে রাজী হয় না। সেই জন্যে, কথ্য বাংলার খাতিরেও 'এবং' আর

'অতএব'-এর অত বেশী প্রয়োগ কানে অস্বাভাবিক ঠেকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঐগুলিকে পাশ কাটিয়ে চলার আরও একটি যুক্তি রয়েছে এবং সেইটাই প্রধান। আলোচ্য অনুবাদক মনে করেন যে 'এবং' ইত্যাদির প্রয়োগে বাক্য ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। কি প্রকার ঘনত্ব? ঘনত্ব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল বস্তুপুঞ্জের মধ্যে অবকাশ বা ছেদের অভাব। একটি ভাব থেকে ভাবান্তরে উৎক্রান্তির ক্ষেত্রে মাধ্যমের প্রয়োজন যত কম হয় ভাব তত গাঢ় বা ঘন হয়। তেমনি ভাষার গাঢ়ত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা তখনি ঘটবে যখন 'এবং' 'অতএব' প্রভৃতি অন্বয়-সৌকর্য-সাধক অব্যয়, তথা আখ্যাত বা ক্রিয়ার অতিপ্রয়োগ বর্জিত হবে। সংস্কৃত ভাষার ঘনত্বের অন্যতম কারণ হল এই দুটি বর্জনের সুবিধা। 'এবং' দিয়ে দিয়ে কথা যোজনা করলে ভাষার দৃঢ়বাঁধন আলগা হয়ে কথাগুলি যেন পিনে আটকে থাকে। তাই অন্বয়ের সুবিধার জন্যে ঐগুলি প্রয়োগ করলে গাঢ়ত্বকে জলাঞ্জলি দিতেই হবে। মেঘদূত বা সংস্কৃত যে কোনো কাব্য বাংলায় অনুবাদের প্রথম অসুবিধাই হল সংস্কৃত ভাষার গঠনের গাঢ়ত্ব আর বাংলা ভাষার গঠনের শিথিলতা। বাংলার গঠন-তারল্য তাই সংস্কৃতের ঘনত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। একমাত্র এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যে (ছড়া বাদ দিয়ে) ওগুলির প্রয়োগে বিরত থেকেছেন। কল্পনা করুন প্রথম দিকের 'মেঘদূত' কবিতায় বা বলাকার 'বলাকা' নামক কবিতায় কিংবা 'শাজাহানে' 'এবং' আর 'অতএব'-এর ছড়াছড়ি।

বুঝি না বুদ্ধদেববাবু এই অদ্ভুত যুক্তি কোথা থেকে আবিষ্কার করে, নিজের কান এবং দীর্ঘ অভ্যাসে বিদগ্ধ রুচিকে পাশ কাটিয়ে, মেঘদূতের মত লিরিকের অনুবাদে, পূর্বাচার্যদের কৃতি অস্বীকার করে, ভাষার প্রাণের বিরোধী এই অব্যয় প্রয়োগে এত আগ্রহী কেন হয়ে উঠলেন? ওঁর মতে, পূর্বমেঘের প্রথম স্তবকের অনুবাদে, শেষ পংক্তিতে 'জলের ধারা যার জনকতনয়ার স্নানের স্মৃতি মেখে পুণ্য'-র চেয়ে 'এবং জলধারা জনকতনয়ার স্নানের স্মৃতি মেখে পুণ্য' অনেক বেশী শ্রুতিমধুর। 'এবং' প্রয়োগ যে পূর্বগামী তিনটি পংক্তির গীতধারাকে হঠাৎ ভেঙে দিয়ে শেষ পংক্তিটিকে একেবারে একা দাঁড় করিয়ে দিল—এ কথা যে কোনো সকর্ণ ব্যক্তির অনুভূতি-প্রমাণ।

সর্বাপেক্ষা হাস্যকর হয়েছে পূর্বমেঘের প্রথম স্তবকের অনুবাদে প্রথম পংক্তির প্রথমেই 'জনেক' শব্দ ব্যবহার করা এবং সেটির ব্যবহার যে কতখানি রুচি বা রসবোধ-সম্মত তাই বোঝাবার জন্যে ভূমিকায় কৈফিয়ত। 'জনেক' শব্দ প্রয়োগের

প্রস্তাব অনুবাদক যে পরিশীলিত-রুচি বন্ধুর কাছ থেকেই পেয়ে থাকুন, আসলে প্রয়োগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর নিজের। এই প্রয়োগের ফলাফলটি চিন্তা করা যাক :

প্রথমত 'জনেক' শব্দটি কথ্য বাংলার শব্দ নয় আবার তৎসমও নয়—তাই কথ্য বাংলা অথবা তৎসম কারও খাতিরেই ওকে ব্যবহার করা চলে না। কথাটি এসেছে সম্ভবত প্রাকৃত থেকে। তবে বাংলা কবিতায় এর প্রয়োগ আছে। তাহলে দাঁড়ায় এই যে 'জনেক' শব্দটি বাংলার poetic diction বা কাব্য-বাণীর অন্তর্ভুক্ত এবং বুদ্ধদেববাবু ওটির প্রয়োগ করেছেন কোনো বিশেষ উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে ; না হলে পদ্যে কথ্য বাংলা প্রয়োগের প্রবক্তা হয়ে তিনি একটি কাব্যিক শব্দ ঝপ্ ক'রে প্রয়োগ করে বসবেন কেন ? অনুবাদক ভূমিকায় বারে বারে বলেছেন যে অনুবাদে তিনি মূলের অবিকল রূপানুকরণের পক্ষপাতী। তাহলে কি 'জনেকের' মধ্যে কশ্চিৎ-এর ধ্বনিমূল্য তিনি কিছুটা পেয়েছেন ? অর্থ-মূল্যের কথা এখানে উঠছে না কেন না কশ্চিৎ-এর অন্য অনেক বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া যায়। এখানে প্রশ্ন হল 'জনেকের' নির্বাচনের বিশেষ কারণটি। 'কশ্চিৎ' কথাটি সংস্কৃততে দুটি গুরু ধ্বনিকে ধারণ করেছে, 'জনেকে' কিন্তু একটিও গুরুধ্বনি নেই। তারপর 'কশ্চিৎ'-এ যে উষ্ম-তালব্য যুক্ত বর্ণের ঘৃষ্ট আঘাত আছে 'জনেকে' তারও অভাব। বাংলার 'জনেক' একেবারে লতিয়ে-পড়া শব্দ কিন্তু কশ্চিৎ ঋজু এবং গুরু। কি কারণে 'জনেক' 'কশ্চিৎ'-এর রূপকল্প হবে তা বোঝা গেল না কিছুতেই। তাই আরও দুষ্কর হয়ে ওঠে বোঝা কেন এই প্রয়োগটি বুদ্ধদেববাবুর কাছে 'সুষ্ঠু' মনে হয়েছে। আমি যদি, জনেক ব্যবহার না করে, অনুবাদ করি, "সে এক যক্ষের কর্মে অবহেলা ঘটলো বলে শাপ দিলেন প্রভু" কিংবা যদি 'এক' বদলে 'কোন্' প্রয়োগ করি, তাহলে কি ক্ষতি হয় ? বরং 'সে এক' অনেক বেশী স্বাভাবিক বলেই মনে হবে। তবে জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই যেমন খুঁটিনাটিতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য মেনে নিতে হয় তেমনি সাহিত্যিক রুচির ক্ষেত্রেও না হয় মেনে নিলাম যে বুদ্ধদেববাবুর কানে 'জনেকের' বিশেষ মূল্য ধরা পড়েছে। কিন্তু রুচির এই একান্তভাব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এত সাড়ম্বর ঘোষণা কেন ?

॥ দুই ॥

কিন্তু বুদ্ধদেববাবু মেঘদূত অনুবাদ করলেন কেন ? গুনলে দেখা যাবে তাঁর এই গ্রন্থে মূলের চেয়ে, টীকার অংশ বেশি—টীকা অর্থে আমি মল্লিনাথ বা অভিনব-

গুপ্তের মত ব্যাখ্যামূলক টীকা বলছি না। সে ব্যাখ্যার জন্যে তো অনুবাদই রয়েছে। আমার বক্তব্য হল আমরা এখানে রূপকথার বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির সাক্ষাৎ পেয়েছি। পূর্বোত্তর মেঘের পুরো অনুবাদে লেগেছে ৫০ পৃষ্ঠা, আর ভূমিকায় ৭৫ পৃষ্ঠা। মনে হতে পারে এই তো স্বাভাবিক। দুরূহ, দেশ-দেশান্তরে এবং কাল-কালান্তরে আদৃত, সংস্কৃত সাহিত্যে এই একটিমাত্র লিরিক কবিতার বর্তমানকালে উপযুক্ত মূল্যবিচারের জন্য দীর্ঘ ভূমিকার আবশ্যক হতে পারে বৈকি। তাই কারো যদি মনে হয় যে তিনি ভূমিকাটি লিখবার একটি নিশ্ছিদ্র অছিলা পাবার জন্যেই অনুবাদটুকু জুড়ে দিয়েছেন, তাহলে সেটা আপাত দৃষ্টিতে অবিচার বলেই মনে হতে পারে। কারণ অনুবাদটুকু না জুড়ে কি তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতে পারতেন না? অনেকে বলবেন, পারতেন, কিন্তু চিরকাল ইংরেজী এবং অনুবাদে ফরাসী ও জর্মানসাহিত্যের চর্বণায় আনন্দ পেয়ে আজ হঠাৎ মেঘদূত সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে পাছে লোকে নানা কথা বলে এই জন্যে অনুবাদের ছাড়পত্রটি যোগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এখানেও তিনি প্রাপ্তাধিকার।

সত্যিই বুদ্ধদেববাবুর মনোভাব দুরবগাহ। তিনি কালিদাস এবং মেঘদূত সম্পর্কে তাঁর ভূমিকায় অবচ্ছোদাবচ্ছেদে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি করেছেন: (১) "যৌনতা ও ইন্দ্রিয়বিলাস ছেঁটে দিলে মেঘদূতের কঙ্কালমাত্র বাকী থাকে, আর কালিদাসের যা বাকী থাকে তা আর যাই হোক তাঁর চরিত্র নয়।" (২) ৺বিনয় সরকারের নামে চলতি কালিদাস-পরীবাদী একটি অভব্য শ্লোককে তিনি সঙ্গত মনে করেন: "ক-বোতল টানিলে মদ রঘুবংশম্ যায় গো লেখা?"+কালিদাস নাকি কবি হিসাবে 'বিনষ্ট।' (এখানে বিনষ্ট কথাটি বুদ্ধদেববাবু কি অর্থে ব্যবহার করেছেন তা তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। নিশ্চয়ই 'উচ্ছন্নে যাওয়া' অর্থে নয়। তাহলে কি sophisticated অর্থে? না blasé অর্থে?)+কালিদাসের কাব্য পড়ে তাঁর মনে হয়, "ভালো—সবই ভালো, কিন্তু কবিতা কোথায়?"+ মেঘদূত আমাদের ধরে রাখে 'শুধু শিল্পিতার চাতুরীতে'।+মেঘদূতের 'কবির সত্যিকার উৎসাহ যক্ষের বিরহের দিকে নয়, পরিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলীর দিকে।' অনুবাদকের মতে 'মানতেই হয়, মেঘদূতের যক্ষ একজন লিবিডোভারাতুর জীব, তার প্রেমের ধারণা শৃঙ্গার বাসনায় সীমাবদ্ধ। ...যক্ষ কামুকমাত্র।'+মেঘদূতে নাকি কালিদাস 'কামের বিশ্বরূপ' দেখিয়েছেন।

মেঘদূত এবং কালিদাস তথা সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে যাঁর এই ধারণা

তিনি কখনই শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুবাদ করতে পারেন নি। যে কাব্যের প্রতি তিনি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধাবান নন সে কাব্যের অনুবাদক্রিয়ায় সহানুভূতির অভাব থাকায় অনুবাদ বিফল হতে বাধ্য। বিফল যে হয়েছে তা আমরা আগেই দেখেছি এবং সে বিফলতার বীজ নিহিত আছে অনুবাদকের এই অশ্রদ্ধার মধ্যে। তিনি মেঘদূতকে ভালোবাসেন তার 'ছন্দ, ধ্বনি···গতিধর্ম (এবং) অভ্যন্তরিক নাটকীয় ক্রিয়ার জন্যে, আর কিছুর জন্য নয়। এবং এই 'আর কিছু' না থাকলে সত্যি-কারের কবিতা বা কাব্য হয় না—এই হল বুদ্ধদেববাবুর মত। সেই 'আর কিছু' মেঘদূতে আছে কি না বিশ্লেষণ করে দেখার আগে 'আর কিছু'টি কি তা বোঝার চেষ্টা করা দরকার। কেননা বুদ্ধদেববাবু এই ভূমিকায় প্রচুর তত্ত্বানুসন্ধান করেছেন এবং অনেক দুরূহ শব্দের সংজ্ঞা দিয়েছেন—যেমন রোম্যান্টিসিজম, কবিতা ইত্যাদি। অবশ্য এই সব শব্দের সংজ্ঞা আজকের দিনে বড় একটা কেউ দেন না কিন্তু বাংলা ভাষায় তত্ত্বানুলোচনার দৈন্য থাকায় আমরা এ সবই সহ্য করতে রাজী আছি, বিশেষ করে বুদ্ধদেববাবুর মত বিদগ্ধ (কিন্তু বিনষ্ট নন) ব্যক্তির কাছ থেকে।

ভূমিকার ষষ্ঠ এবং সপ্তম ভাগে বুদ্ধদেববাবু তাঁর তত্ত্বের সার পরিবেশন করেছেন। অতএব তাঁর ভাষাতেই তাঁর কথা উপস্থিত করা কর্তব্য: 'ক বোতল টানিলে মদ রঘুবংশম্ যায় গো লেখা?' অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কেউ জানি না, তবে প্রশ্নটিকে সংগত বলে মানতে পারি। (আমার মনে হয়, বিনয় সরকার মশায়ের নামে চলিত এই অভব্য উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের কাদম্বরী সমালোচনার মধ্যে একটি উক্তিকে প্রকরণচ্যুত করে তার শ্লীলতা হানির ফলে উদ্ভূত। সে উক্তিটি উদ্ধর্তব্য: 'কিন্তু এক কালের মধুলোভী যদি অন্যকাল হইতে মধুসংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন তবে নিজ কালের প্রাঙ্গণের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা পাইবেন না, অন্যকালের মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইবে। কাদম্বরী যিনি উপভোগ করিতে চান তাঁহাকে ভুলিতে হইবে যে, আপিসের বেলা হইয়াছে; মনে করিতে হইবে যে, তিনি বাক্যরসবিলাসী রাজ্যেশ্বর বিশেষ, রাজসভা মধ্যে সমাসীন···। এইরূপ রসচর্চায় রসিক পরিবৃত হইয়া থাকিলে লোকে প্রতি-দিনের সুখদুঃখ সমাকুল যুধ্যমান ঘর্ম-সিক্ত কর্মনিরত সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মাতাল যেরূপ আহার ভুলিয়া মদ্যপান করিতে থাকে, তাহারাও সেইরূপ জীবনের কঠিন অংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাবের তরল রসপানে বিহ্বল

হইয়া থাকে ; তখন সত্যের যাথাযথ্য ও পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, কেবল আদেশ হইতে থাকে, ঢালো ঢালো, আরও ঢালো)। সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণ সরিয়ে দিলে যা বাকী থাকে, সেই অভিজাত, বিধিবদ্ধ ও পরিশীলিত কাব্য-সাহিত্যে কোথায় সেই প্রেরণার স্থান, যাকে মানুষ চিরকাল প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ বলে মেনেছে, একমাত্র যার প্রভাবে ভাষা হয়ে ওঠে দৈববাণী, সার্থক হয় বিদ্যা, প্রযত্ন, পরিশ্রম ?···কবি—তিনি কখনো অবিকল সামাজিক বা স্বভাবী মানুষ হতে পারেন না—তাঁকে হতে হবে কোনো না কোনো দিক থেকে অভাবগ্রস্ত।···তবু ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন অধ্যায় দেখা যায়, যখন কবির সঙ্গে তাঁর পরিবেশের সামঞ্জস্য ঘটে, তিনি তাঁর শাশ্বত অশান্তি ভুলে যান, রাজসভার পার্শ্ববর্তী একটি বিদগ্ধ গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত হয়ে রচনা দ্বারা সেই গোষ্ঠীরই প্রীতি সাধন করেন। সংস্কৃতে যাকে কাব্য বলে···তার সুবিস্তৃত প্রসাধন শিল্প ব্যবহৃত হয় শুধু একটি ভঙ্গির সেবায়—যে ভঙ্গিকে নির্দিষ্ট ও নিয়মাবদ্ধ করে তোলাই সমগ্র অলংকার সাহিত্যের অভিপ্রায়।···কবিতা কোন গুণে ভালো হয় ? বা কবিতা হয় ?···সেই যুক্তিহীনতা, যার সংক্রামে ভাষা হয়ে ওঠে ভাবনার দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা, কবিতা মুক্তি পায়।···কবিতার ভাষায় আমরা খুঁজি প্রভাব, যা তার ব্যাকরণ-নির্দিষ্ট অর্থকে অতিক্রম করে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে, যার বেগে আমাদের মনের অনেক স্বপ্ন, স্মৃতি, চিন্তা ও অনুষঙ্গের যেন ঘুম ভেঙে যায়, ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি অনবরত প্রচুত হতে থাকে।······ কিন্তু যাঁরা বলেন, কবিতার ভাষা কিভাবে কাজ করে, সে-বিষয়ে আধুনিক ধারণার পূর্বাভাস ধ্বনিবাদে পাওয়া যায়, তাঁদের কথায় আমার মন কোনো রকমেই সায় দেয় না। ধ্বনির বিখ্যাত উদাহরণ—লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী—এতে আমরা দেখতে পাই, মহৎ কবিতার নমুনা নয়, এক চারু ও সুকুমার বক্রোক্তি, যা তার ছন্দোবদ্ধতার গুণে উদ্ধৃতিযোগ্য হয়েছে।······কিন্তু এর অভিপ্রায় বর্ণনা মাত্র, যার আড়ালে আর কিছু নেই······। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার একটি গান—

> শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে
> অতলজলের আহ্বান।
> মন রয় না রয় না রয় না ঘরে,
> চঞ্চল প্রাণ ॥

এরও বিষয় বসন্ত, বা যৌবন, বা কামোন্মাদনা, কিন্তু এতে বর্ণনা নেই, বসন্ত,

যৌবন বা তার সম্পৃক্ত কোনো তথ্য উল্লিখিত হয় নি, কিন্তু যৌবনের বেগ অনেক বেশি তীব্রতার সঙ্গে সঞ্চালিত হয়েছে। এখানে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা যেভাবে পাওয়া যাচ্ছে, ব্যাঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির ব্যাখ্যাতাদের তা ধারণার মধ্যে ছিল না।……এই ইঙ্গিতের বিচ্ছুরণ, যাকে বিভিন্ন পাঠক ভিন্ন ভাবনায় রঞ্জিত করে দেখবেন, কবিতার কাছে এটাই আমার প্রধান প্রার্থনা।……কিন্তু রহস্য বা যে-কোনো প্রকার অস্পষ্টতা—সংস্কৃত কবিতার বিরোধী; তার লক্ষণা বা ব্যাঙ্গ্যার্থেও নিশ্চয়তা চাই।…… হস্তে লীলাকমলমলকে ইত্যাদি শ্লোক শ্রুতিমোহন ও দৃষ্টিনন্দন, এবং সেই কারণেই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু এতে যা বলা আছে তা সবই প্রত্যাশিত ও সম্ভবপর, বিস্ময়ের আঘাত নেই এতে, নেই মূর্ত ও অমূর্তের কোনো সম্বন্ধ স্থাপন, যার ফলে কবিতা শুধু অধিকৃত হবার বিষয় থাকে না আর, আবিষ্কৃত হবার দাবি জানায়।……কবিতার আত্মা বলতে আমরা যা বুঝি, যা যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরোধী, বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ ফল বলেই বুদ্ধির অতীত, যাকে আর তৌল করা যায় না শুধু ধ্যান করা যায়—সেই গুণটি খুঁজে পাই না যেন এর মধ্যে, সব এর আক্ষরিক, ব্যাকরণিক ও নির্ভুল, বোধগম্য ও বিশ্লেষণযোগ্য। ……আশাতীতের নিরন্তর প্রত্যাশা—এই হল রোমান্টিক আর্টের সারাৎসার। আশাতীত মানে আজগুবি নয়, ইচ্ছাপূরণকারী দিবাস্বপ্ন নয়; আশাতীত মানে সেইসব গোপন সম্বন্ধ যা সাধারণ বুদ্ধির ধারণার মধ্যে আসে না, কিন্তু কবির কাছে যার সম্ভবপরতা অনিবার্য। রোন্টিকতার দাবি এই যে কবিতা হবে সন্ধানধর্মী, আবিষ্কারপ্রবণ; এইভাবে দেখলে রোমান্টিকতা শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন আর থাকে না; তা হয়ে ওঠে সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের একটি চিরকালীন ধারা, যার লক্ষণ আমরা বাল্মীকি বা দান্তের মত ধ্রুপদী কবিতেও দেখতে পাই, কিন্তু কালিদাসের ন্যায়ধর্মী মানস যাকে দৃপ্তভাবে অস্বীকার করে।"

বিরক্তিকর বা আতিশয্য মনে হলেও এই উদ্ধৃতিকে সংক্ষেপ করা যেত না কেননা বুদ্ধদেববাবুকে নিজের মত নিজে প্রকাশ করার অধিকার না দিলে, তাঁর মত অন্যের ভাষায় বিকৃতরূপে উপস্থাপিত হবার অভিযোগ অসতে পারত। উপরের উদ্ধৃতিতে একথার সন্দেহাতীত, তর্কাতীত, প্রমাণ পাওয়া গেল যে, বুদ্ধদেববাবু রোমান্টিক কবিতাকেই খাঁটি বা আসল কবিতা বলতে চান, অন্য সব তাঁর কাছে সুভাষিত মাত্র। অবশ্য তিনি ভার্জিল, হোরেস, কি ওবিদকে কবি বলবেন কিনা সে তাঁরই বিবেচ্য কারণ এঁরা নিঃসন্দেহে ক্লাসিক কবি, রোমান্টিক নন। তবে তিনি শিলারের মতের আপাত অনুসরণে কবিদের

Naive এবং Sentimental দুই দলে ভাগ করে, পরে আবার Goethe-র classic এবং romantic বিভাগ যে শিলারীয় বিভাগেরই নামান্তর তাও স্বীকার করে নিয়েছেন; এবং তার পরে আবার বিস্ময়কর পার্শ্বপরিবর্তন করে বাল্মীকি এবং হোমারকে Naive-ও বলেছেন, romantic-ও বলেছেন। অবশ্য বাল্মীকি কি হোমারে খাঁটি কবিতা নেই একথা বলতে না পেরেই তিনি তাঁদের বাধ্য হয়ে রোমান্টিক বলেছেন কিনা তাও ভাববার বিষয়। এ এক অদ্ভুত উভয়-সঙ্কটে পড়েছেন তিনি। রোম্যান্টিক না হলে কবিতা হবে না আবার যাঁরা সাধারণত রোম্যান্টিক বলে আখ্যাত নন তাঁদের মধ্যেও মহত্তর কবিরা রয়েছেন—এমন কবি রয়েছেন যাদের চেয়ে মহত্তর কবি তথাকথিত রোম্যান্টিকদের মধ্যে জন্মান নি—এ সমস্যার সমাধান হয় কি করে? অতএব সব সার্থক কবির মধ্যেই কোনো না কোনো ছাঁদের রোম্যান্টিকতার আবিষ্কার করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। এই মতবাদেরই অনুসিদ্ধান্ত হল এই যে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে (শুধু কালিদাসই বুদ্ধদেববাবুর বিবেচ্য নন, তাঁর বিবেচ্য তাবৎ সংস্কৃত সাহিত্য) খাঁটি কবিতা বিশেষ নেই, যা আছে তা কৃত্রিম ও বাহ্যিক সৌন্দর্যে মনোহরণ করে। অবশ্য বাল্মীকি, ব্যাস, বেদাদি এবং উপনিষৎকে বোধ হয় তিনি রেহাই দেবেন এই অভিযোগ থেকে।

রোম্যান্টিসিজম্ কি এ নিয়ে বহু সংজ্ঞা বহু মনীষী দিয়েছেন এবং এই সংজ্ঞা প্রাচুর্যের থেকে আমরা প্রাকৃত জনেরা এইটুকুই বুঝি যে ঐ সমস্ত ধারণার (যেমন classic, romantic, mystic, realistic, naturalistic এমন কি love পর্যন্ত) সম্পূর্ণ, অতি-ব্যাপ্তি এবং অব্যাপ্তিবর্জিত, সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সব সংজ্ঞাগুলিই আংশিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে আমাদের আলোচনার এবং বোধের পক্ষে মূল্যবান। তাছাড়া যে কোনো ধারণারই (Concept) আবির্ভাবের উষায় এবং তারও কিছু পর পর্যন্ত সংজ্ঞা স্থিরীকরণ নিয়ে যে মতদ্বৈধ বা মতবাহুল্য দেখা যায় তা অবশ্যম্ভাবী এবং ধারণাটির জনমানসে আসন পাবার জন্যে প্রয়োজন। তার পরেও যে আলোচনা চলে তা ঐ ধারণাটির রূপবৈচিত্র্য এবং ব্যতিক্রম ইত্যাদি নিয়ে এবং সে আলোচনার শেষ নেই কেননা কোনো ধারণাই স্থাণু এবং অপরিবর্তনীয় নয়। যুগে যুগে একটি ধারণা বিবর্তিত হতে হতে চলে। আমাদের আলোচনা সেই বিবর্তনেরই ইতিহাস রচনা করে। এই যেমন ধরুন Nature কথাটি। Shakespeare তাঁর নাটককে প্রকৃতির আয়না বলেছেন; আবার

Pope ও Nature এর দোহাই দিয়ে Boilaeu-কেই গুরু বলে মেনেছেন ; আবার Wordsworth ও ছিলেন Nature-এর পূজারী। এই সব Nature কি এক ? তেমনি রোম্যাণ্টিসিজম নিয়ে বহু জনের বহু মতের মধ্যে বুদ্ধদেব বাবুর ও একটা মত আছে। তা থাকুক। কেউ তা নিয়ে কোনো তর্ক তোলার অধিকারী নয়। তাঁর মতে তাঁরই অধিকার। কিন্তু এই বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রোম্যাণ্টিসিজমের একটি সংজ্ঞা দিয়ে সেইটিকেই সকলকে গ্রহণ করতে বলা এবং সেই ভাবানুসারী না হলেই কবিতার কৌলীন্যহানি ঘটল বলে প্রচারে নেমে তাবৎ ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যকে বাতিল করা—এটা কোন জাতীয় শুচিবায়ু এবং রুচি সঙ্কীর্ণতা ?

শুধু রোমাণ্টিক কবিতাকেই কৌলীন্য দান করে অন্য জাতের সব কবিতাকে অপাংক্তেয় করার কারণ হিসেবে বুদ্ধদেববাবু বলতে চেয়েছেন যে, যে কবিতা রোম্যাণ্টিক নয় সে কবিতা বাচ্যার্থের মধ্যেই শেষ, সে কবিতা ভাষার অতিরিক্ত কোনো লোকে পাঠককে নিয়ে গিয়ে তার মনের সুপ্ত, অর্ধ-সুপ্ত, বহু বৃত্তি বা ভাবের উদ্বোধন ঘটায় না—এক কথায় মনকে সৃষ্টিশীল করে তোলেনা, মনকে নাড়া দেয়না। মেঘদূতের ভাষা পরিশীলিত, বিদগ্ধ ; বক্তব্য সুপ্রকাশিত ; ভঙ্গী মনোহর ; কিন্তু তারপর আর কিছু নেই। অনেকে হয়ত ভেবে বিস্মিত হবেন যে, তাহলে, কি বুদ্ধদেববাবু বলতে চান, কালিদাসের কাব্যে 'ধ্বনি' বা ব্যাঙ্গ্যার্থ নেই। আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের ধ্বনিবাদ কি তাহলে বিনা কালিদাসেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ? সে সম্পর্কেও বুদ্ধদেববাবু সাফ বলে দিয়েছেন যে ও ধ্বনিবাদ আর তিনি যে suggestiveness বা ইঙ্গিতবাদের কথা বলছেন তা এক নয়। লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী বা মধুর্দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে (দুটিই কুমারসম্ভবের শ্লোক) এগুলি সবই 'সুকুমার বক্রোক্তি' বা শুধুই বর্ণনা। 'এতে যা বলা আছে তা সবই প্রত্যাশিত ও সম্ভবপর, বিস্ময়ের আঘাত নেই, নেই মূর্ত ও অমূর্তের কোনো সম্বন্ধস্থাপন।' কিন্তু এই রকম বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে ত King Lear এ storm scene বা Macbeth এ sleep-walking scene বা মৃত Codeliaকে দেখে Lear এর নিরাভরণ উক্তি' 'Never, never, never, never, never,' একেবারেই Suggestion-বিহীন বলে মনে হবে। কোনো মহাকাব্যের বা দীর্ঘ লিরিকের (যেমন মেঘদূত) আবেদন বিচারে সূত্রপ্রকরণহীন পংক্তি তুলে ধরে বিশ্লেষণ করলে পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। কেন না ধ্বনি-বাদীরা তিনপ্রকার ধ্বনি স্বীকার করেন : বস্তুধ্বনি, অলঙ্কার ধ্বনি এবং রসধ্বনি। এদের

মধ্যে নিঃসন্দেহে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু একটি দীর্ঘ রচনার প্রতিটি শ্লোকই রসধ্বনি-ময় হতে পারে না—বস্তু বা অলঙ্কার ধ্বনি-ময় শ্লোক-ও এই সব দীর্ঘ বা অতি দীর্ঘ কাব্যে প্রচুর থাকাই স্বাভাবিক, এমন কি ধ্বনি-হীন, ধ্বনিবাদীদের মতে, চিত্রকাব্য-ও থাকতে পারে; শেষ পর্যন্ত যে কাব্য গুণীভূতব্যঙ্গ্য, তাও থাকতে পারে। কিন্তু সব মিলিয়ে যে কাব্য রসধ্বনির উদ্রেক করে, এবং সম্যগ্-দৃষ্টিবানের অনুভূতিতে যখন একটি কাব্যের সমস্ত খণ্ডই রসধ্বনিতে পর্যবসিত হয় তখনই সে কাব্য হয় মহৎ কাব্য। শেক্সপীয়রের এমন নাটক নেই যার মধ্যে অ-কাব্যিক বা অ-নাট্যিক পংক্তি নেই; তাঁর অনেক সনেটেই যত্ন অর্থাৎ effort সুপরিস্ফুট; মিলটনের Paradise Lost-এর কত অংশ আমরা দ্বিতীয়বার পাঠের সময় বাদ দিই; দান্তের Paradisoর কতখানি Infernoর মত ভালো লাগে? অতএব বুদ্ধদেবাবু যদি কুমার কি রঘুর প্রতি পংক্তিতে ছোট ছোট লিরিকসুলভ রসধ্বনির উল্লাস চান তাহলে আমরা নাচার। আবার একথাও ঠিক যে বিশেষ করে কলিদাসের এমন সব শ্লোক রয়েছে যেগুলি বিচ্ছিন্নভাবেই রসোল্লাসী, মনকে শুধু ভরে দেয় না, মন একেবারে টন টন করে ওঠে।

কয়েকটি উদাহরণ দিই:

।১। হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্যঃ
চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥ [কুমার ৩]

এখানে চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস কি ঐ উপমাটুকুতেই শেষ হয়ে গেল?

।২। কিংবা একটি পংক্তি, উমা শিবনিন্দুক ছদ্মবেশী শিবকে বলছেন,

মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃস্থিতং

এর সঙ্গে কি তুলনীয় নয় চণ্ডীদাস কি জ্ঞানদাসের যে কোনো রসঘন পদ?

।৩। এইবারে যেটি উদ্ধার করছি তার মূলভাব শৃঙ্গার নয়, যদিও শৃঙ্গার সেখানে ব্যভিচারী:

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
নরেন্দ্র মার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ॥ [রঘু, ৬]

স্বয়ংবর সভায় ইন্দুমতী একে একে যখন সমবেত পাণিপ্রার্থী রাজাদের প্রত্যাখ্যান করে গেলেন তখন তাঁদের মুখগুলি দেখাল অপস্রিয়মান দীপশিখায় ক্রমান্ধকারাচ্ছন্ন রাজপথবর্তী সৌধসমূহের মত। এ চিত্র কি চিত্রেই শেষ?

বুদ্ধদেববাবু Inferno থেকে যে উপমাটি উদ্ধার করেছেন আমি সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি এখানে। উপরের কালিদাস এবং Infernoর Dante-এর কোনোটিকেই ধ্বনি-ন্যূন মনে হবেনা. বরং কারও কারও কাছে কালিদাসকেই বেশী ধ্বনিভূয়িষ্ঠ বলে মনে হবে।

আগন্তুক Virgil আর Danteকে নরকের ছায়াশরীরীরা দূর থেকে দেখছে :

Hurrying close to the bank, a troop of shades
Met us, who eyed us much as passers by
Eye one another when the daylight fades.

*   *

To dusk and a new moon is in the sky.
And knitting up their brows they squinnied at us
Like an old tailor at a needle's eye.

বুদ্ধদেববাবু শুধু শেষের দুটি পংক্তি উদ্ধার কারছেন, কিন্তু প্রথম উপমাটি কারও কারও কাছে আরও ধ্বনিময় বলে মনে হলে বলবার কিছু নেই এবং ঐ আগেরটিতে আলো-আঁধারির কথা থাকায় কালিদাসের পূর্বোক্ত উপমাটির সঙ্গে ক্ষীণ সাদৃশ্য অর্জন করেছে। সে যাই হোক, ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভায় রাজাদের মুখের অবস্থার বর্ণনায় কালিদাস যা বলেছেন তার চেয়ে দান্তের এই দুটি উপমা কোন বিচারে বেশী মনোহারী বা বেশী suggestive? ছায়াশরীরীদের বুড়ো দরজির সঙ্গে তুলনার ফলে, ঐ প্রেতদের দীনতা, বিরক্তি, নিষ্কৌতূহল যান্ত্রিকতা ইত্যাদি প্রকাশ পেতে পারে কিন্তু বুড়ো দরজি ঐ প্রেতদেরকে আমাদের বড় কাছাকাছির মানুষ ক'রে তোলে না কি? তাদের অদ্ভুতত্ব কি একটু কমে না এই তুলনায়? অন্যপক্ষে কালিদাসের তুলনাটিতে আশা ও নিরাশার, উল্লাস ও হতাশার, পূর্তি ও ব্যর্থতার একটি সমগ্র চিত্র ধরা পড়েছে. তার ওপর প্রশস্ত রাজপথে একটি একটি বাড়ি ক্ষণেকে আলোকিত আবার পরক্ষণেই ম্লান এবং তার পরেই নিরালোক হবার এই চিত্রে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব এবং পরিণাম-ব্যর্থতার ইঙ্গিতে কি তীব্র বাঙ্ময়তা অর্জন করেছে!

খণ্ডাংশের এই ধ্বনিময়তার প্রশ্ন থেকে সমগ্র রচনার প্রশ্নে গেলে দেখা যাবে যে, প্রতীচ্যের রসপিপাসু, শেলী, গ্যেটে, ম্যাক্সমুলার, এমন কি হোরেস হেম্যান উইলসনকে ছেড়ে দিলেও, ভারতবর্ষের আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ রসজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতে যে ব্যঞ্জনায় মুগ্ধ হয়েছেন বুদ্ধদেববাবু সে-ব্যঞ্জনার লেশমাত্র খুঁজে পান নি—তিনি শুধু যৌনবিলাস বাদ দিয়ে একখানি কঙ্কালমাত্র পেয়েছেন।

বুদ্ধদেব বাবুর মতে মেঘদূত সুললিত বাক্যমাত্র 'মেঘদূত অর্থহীন নয়, কিন্তু তার যে সব শ্লোক আমরা স্মরণীয় বলে স্বীকার করি, অনেক সময় তাদের অর্থ অতি সাধারণ—এমন কি তুচ্ছ। তুচ্ছকে গম্ভীরভাবে প্রকাশ করলে, ফল সাধারণতঃ হাস্যকর বা হাস্যজনক হয়; কিন্তু মেঘদূতে উল্টোটা দেখতে পাই।' বুদ্ধদেব বাবুর হাসি না পাওয়াতে কালিদাস এ যাত্রা রক্ষা পেলেন কিন্তু এই একান্ত তুচ্ছ সামগ্রী কি রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত কবিতার উৎস! এই তুচ্ছতার প্রভাবে কি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন; "কবির কল্যাণে এখন সেই অতীতকাল অমর সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে পরিণত হইয়াছে; আমরা আমাদের বিরহবিচ্ছিন্ন এই বর্তমান মর্তলোক হইতে সেখানে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করিয়াছি। কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে।······যদি তোমার কাছ হইতে একটা দক্ষিণের হাওয়া আমার কাছে আসিয়া পৌঁছে তবে সে আমার বহু ভাগ্য, তাহার অধিক এই বিরহলোকে কেহই আশা করিতে পারেন না।

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিসলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীর-স্রুতি সুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি॥

(বুদ্ধদেববাবু এটিকেও হয়ত তুচ্ছ ভাব বলবেন)

এই চিরবিরহের কথা উল্লেখ করিয়া কবি গাহিয়াছেন:

দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

আমরা প্রত্যেকে নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর মুখে চাহিয়া আছি।···কিন্তু এ কথা মনে হয়, আমরা যেন কোন এক কালে একত্র এক মানস লোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন, 'তোমায় হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।'····· আমরা হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে মেঘদূতের ব্যাচ্যার্থ উপর্যুক্ত ব্যাঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি বহন করেছে—ভাষার অন্তপারে চিরন্তন বিরহলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে।

একেই বলে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের রসধ্বনি—এই ধ্বনিরই সংজ্ঞা দিয়েছেন আনন্দবর্ধন :

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুৎ সর্জনীকৃতস্বার্থৌ।

ব্যঙক্তঃ কাব্যবিশেষঃ সে ধ্বনিরিতি সুরিভিঃ কথিতঃ [ধ্বন্যালোক]

রবীন্দ্রনাথের কাছে মেঘদূত বাক্যের অতিরিক্ত এই যে ধ্বনি ব্যঞ্জিত করেছিল, রবীন্দ্রনাথের ন' বছর আগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ম'শায়ের কাছেও তাই করেছিল। তিনি এ কাব্যে যৌন-বিলাস মাত্র দেখেননি, দেখেছিলেন সত্যিকারের বিরহ-কাতরতার আস্বাদ্যমান গভীর রসরূপ। তাঁর সরল ভাষাতেই বলি, "যে দৌত্যের জন্য এত আড়ম্বর, যে দৌত্যের জন্য জগতের সমস্ত সৌন্দর্যের সংগ্রহ, যে দৌত্যের জন্য নর্মদার দক্ষিণ হইতে মেঘকে অলকায় প্রেরণ, সে দৌত্যের প্রধান কথা এই—তুমি কেমন আছ ?

"তুমি কেমন আছ ? একথা আমরা যখন তখন যার তার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিয়া থাকি। সুতরাং এ কথাটিতে অনেক পাঠক কোন নূতনত্ব দেখিবেন না। কিন্তু যে প্রণয়ী, যে কখনও পরের জন্য ভাবিয়াছে, পরের সহিত বিচ্ছেদ সময়ে যাহার হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়িয়াছে, সেই জানে তুমি কেমন আছ ?—এই কথার মর্ম কত গভীর। যক্ষ কতবার ভাবিয়াছে সে বুঝি নাই ; কতবার ভাবিয়াছে, এক বৎসরের দারুণ বিরহে সে কোমল কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়াছে। তাই সে আজ—তুমি কেমন আছ ?—জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।" ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন উইলসন সাহেব : We have few specimens either in classical or in modern poetry of a more genuine tenderness or delicate feeling. কিন্তু বুদ্ধদেববাবু দেখেন পরিশীলিত যৌনবিলাস আর বুঝতেই পারেন না কেন মোটে এক বছরের বিচ্ছেদে যক্ষ এত আর্ত হয়ে উঠেছে।

আসল কথা আরও গভীর। বুদ্ধদেববাবুর অভিযোগ এই নয় যে কালিদাসে 'ধ্বনি' বা suggestiveness নেই। তা হয়ত আছে কিন্তু তিনি কি ধরণের ধ্বনি থাকলে কবিতাকে কবিতা বলবেন ? তিনি স্পষ্ট ভাষণ করেছেন : "ক্লাসিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হ'ল দুর্বোধ্যতার অভাব। অন্য শব্দের অভাবে দুর্বোধ্যতা লিখলাম ; যে গুণটি আমি বোঝাতে চাচ্ছি, ইংরেজি obscure শব্দের আক্ষরিক অর্থে তার ইঙ্গিত আছে। কবিতার কাছে আমাদের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা এই যে তার একটি অংশ হবে অন্ধকার—obscure

—যাকে আমরা কখনও বুঝে উঠতে পারবো না বলেই যাতে আমাদের আনন্দ কখনো নিঃশেষ হবে না। এবং আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন সেই কবিরাই যাঁরা কোনো-না-কোনো অর্থে বিদ্রোহী—যাঁদের তালিকা দীর্ঘ ও ও বহুযুগব্যাপী ; এবং যাঁদের মধ্যে আছেন শেক্সপীয়র, ব্লেক, হেল্ডার্লিন, বোদলেয়ার, রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটস্-এর মতো আপাত-প্রাঞ্জল কবিগণ।" লক্ষণীয় যে এই নামের তালিকায় হোমার, ভার্জিল, বাল্মিকী, দান্তে ইত্যাদির নাম নেই। কারণ তাঁরা বোধ হয় যথেষ্ট obscure নয়। মহৎ কাব্যের রসাস্বাদ আমাদের কেবলই করতে ইচ্ছা হয় এবং বারংবার পাঠে আমাদের কাছে নূতন-নূতনতর অর্থ উল্লসিত হ'য়ে ওঠে, একথা সবাই জানেন। সেই অর্থে কোনো মহৎ কবিতাকেই আমরা কখনও সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারি না। সেই অর্থে কালিদাসও চিরনূতন, দান্তেও চিরনূতন। দান্তের নিম্নলিখিত লাইনে না বোঝার কিছু নেই—বুদ্ধি দিয়ে বোঝা অর্থে—কিন্তু এই পংক্তির আবেদনের কি শেষ আছে এই পৃথিবীর মানুষের কাছে ?

Lay down all hope, you that go in by me.

তাই obscurity-কে আবেদনের নিঃসীমতা অর্থে নিলে বুদ্ধদেববাবুর কথা স্বপক্ষঘাতী। আর obscurityর অর্থ যদি হয় বিরল allusion, personal associations, symbols, তা'হলে সে কথা হ'ল, Imagist, Symbolistদের সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীগত মত—যে Symbolistদের আদি গুরু Baudelaire এবং Poe। সেইজন্যেই কি বোদলেয়ারের বিকার এবং অশ্লীলতা বুদ্ধদেববাবুর এত প্রিয় ? তা না হ'লে তিনি রোম্যান্টিক বলতে একবারও Shelley, Wordsworth, Keats, Pushkin কি Lermontov-এর নাম করেন না, এমন কি Swinburne-এও তাঁর এখন আর মন ওঠে না (আগে উঠত)। তিনি রোমান্টিকতা বলতে বোঝেন Baudelaier-এর জীবনবিকারের উদ্গার [তাঁর একমাত্র বিখ্যাত গ্রন্থ 'লে ফ্লার দ্যু মাল' এইজন্যেই খ্যাতিলাভ করেছিল] —যাঁর সম্বন্ধে তদ্দেশীয় বিখ্যাত সমালোচক ফেদিনাঁ ব্রুনতিয়ের অশ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন ("His fame) is entirely posthumous. Even the Fleurs du Mal would have attracted scarcely any attention—had it not been for the dubious popularity they acquired, owing to the judicial proceedings of which they were the object. But his death in 1867 having recalled attention to him, and removed the scruples many persons would have felt in professing themselves his admirers or disciples during his life time,—it is from this date

that he exerted,—and that he still exerts a real, and in the main a three fold influence. He realised that *morbid* poetry, which had been the dream of Saint-Beuve's earlier years, and the principle of which is pride in suffering from some unusual or anomalous disease. In this way he discovered and gave expression to certain phenomena whose morbid character is to some extent atoned for by the keenness of the sensations they procure, and also by the very brutality of the words to which recourse must be had to express them. Finally, by his efforts to express these phenomena, he inaugurated contemporary symbolism, if this symbolism consists essentially in a confused mixture of mysticism and sensuality. The question, however, arises in connection with these innovations as to how far their author was sincere ; and whether an entire school of writers has not been the dupe of a dangerous mystifier" এই বিশ্লেষণ ক্রনতিয়ের করেছিলেন ১৮৯৮ সালে ; আর ১৯৫৬ সালেও J. M. Cohen তাঁর The History of Western Literature গ্রন্থে ঐ একই মত প্রকাশ করেছেন আধুনিক মনোবিকলনবাদের ভাষায় : Posing as a victim of the contemporary malaise, he displayed the melancholy, *the perversity*, the striving for genuine emotion of a man naturally religious, but lacking religious belief. Love offered him nothing but sensual excitement, ending—if not beginning, in disgust. The loved one had long since ceased to stand for the poet as an intermediary between the common and the divine vision, rather she represented the chief torturess of a hell from which there was no escape. Sex was for Baudelaire evil in itself......In his technique, however, he was less original for his line is essentially Racinean······In his aristocratic pose, his dandyism, he cut a figure that appealed to the decadents of the century's end who praise him for his Satanism." এ হেন কবিকে বুদ্ধদেব বাবু মহৎ কবির আসনই শুধু দেন না, শেক্সপীয়র এবং রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে এক নিশ্বাসেই তাঁর নাম উচ্চারণ করেন। রবীন্দ্রনাথের মত সুস্থ-চেতনার কবির একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত হল বোদলেয়ারের মানস-সংস্থান। আর কবিকৃতির দিক দিয়ে সাধারণ উচ্চ আসনও, এক তাঁর সমগোত্রীয়েরা ছাড়া আর কেউ, তাঁকে দেন না। তাঁকেই যখন বুদ্ধদেববাবু আধুনিক কবিকৃতির কাষ্ঠা গতি হিসেবে দেখেছেন তখন কালিদাসে যে তিনি কিছু পাবেন না এ তাঁর আগেই বোঝা উচিত ছিল।

বসন্তের বিস্ময়

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কাল সন্ধ্যায়
বসন্তের সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল।
গতানুগতিক আমাদের নিয়ে
দশটা-পাঁচটার পথ, কেমন টাল খেয়ে পড়েছিল
চৌমাথায়। কাল সন্ধ্যায়—
ছায়াদের অন্যমনস্কতায়
অনেক আলোর অবলুপ্তি

কোন পথ-আগলানো দেহাতি-বাকে
পলাশের অগোছাল ছায়া।
কাল সারারাত
আমার অস্তিত্বের ওপর উপুড় হয়ে
দক্ষিণ সমুদ্র ঢেউ ভেঙেছে।
বসন্তের বিস্ময়ে
তারই নামের ওপর
আমি সারা রাত কেপেছি
আর কেপেছি।

নিমন্ত্রণে

শিবশম্ভু পাল

ওরা শুধু সম্মিলিত মানসিকতায়
ময়লা বস্তির গলি ক্লান্তিকর পাঠ্য কোন পুথির মতন
ফেলে রেখে হাওয়া খেতে এল।
খোলা হাওয়া; খোশগল্প, প্রক্ষিপ্ত গানের শব্দ যারা
সুস্থতা, উন্নতি, ভালো প্রভৃতির উজ্জ্বল ধারণা;
সেখানে ছড়ানো আছে অঢেল, যে কেউ
যথেচ্ছ চয়ন করে নিতে পারে, ওরাও নিয়েছে।

প্রমোদ-উদ্যানে এলে এই হয়। বিশেষত যদি
মালঞ্চের কৃতী মালাকর
ওদেরি পরম বন্ধু আত্মার গভীর কাছে সমর্পিত থেকে
ডেকে যায় উল্লাসের যথাযথ আয়োজন করে
তবে ওরা সম্মিলিত মানসিকতায়
পোষাকে উজ্জ্বল সেজে খুশি হবে; খুশি হবে বন্ধু তার
বিবাহের সাজানো বাসরে।

আলো, রং, সুশ্রী মুখ, সুগন্ধ বাতাসে
জলবায়ু অনুকূল সবখানে অনুভব করে
একসঙ্গে ওরা বলে, 'আজ রাত্রে বাড়ি ফিরব না।'

এক ইলিশ স্বপ্ন দেখেছিল সূর্যের

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

কোন এক ইলিশ স্বপ্ন দেখেছিল সূর্যের
উজ্জ্বল নীল রেখার আঘাতে নীল জল দ্বিখণ্ডিত করতে করতে
সে অনন্ত সূর্যের স্বপ্ন দেখেছিল।

চারি পাশে জল আর জল আর জল
স্বজাতি বিজাতিদের দল
দুর্বল সবল শত্রু মিত্র কত প্রতিবেশী
গাছ ঘাস শেওলার ভিড়
সূর্য অনেক দূর।

তাই একদিন সেই ইলিশ
ঘর ছাড়িয়ে
জ্ঞাতিদের চোখ এড়িয়ে
শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে
কখন জল
কখন ডুবো পাহাড়
কখনও বা গাছ ঘাস শেওলার ভিড়ের ভেতর দিয়ে
সোজা চলে আসতে চাইল
যেখানে সূর্য একান্ত অধিকারে আদর করছিল ঢেউগুলোকে
নিজের উত্তাপ দিয়ে
যদিও সফল হল না তার সেই কামনা।

সেই ইলিশ আবার একদিন
এসে গেল সূর্যের অঙ্গনে
রুপোর মতো ঝকঝকে তার গায়ে
দূর অরণ্যের নীলের মতো তার পিঠে
কালো চোখে
ঠোঁটে মুখে বুকে
ঢেউ খেলে গেল সূর্যের

তবুও সে ইলিশের দেহে জাগল না সাড়া

স্থিতির বিলোপে

রজত চৌধুরী

ভোর হলেই এরা নাগালের বাইরে চলে যায়
আর আমি দেখি নক্ষত্রের দিকে কালের বিস্মৃতি
কালের দিকে নক্ষত্রের।
আকাশে নিস্পন্দ যাত্রা—পেতল পেটানোর আওয়াজ
যারা যাবার, তারা চলে গেছে।
ঝোপে আর ছেঁড়া ছেঁড়া মাঠে সামনে মৃত যুদ্ধক্ষেত্র
: আমি ফিরে চলেছি প্রবহমানের দিকে—
কালপুরুষের দিকে অন্ধকারের ধ্রুব জিজ্ঞাসা—

ভোর হলেই এরা হারিয়ে গেছে।

তবু আমাদের ভালোবাসার শেষ কথাগুলো অনুত্তীর্ণ থেকে যায়
আমি ফিরে চলেছি রহস্যের দিকে
জাগ্রত স্বপ্ন থেকে মৃত্যুর দিকে
জন্মের স্থিরতা থেকে যৌবনের উচ্ছলতায়
পৃথিবীর নিশ্চিত ঘর থেকে গ্রহান্তরের হারিয়ে যাওয়া শূন্যে।

রাত ভোর আমি চেয়েছিলাম
আমার সামনে তোমার অনন্ত বিস্মৃতি
চোখে তোমার বহুদূরের গানগল্পের জড়িমা
অগণ্য আলোকরাশির নিঃশব্দ, দৃশ্যাতীত যাত্রার মতো
তুমি আমার হৃদয়ের কাছে এসেছিলে,
অস্তিত্বের দুই পৃথক সত্তায় তুমি আমি খুব স্পষ্ট ছিলাম।
আজ ভোর হলেই আমরা হারিয়ে গেছি।

কাল রাতে গ্রামগঞ্জ দিক সাত সমুদ্রের সব কল্পনা ভ্রান্ত ছিল
ভ্রান্ত ছিল তোমার ঢেউ নাচানো বুকে নিবদ্ধ আমার দৃষ্টি
আর দৃষ্টির অতীত, অনুভবের অতীত অন্যসব ভাবনাগুলো।
আমাদের জিজ্ঞাসার স্তরে স্তরে
কাল আমরা যে আলোড়নের কথা ভাবছিলাম
আমাদের সেই সৃষ্টি আর বেদনা, আর গানহীন হৃদয়ের অব্যক্ত আলাপ
এমনি আরো অনেক বিচিত্র উপলব্ধি
আজ ভোর হতেই মিলিয়ে গেল!

আমাদের ভালোবাসার কলি
আজ ভোরেই ফুল হয়ে ফুটে গেছে।

হাতি-শিকার

সাধন ভট্টাচার্য

মা ডাকেন, নেবেন না কিছু একটা—বটি দা-টা?

না, কাজ নেই, ও তো শুধু উপড়ে আনা মাত্র। দেখে আসি হাসিদের ছাড়া-বাড়িটায় একটু।

পেছন ফিরে আবার বলেন, এমনি হাতে-টাতে লাগলে তো কুটকুট না, কিছু না—না কাটলে। নাঃ, নেই এখানে কি কামরাঙা গাছের ওদিকটায়, জংলী আনারস-ঝোপের কাছে পিঠে। কলাগাছগুলোর এদিকে তো আগে অনেক গাছ ছিল, মজে গেছে বুঝি। যে একটা গাছ আছে নেহাত বাচ্চা, মূলই হয়নি এখনও। না, কই, এদিকেও তো না। আচ্ছা, ওদিক গিয়ে খোঁজ করলে হয় না করমচা গাছটার পেছনে আরও বড় ছাড়াবাড়িটায়?

না, না, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়।

কিন্তু এদিকটায় পাতিপাতি করে খুঁজেও কি মিলেছে কিছু ছাই?

আর শেষ পর্যন্ত হরিতকী গাছের তলা দিয়ে করমচা গাছের পেছনেই পা দিতে পারল নির্মলা। সাতপুরুষের ভিটে—এ ভিটের মান রাখতে পেরেছে নির্মলা? নিত্যির ঠাকুরকে পর্যন্ত ফেলে পালিয়ে যেতে পেরেছে ওরা। হ্যাঁ, শান্তির জন্যে, নিশ্চিন্তির জন্যে বৈকি! আজ সেখানে পা দেবার সাহস কোথায়। তবু তো কতকাল পরে আসা শুধু শূন্য-ভিটেটুকু দূর থেকে বুক ভরে দেখা আর ঠাকুরের কাছে মাথা কুটে খাওয়ার জন্যে। ঠাকুর যে তাকে দয়া করে না, টেনে নেয় না কাছে।

ওখানে তো শুধু কান্না আর কান্না। তিষ্ঠোতে না পেরেই বুঝি শেষে নিবারণ বলে, ঘুরে এস না-হয় বাড়ি থেকে, মনের ভার যদি কাটে একটু।

পোড়া-মরণ নেই—মনের ভার আর কাটে! ভিটেটা দেখে বুক হুহু করে ওঠে। নির্মলা তবু পা দিতে পারল এখানে। বিশুর ফরমাস যে। ভোরে উঠেই আজ বলেছে, খুড়ীমা, আপনার শাকটা, হ্যাঁ, আজই রাঁধুন। ওটা রাঁধতে কেউ পারে না, মা-ও না।

হ্যাঁ, ভালোমন্দ তো খাওয়াতে পারলাম না কিছু, আর পারবও না কোনদিন। বিষকচুর শাকটাই দিয়ে যাই তোদের পাতে পাতে।

বুঝি এইমাত্র একটু হাসিতে ধুয়ে দিতে চেষ্টা করল নির্মলা এই কদিনের গুমোট ভাবটা। সেদিন সন্ধ্যায় এখানে এসে পৌঁছনো অবধি শরীর অস্থির-অস্থির হওয়া, চুপচাপ থাকা কি এটা-সেটা কাজ করার ফাঁকে বিশুর মা'র সঙ্গে অল্পসল্প কাঁপাকাঁপা কথাবার্তা।

কাঁটালগাছে ঝুঁকে-পড়া সজনে গাছটা, ইস—তলায় কত সজনে পড়ে আছে। শুকনো, আধা-পাকা কি কচি। এক-আধটা কাঁচাও। বুঝি তলায়ই পড়ে থাকে আর পচে বছরের পর বছর।

উঠোনের উত্তর-মাথায় কুল-গাছটার এ দশা করল কে ডালপালা কেটে। আহঃ, ফুল আসছে গাছটার। বুঝি ওই বাড়িরই কেউ, আর কাটবেই বা না কেন। শূন্য ভিটে খাঁ খাঁ—এখন তো ওদের স্বরাজ। কি একগলা জঙ্গল হয়ে গেছে এদিকটায়—এর রান্নাঘরের যায়গাটিতে সেই বনতুলসী-ঝোপের মতো কি বিচ্ছিরি। না, না, আর না, বেশি দেখে অনর্থক কষ্ট পাওয়া কেন। কচু গাছটা তুলে নিলে, ওদিকে কত কাজ।

নির্মলার হাসি পায় অনেকদিন আগে যেদিন বিশু বলেছিল, সর্বনাশ, বিষকচু শাক! ফেলে দিন খুড়ীমা—এক্ষুনি ফেলে দিন। বিষ বিষ, ও খেলে গলা বুক পেট ফুলে দগদগে ঘা হয়ে যাবে যে!

বিষ না তো কি! ওই সব ছাইপাশ রান্না এখন অসহ্য লাগে। বিশু ছেলেমানুষ, উৎসাহটা হয়তো ওর রুচি-বদলের। কিন্তু নির্মলার নিজের যে আর ধৈর্য নেই। এমনি দিনে-রাতে তো আছেই, তার ওপর বিষ-রান্না! আর যা পেরেত-কেত্তন—কনুইয়ের কিছুটা নিচ অবধি দুহাতে বেশ করে সরষের তেল মাখা, তার ওপর ন্যাকড়া প্যাঁচানো, কচুটা দুফলা করে কেটে নারকেল কুরুনিতে আস্তে আস্তে সাবধানে কুরনো—কষটা হাতে না লাগে, তারপর তো রান্না।

আসশ্যাওড়া গাছগুলোর পেছনে বাসক-ঝোপের এদিকটায় বেশ ডাগর একটা কচুগাছ, টান দিয়েই চমকে ওঠে নির্মলা।

বাসক-ঝোপের আড়ালে ধক করে জ্বলে উঠল কি ওটা! এক জোড়া ধারালো চোখ না! চেনা চেনা!

ম্যাউ—ম্যাউ-উ

রাগত একটা স্বর। বাসক-ঝোপের আড়ালে চকিতে মিলিয়ে যায় চোখ দুটো। চিনতে ভুল হয় না। আবুর মিনিটা। ধবধবে শাদা রঙটা একটু বিবর্ণ হয়েছে মাত্র, একটু কালচে ছাই-ছাই মতো।

হাতে কচুগাছটা নিয়ে নির্মলা চেয়ে থাকে। বাসক-ঝোপে আসশ্যাওড়া ঝোপে অনেকটা দূর অবধি একটা বাঁকা রেখায় কয়েকটা গাছ আস্তে আস্তে নড়ে। আবুকে সঙ্গে না দেখে বুঝি রাগ, তাই রাগত স্বর! আহ্, শত্তুর রে!

পায়ে পায়ে ঘুরছে মিনিটা, লেজ ঘষছে বারবার, বুঝি টের পেয়েছে কিছু।

রাত এখনও কিছু আছে থাক, পোঁটলাপৈটলিগুলো বাঁধাছাদা হয়ে গেছে। অন্ধকার একটু কাটুক। ঘুম কি আসে সারারাত, পুববাড়ির বুড়ো কুকুরটা চেঁচিয়ে হয়রান। গন্ধ পায় বুঝি নানান রকম ভয়ের, দূর গ্রামের অশান্তির খবরের। কিন্তু ওরা যে চুপচাপ—বিশুর বাবা-মা তাঁরা। তলে তলে অন্য বন্দোবস্ত আছে নিশ্চয়, নির্মলাদের মতো খালি হাত না তো। পেটের কথা কি কেউ বলে। এই দেখ না কামিনী মালী, উপীন কুমার, রাজু নাথ—ঘর খালি সকলের। আশ্চর্য মালুর মা, দিব্যি ভালো মানুষ, ধারেধুরে না কিচ্ছু আর সকাল বেলায় তালা ঝুলছে দরজায়।

আবুটা কাঁদছে, গোটা কয়েক চড় কষিয়ে দিয়েছে নির্মলা। মানুষের মরার সময় নেই—অমন রাতে বায়না ধরছে মিনিটাকে সঙ্গে নেবার।

ম্যাউ, ম্যাউ, ম্যাউ-উ—ডাকডাকি শুরু করেছে, অস্থির হয়ে উঠেছে মিনিটার জন্যে কষ্ট হয়, উপোস থাকবে ওটা। আরও একজন উপোস থাকবে ঠাকুর ঘরে! —নিত্যির ঠাকুর মহাদেব! ঠাকুর যদি উপোস থাকেন! সে যে সাংঘাতিক, কিন্তু তা কেন হবে! পাড়ার কিছু লোক তো এখনো আছে, থাকবে—বিশুর মা-বাবা ওঁরাও আছেন। রোজ ফুলজল কি একটু পড়বে না? একটা ব্যবস্থা ঠাকুর করবেন না! নিশ্চয়ই করবেন। মিনিটার জন্যেই কষ্ট, অবশ্য বিশুর মা-কে বলে গেছে নির্মলা পাতের ভাত মাছের কাঁটা কটা ডেকে দিতে।

কিন্তু আবুটা কি করছে অন্ধকারে ওদিকে।

আরে হারামজাদা, বস্তায় ভরে নিবি ওটাকে! ইদিকে জনমনিষ্যির হদিশ নেই, তিন-চার দিনের মানুষ নাকি ঠাসাঠাসি পচছে বর্ডারে পোঁটালাপঁটলি নিয়ে।

বস্তাটা ফেলে একটু ছুটে গিয়ে আটা অন্ধকারে হেসে উঠল।

ওমা, কি হাসির ছিরি, হাসতে হাসতে পার হয়ে গেল মাঠ, গ্রামঘর, হাঁটুজল তিতাস গাঙ। জংশন স্টেশন ছাড়িয়ে সীমান্তের ওপারে ছোট্ট রাজধানী শহরের পিঠে লোক ঠাসাঠাসি ক্যাম্পবাড়ি—কলেরায় উজাড় হবার জো ক্যাম্পবাড়ি।

এক ক্যাম্প ছেড়ে আর একটা, তারপরও আর একটা, সবচেয়ে পাহাড়ী নদীর বাকে টিলার ওপর নতুন মাটির গন্ধে ছন-মূলিবাঁশের ছোট্ট ঘর, বেড়া দেওয়া একটু উঠোন, একপাশে কয়েকটা বেল আর দুপুরে চণ্ডীফুলের গাছ, দক্ষিণ দিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে লুঙায় ধানক্ষেতে। . .

বেড়ার পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে পা টিপে সাবধানে উঁকি মারে আবু ঘরের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে নির্মলার গলা খনখন করে বেজে ওঠে, এসেছেন! এস, বস পিঁড়িখানায়, আগে ধান-দুব্বো দিয়ে নি ; হারামজাদা, যম নেই তোমার! রাজ্যি টঁড়ে টঁড়ে ইনি এখন এসে চুপচাপ। ইদিকে সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে, দোকান থেকে নুন আনাব চার পয়সার, তা কত ডাকাডাকি, খোঁজাখুঁজি।

শহরের বাজার থেকে পানু এখনও ফিরছে না, অন্ধকার হয়ে গেছে কতক্ষণ।

এটা বিধবা মেয়ে মনোর ঘর। রান্নাবান্না সেরে দরজা ভেজিয়ে মা মেয়ের ঘরে এসেছে, সঙ্গে আবু। বাশের মাচার এদিকে লক্ষ্মীর আসন, সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া ধোয়ামোছা ফটোটি। কাল লক্ষ্মীর ব্রত, তিথি সকাল সকাল, এখানে এসে এই প্রথম পুজো-আচ্চা।

মা, ঠাকুরের ভোগ তুমিই করো কাল, মেয়ে বলে। আর, বাবাকে বলে রেখেছ তো আর কারও বাড়ি না খায় আগে।

নাতনী কাদু বলে, ঠানদি, সোজা না—মেটে-কলসীর কাছটি থেকে আলপনা আঁকব, কুটিমামা বলে কিনা উঠোনের ওদিক থেকে আঁকতে, দূর—

আচ্ছা, কি যেন একটা মোচড় দিয়ে উঠল না ওপরের চালে! একটু একটু দুলছে না ঘরটা, যেন ঠেলে দিচ্ছে কেউ ; নাকি মাথা ঘুরছে নির্মলার। কিন্তু চালের বাশটা মট মট করে উঠল যে, ভেঙে গেল নাকি।

ঠানদি, ঠানদি, ভূমিকম্প, চিৎকার করে ওঠে কাদু, না, না, কালো ওটা কি বাইরে ঠানদি—মা, ও মাগো—

মা এবং ছেলে, মেয়ে আর নাতিনাতনী জড়াজড়ি করে কাঁপে, মুহূর্ত মাত্র। তারপর রেড়ির তেলের প্রদীপের ঠাণ্ডা আলোয় একা লক্ষ্মীঠাকরুণকে ফেলে ছায়াগুলো কোথায় পিছলে পড়ে বাইরে। মাছ-মাংস নয়, নিতান্ত নিরামিষ শাক-লতাপাতাভোজী কৃষ্ণবর্ণের জীবটির নরম শুঁড়ে লাফিয়ে উঠল না পাশের বাড়ির বিয়ের বুগ্যি মেয়ে কমলা! চাপা একটা চিৎকার মোটা কাঁঠাল গাছটায় আছাড় খেয়ে মিলিয়ে গেল বুঝি!

আবু, নাতনী কাদু, নাতি লারু আর বিধবা মেয়ে মনোকে পেছনে ফেলে কোথায় একা ছুটছে।

বন-তুলসী ঝোপ—ধানক্ষেত, তারপর জলের নালিটা, আহ্, কি হয়েছে নির্মলার, উঠতে পারছে না! মুখে মাথায় কি জলের মতো, নোনতা নোনতা। পিছনে কি তেড়ে আসছে ওটা, মিশ-কালো রংয়ের উঁচু-ঢিবি মতো ওই যে! ওঃ—

টিলাটার সুড়িপথ দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ডান পাটা কোথায় সরে গেল, আর লতাপাতা কাঁটা ঝোপের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়তে পড়তে অবশেষে কোথায় ঘুমিয়ে পড়ল নির্মলা? —এ কোথায় পড়েছে, রান্নাঘরের ওপর ঝুঁকে-পড়া বাতাবি গাছটার তলায়? আহ্—

কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলে দেখে বাতাবি গাছটা নেই, আর এসব কি—চারপাশে এত লোকজন, চেঁচামিচি, ছুটোছুটি! আবার ঘুমে ঢলে পড়ছে নির্মলা—কিন্তু বাতাবি গাছটা?

আজ কতদিন পর পিপাসার সেই বাতাবি গাছটা! ইচ্ছে হলেই গাছটি ছোঁয়া যায়, কি আঁকশিতে কচি বাতাবি কটা পাড়া যায়।

কিন্তু হাত জোড়া যে। ফেন গালছে বুঝি নির্মলা ভাতের! কতদিন পর বড় ছেলে সমু এসেছে, স্নান সেরে উঠোনে গল্প করছে কার সঙ্গে।

খেতে বসেছে সমু। শহরে থেকে ছেলে এই ক দিনেই শুকিয়ে গেছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে নির্মলা।

ইস, কি হয়েছে তোর আঙুলে, লাল-লাল কি ওগুলো? চামড়া উঠে যাচ্ছে?

ও কিছু নয় মা, বার্নিশ—ছাতার বাঁটে রঙ দিতে হয় সেই রঙ, প্রথম প্রথম এমনি হয় এক-আধটু। পরে সেরে যায়।

নির্মলার যেন ভালো লাগে না, শ্বাস পড়ে।

বলে, মাইনে পাবি কবে রে?

আবার বলে, মাইনে পেয়ে সওয়া-পাঁচ-আনা পয়সা দিস তো আমায় মানত আছে আমার মহাদেবের কাছে। না, না, তোর বাপের হাতে দিস না যেন, বুঝলি?

কিন্তু কথায় কথায় সেদিন ওর বাবার খড়ম নিয়ে মারতে আসার কথা বলতে গেল কেন নির্মলা। ছিঃ, ছিঃ, কি বিশ্রী চুপচাপ হয়ে গেল ছেলেটা ভাতে-মুখে!

মাঝ উঠোনে ছায়া পড়েছে, এখনও খোঁজ নেই অমুটার।

ঢোলের আওয়াজটা শোনা যায় কাছেই।

আরে ও হারামজাদা, গেলি কোথায় রে নিশত্তুরে! সারাদিন ঢোল বাজিয়ে দিন কাটবে রে তোর মুখপোড়া! বুঝলি সমু, ওটার ব্যবস্থা কর তো একটা। হ্যাঁ, ওই যে এলেন নবাব, নাক দিয়ে ঝরছে একদলা। দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমার বাড়ি বাড়ি টো টো করে বেড়ানো।

বুক ফুলিয়ে নির্মলার হাতের কঞ্চির নাগালের মধ্যে এসে আবার দে ছুট, কি সাহস অমুর!

একটা বিষকচুগাছ তুলে নিতে কত দেরি হয়ে গেল। বিশুর মা ওরা না-জানি কি ভাবছে। ছিঃ, আর দেরি করবে না নির্মলা। অপলক দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে থেকে কি লাভ!

হলুদ গাছের পাতাটা নড়ছে।

দক্ষিণ ভিটের নিচে এগুলি বিলিতিধনে শাক না?

মা, ধনেপাতা বাটায় কাঁচা লঙ্কা দিয়ো কটা।

কয়েকটা পাতা তুলে এনেছে আবু ধনে-শাকের।

হুঁ, জিভ আছে ইদিকে ষোলো আনা। পড়াশুনোর কথা বলি তো তালা পড়ে মুখে। হবে না! দেখ্-দেখা কর্ম, শিখ্-শিখা ধর্ম। যেমন বাপ, ছেলে তো তেমনি হবে। বেশি হবে কোত্থেকে। বাপের যে আক্কেল—

দ্যাখো মা, বাবাকে বকবে না কিন্তু।

কি, ন বছরের একরত্তি ছেলের মুখেও ভয় দেখানো! একটা কঞ্চি নিয়ে পেছন পেছন দৌড়োয় ছেলের, মুখে কাপড় দিয়েও হাসি চেপে রাখতে পারছে না নির্মলা।

ডালিম গাছটিতে একেবারে মগডালে ফুল এসেছে একটি—বড় বেশি লাল।

গুঁড়ির কাছে ডানপাশে মাছ জিয়োনো কলসিটা এখনও আছে ঠিক নিজের জায়গাটিতে। কবে একবার বাড়ি ফিরে ঘরের মানুষটার চোখে জল দেখেই কলসিটার ওপর পড়ে গিয়েছিল নির্মলা। ভর-অমাবস্যার স্বপ্ন কি মিছে হয়। জ্বর-জারি কি তলপেটে ফিক দিয়ে ওঠা ব্যথার গল্প তো ফাঁকি। আসলে

শিয়রে ওঁৎ পেতে আছে কে, হ্যাঁ, কুতকুতে দুটো কুটিল চোখ, উঁচু টিবি মতো সেই জন্তুটাই বুঝি। তারপর কি হয়ে গেল—সমুর মতো যার মুখ-চোখে হাসি। বাপের বাড়ি থেকে একটু দেরি করে ফিরলে সমু তার মাকেও এসে দেখতে পারে না কেন গা? কি দোষ তার? আর দুই-আড়াই মাস পরে যদি সমুও পালাতে চায়!

উঠোনের কোণে কুলগাছের এদিকে ময়লা কাঁথা-বালিশে বেশি চোখ-বোজা কি চোখ-খোলা দু-তিন মাস কি দু-তিন-চার বছরের কটা বাচ্চা না? আর এ কি করছে নির্মলা পাশে বসে, বোকার মতো কপাল থাবড়ানো কি চুলছেঁড়া!

শেষ পর্যন্ত কোথায় ওদের একা ফেলে চলে এসেছে নির্মলা!

আবার একা ফেলে এসেছে নির্মলা বনতুলসীর ক্ষেতে বড় মেয়ে মনু আর ছোট ছেলে আবুকে, সর্বনাশ! সর্বনাশ!

একটা বিষকচু তুলে নিতে আর কত দেরি? এবার নির্মলা কয়েক পা এগিয়ে আসে।

আচ্ছা, বিলিতি ধনেশাক কটা মাটিশুদ্ধ তুলে নিলে কেমন হয়? টিনার নতুন মাটিতে লাফিয়ে উঠবে নধর কচিপাতা। বড় ভালবাসে পানু। বাটা খেতে, চালকুমড়োর তরকারিতে কি গুঁড়োমাছের ঝালেঝোলে কি চমৎকার গন্ধ হয় কটা পাতায়! না, না, কার জন্যে নিয়ে যাওয়া। নিজের জন্যে? নিজের জন্যে? নিজের খাবার ইচ্ছে হলে, খেতে পারলে খুব বেচে যেত নির্মলা। ওবে পানু! না, না, শত্রু, শত্রু ওরা, নির্মলার বাড়া-ভাতে ছাই দিতে কখন আবার তৈরি হয়ে আছে ওটা!

কি দেখছেন খুড়ীমা এতক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে?

পেছনে কখন বিশু এসে দাঁড়িয়েছে।

না, বেড়াল একটা, ঠিক আমাদের মিনিটার মতো দেখতে, পালিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, আপনাদের মিনিটাই ওটা। আপনারা চলে যাবার পর দিন-কয়েক ছিল আমাদের বাড়িতে, পুবের ঘরটায়। মা বললেন, বেশ হয়েছে, বেড়ালটা যা শিকারী—এবার ইঁদুরের উৎপাত কমবে কিছু। কিন্তু বাচ্চা দিয়ে তিন-চার দিন মাত্র, তারপর যে বেরিয়ে এল, আর ফিরল না। আর আশ্চর্য, ওটা অন্য কোথাও যায় না। বেশি রাতে কি ভোর-রাতে যেতে আসতে ইদিকে ওদিকে অনেকদিন দেখেছি। ভাত-মাছ দিয়ে মাঝে মাঝে ডেকেও দেখেছি—না, কিচ্ছু না।

সাত দিন পর আজ বিশুর মার সঙ্গে এসে ঘাটে বাসন মাজছে নির্মলা।

বোনদি, বোনদি না ! কবে এলেন গো—

যুগীপাড়ার মনার মা কাছে ঘেঁসে আসে।

কি ডাকাতি গো আপনার, জোড়াবলি। ভাবলাম হিন্দুস্থানে আছেন, না সুখ—কপাল গো, কপাল। ডাকের কথা আছে না একটা—

চুপ, চুপ, চোখে ইশারা টানে বিশুর মা। শেষে ওপরে এসে একটু আড়ালে বলে, ভরপেটে এক্ষুণি বুঝি কাঁদাতে চাও, সারাদিনে খেয়ে এসেছেন মাত্তর। আর সময় পেলে না, কি তোমাদের আক্কেল !

জলের দিকে চেয়ে আছে নির্মলা, মুখটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে ঢেউয়ে।

কখন বেলা পড়ে আসে। উঠোনের কোণে বাশের জাকায় ঝিঙে ফুলগুলি ফুটতে আরম্ভ করে। আরও পরে কটা তারা ওঠে। তখন আহ্নিক করতে বসে কোষাকুষি নিয়ে মুশকিলে পড়ে নির্মলা। কোষাটি বুঝি কানা, জল থাকে না। বিশুর বাবার খাওয়া শেষ হয়েছে। রান্নাঘরে গোল হয়ে খেতে বসেছে সবাই—বিশু, মা, ভাই বোনেরা, নির্মলা। খেতে খেতে কি একটা গল্প নিয়ে মত্ত বিশু আর ভাইদুটো।

একটা মাঝারি প্রায়-ভর্তি বাটি এগিয়ে দিয়ে বিশুর মা বলে, মাংসটুকুন আপনার পানুর মা। না, না—বেশি বললে আমি শুনব না।

আহ্নিক করার সময় মাংসের চমৎকার একটা গন্ধ পেয়েছিল নির্মলা, কতকাল মাংস খায় না সে।

বিশুর মা বলে, কি রক্ত ছিল গো হাঁস দুটোর !

সারারাত গেল, বন-তুলসীর ক্ষেতে এখনও মুখ গুঁজে আছে মনু আর আবুটা ! কাঁটা ফুটবার ভয়ে নাকি কাঁটাগাছের নিচে যায় না—মোটা থামের মতো সে পা-দুটোর নরম তুলতুলে পাতার চাপে তেমন কিছুই তো হয়নি, তবে ? পেট ফেটে যায়নি, দুধরঙা ইয়া লম্বা দাঁত-দুটোতে বুক পেট এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেওয়া কিংবা শুঁড়ে তুলে কাঁঠালগাছে আছড়ানোও নয়, চামড়া ফুঁড়ে সাদা তেল বা অঢেল রক্তও নয়, কেবল মনুর পিঠে এক-বিঘৎটুকু যায়গা ইঞ্চিখানেক বসে যাওয়া, আবুর নাক দিয়ে একটা শুকনো রক্তের ধারা ছাড়া !

একটা আর্তকণ্ঠ ভেঙে যায়, কি করেছেন বিশুর মা, সর্বনাশ—মাংস না, মাংস না।

সে কি, মাংস খান না নাকি, আগে তো খেতেন দেখেছি—মন্ত্র নেবার পরেও।

হ্যাঁ, তা খেতাম, খেতাম, হ্যাঁ-না—কিন্তু আজ নয়, শরীরটা আজ ভালো না বিশুর মা।

দুচোখ দুচোখে স্তব্ধ হয়ে থাকে। একটু পরে বলে, আপনাকে কষ্ট দিলাম পান্নুর মা—আগে বুঝিনি।

না, না, কষ্ট নয়, কিছু মনে করবেন না বিশুর মা। একটু সম্বৃত হতে চেষ্টা করে নির্মলা।

এবার আবহাওয়াটা একটু হালকা করতেই অন্য কথা পাড়ে নির্মলা। আপনাদের কোষাটা যেন কানা বিশুর মা, আহ্নিক করতে গিয়ে দেখি জল থাকে না। আমাদের ঠাকুর ঘরে তো দুজোড়া কোষাকুষি ছিল, দাঁড়ান দেখি কাল গিয়ে। একজোড়া দিয়ে যাই আপনাকে, শিবুদের যদি না লাগে। ওদের ঘরে বাসন-কোসনও কটা আছে। বাসনের অভাবে ওখানে তো কত কষ্ট আমাদের। পান্নুটাও যখন এসে গেছে আজ—

পান্নু এসেছে সন্ধ্যার খানিক আগে। আর দেরি করার কোনো মানে হয় না এখানে। আজ প্রায় আট-দশদিন হল নির্মলা বিশুদের ঘরে উঠেছে, কেমন লজ্জা-লজ্জা লাগে, বিশুর মাও কাজকর্ম করতে দেয় না কিছু। কাল সকালেই ঠাকুরঘরের জিনিসপত্রগুলো গোছগাছ করে নেবে। পরশু ভোরে রওনা দিলে দুপুরের আগেই বর্ডার পার হতে পারবে।

আগে ঠাকুরঘরের জিনিসপত্রগুলো! কিন্তু একদিনের মধ্যেও একবার ঠাকুরকে দেখার সময় করে উঠতে পারে না। পান্নুর নামে একটা মানতও ছিল যে নির্মলার—এক সের দুধ দিয়ে ঠাকুরকে স্নান করানো।

স্নান সেরে নির্মলা ঠাকুরঘরে আসে, দরজা ভেজানো ঘর। পৈঠায় মাথা রাখে, ঠাকুর তোমার ইচ্ছা, সবই তোমার ইচ্ছা।

প্রণাম সেরে ও কি বিড়বিড় করে বলে। তারপর উঠে আস্তে আস্তে ভেজানো বাঁশের দরজাটা খোলে।

ক বছর পরে, আজ ঠাকুরঘরে এসেছে নির্মলা। মাথায় চন্দনের রক্তবিন্দু, তিন হাত বেড়ের হাত-চার উঁচু কালো পাথরের দেবতা, মহাদেব। নিচে তামার টাট একখানা, কয়েকটা ফুল—বেলপাতা, কোষাকুষি। চেয়ে আছে নির্মলা, অপলক। মাথায় সুড়সুড়ি দিয়ে উঠছে কি ওঠা,—টিলার সুড়ি পথ বেয়ে উঠবার সময়ের সেই সুড়সুড়িটা! উঁচু কালো পাথরটি নড়ে উঠল না! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই বুঝি তেড়ে আসছে—উঁচু ঢিবি মতো কালো রণ্ডা সেই

জন্তুটা না ? আহ্—পিছলে যেন বেরিয়ে আসে নির্মলা, হাঁফাতে থাকে। এবার দুগালে পর পর চড় মারে। না, না, পাপমুখ, পাপমন আমার, অপরাধ নিয়ো না ঠাকুর, আমার অপরাধ নিয়ো না।

নজরে পড়ে পেছনে শিকেয় হাঁড়ি-পাতিলগুলো ঝুলছে। বেড়াটি উইপোকায় ঝাঁজরা, ভিত ভেঙে দলাদলা মাটি সরে গেছে উত্তর দিকটায়। ঠাকুরঘর, কিন্তু না আছে লেপাপোঁছা, না আছে কিছু। এটুকু কাজও শিবুর বৌ করতে পারে না !

শিবু আছিস রে, শিবু।

রাস্তার পাশেই শিবুর ঘর।

ও দিদি বুঝি, আসুন, আসুন, হ্যাঁ, ঘরেই আছে। কপালের ওপর ঘোমটা টেনে বলে শিবুর বৌ। একটা পিঁড়ি পেতে দেয়।

রোজই মনে করি আসি, চলেও যাচ্ছি কাল কি পরশু। ভাবলাম পেতলের বোগনা দুটো নিয়ে যাই এইসঙ্গে, ওখানে রান্না-বান্নার কি অসুবিধা, মাটির হাঁড়ি উনুনে বসিয়েছি তো ফেটে চৌচির। নিরিমিষ কড়াইও আছে একটা, পেতলের মালসাও একটা রেখে গেছলাম। আর কোষাকুষি যদি না লাগে তোদের দিয়ে যাই বিশুর মাকে, ওদেরটা দেখলাম কানা।

শিবু পাশের ছোট ঘরটি থেকে বেরিয়ে আসে। কি যেন কাজ করছিল এতক্ষণ, বেশ গম্ভীর।

কি জানি, আপনি জানেন আপনার জিনিসপত্রের কথা, থাকে তো নিয়ে যান। তবে আমি তো জানি না দুটো পেতলের থালা আর ভাঙা কড়াই ছাড়া অন্য কিছু।

কি বলিস, তোর দাদাও তো বলে দিয়েছেন জিনিসগুলো নিয়ে যেতে।

দাদাও বলেছেন ! তবে তো খেয়ে বসে আছি আর কি। মহাদেবের পুজোর জন্য আমার পিতৃশ্রাদ্ধ আটকে আছে যখন ! কই, মাঝে মাঝে তো দেখি পানুকাও আসে এখানে, কাল এসেছে শুনেছি। কিন্তু কেউ কি আসে আমার কাছে, খোঁজ, নেয় কিভাবে পুজো-আচ্চা চলছে ! এদিকে বাড়ির বার হবার যো নেই—মহাদেব উপোস করবেন। বিনি মাইনের চাকরি আমার ভালোই হয়েছে দিদি !

শিবু, সময় আমার কি ভালো যাচ্ছে তুই জানিস। দু একটা বাসন-কোসন না থাকে নাই থাক। ওসব তো চিরদিনের নয়। কিন্তু পিতৃশ্রাদ্ধের

কথা তুই তুললি ! পিতৃশ্রাদ্ধ কি আমাদের একার ? বান-বর্ষা গেছে, আকাল গেছে, না খেয়েও কি তখন ঠাকুরের চাল-কলা যোগাড় করিনি ? কজনার চেহারা দেখেছি তখন দোরে ? ···হ্যাঁ, অন্য কথা, জমিটার কথাবার্তা থাকলে এখনও বিশুর বাবা আছেন, পাড়ার লোকজনও কিছু আছে, একটা ব্যবস্থা কি হতে পারে না ! আমার সঙ্গে কি, নাকি আমাকে নরম পেয়েছিস তোরা, অদৃষ্ট যেমন নরম পেয়েছে আমাকে, না ?

এতক্ষণ গম্ভীর-গম্ভীর থাকা, তারপর কেমন আলগা কাটাকাটা ভাবে শিবুর কথা বলার বুঝি এই অর্থ ! কেন এতদিনেও ঠাকুরের নামের ওই চিলতে জমিটুকু তাকে দেওয়া হচ্ছে না, না ? ছেলে পানু আসে কি না আসে সে খবর থাক, ছেলের বুদ্ধি থাকলে আজ অনেক সুবিধা হত নির্মলার, টানাটানি কমত সংসারের। কিন্তু পাড়ায় কি কেউ ছিল না ! পিতৃশ্রাদ্ধ যে একা নির্মলাদেরই !

পিস শ্বশুর তখনও ছেলেমানুষ, সিমগাছে বাশের জাকা পুঁততে গিয়ে অল্প মাটিতেই খন্তার মুখ আটকে যায়—কড়, কড়াৎ। এক খাবলা কি যেন সরে যায় খন্তার কড়া যায়ে। বুকের ওই দাগটা কি তবে খন্তার সেই ঘায়েই ! না, না, ভক্তজনেরা আঙুল দিয়ে দেখায়, ওটা নাকি কালাপাহাড়ের কুড়ুলের দাগ ! কি বলেছিলেন নির্মলার বাবা, ওটা তো একটা খাম্বা, রাজবাড়ির হাতি-বাঁধার কালো পাথরের খাম্বা। ওটাকে আবার ষোড়ষোপচারে পূজা।

সারাটা জীবন জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেছে ওই কালো পাথরটার বিষশ্বাসে। বিয়ের যুগ্যি রোজগেরে ছেলে, গায়ে-গতরে বেড়ে-ওঠা ষোলো, বারো, ন বছরের ছেলে তিনটে, কচি-কাচাগুলো ছয়, চার, তিন, দু বছরের—সব ঝটপট সাবাড়। শেষ খাবার বুঝি মনো আর আবু ! না, বুঝি এও শেষ নয় ! ছেলে-সন্তান-সন্ততিতে ভরে উঠত বাড়ি, ছেলেদের বিয়ে দিলে এতদিনে নাতি-নাতনীদের হুটোপুটিতে রাতে উঠোনের ধুলো সরত না। আর ওই বোবা পাথরটির সুমুখে সারাজীবন মাথা কুটে মরেছে, পূর্ণিমা অমাবস্যায় কত 'হত্যা' দিয়েছে নির্মলা !

শিবু নরম পেয়েছে নির্মলাকে, অদৃষ্ট নরম পেয়েছে—কার জোরে ?

মাচার তলা থেকে একটা ভাঙা কড়াই আর একটা পেতলের থালা বের করে আনে শিবু।

আর কিছু নেই বুঝি, না ?

শিবুর গলা প্রখর হয়ে ওঠে, হ্যাঁ, ভুলে গেছি, আরও দুটো জিনিষ আছে—নিতে পারেন, কাজে লাগে না কিনা আজকাল, পাঁঠাবলির হাড়-কাঠ আর খড়্গাটা। আপনার হয়তো কাজে লাগতে পারে।

চোখ দুটো চক চক করে ওঠে। নির্মলার ভাঙা কপালের ওপরও কি চমৎকার মিহি করে কাটা শিবুর। এই শিবুর বাপকাকারা কি সারাজীবন কিছু কম করেছে নির্মলার—লাঠির জোরে অতবড় পুকুরটা, চারপাশের জমিগুলো, পনেরো বিশ বিঘে বাঁশবন-দখল থেকে সুরু করে বেশি রাতে দোর ঠেলা পর্যন্ত! আজ শিবু সাধুজী!

পানু যা তো, নিয়ে আয় গে হাড়-কাঠ আর খড়্গাটা। যা না শিগগির, দাঁড়িয়ে আছিস এখনো হারামজাদা! যাক, আমিই যাচ্ছি—

হাসি-মুখ পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে পানু থ মেরে গেছে মার কাণ্ড কারখানা দেখে। ও দুটো নিয়ে কি হবে, পাগল হয়ে গেছে নাকি মা।

আজ অনেক দিন পরে কাঁপছে, দিনের দুপুরে, রাতের নিশিতে, পূর্ণিমায়, অমাবস্যায়, ছেলে-মেয়ে জন্মের কি বিয়ের মানতে অগুনতি পাঁঠাকাটা হাড়কাঠে আর ডান হাতের পুরনো জংধরা খড়্গের মাঝখানে কাঁপছে নির্মলা। জীবন-ভর মার খেয়েছে সে পাড়া-পড়শীর, আত্মীয়-স্বজনের, ভাগ্যের। রুখে দাঁড়াবার কথা তো ভাবেনি কখনও। শুধু চোখের জল দেখিয়েছে অদৃষ্টকে আর বিশমণি পাথরের দেবতাটিকে। সে দেবতা বুঝি হেসেছে আর আড়ালে বিষ-তীর ছুঁড়েছে। স্তব্ধ হয়ে কান পেতে কি শুনছে নির্মলা? হাজার হাজার অসহায় জীবের শেষ-শ্বাসগুলো জমাট বেঁধে কে জেগে উঠছে নির্মলার মধ্যে—নতুন এক চামুণ্ডা! এক্ষুনি বিশমণি পাথরটা উপড়ে টেনে হিঁচড়ে এনে চড়িয়ে দেবে হাড়কাঠে! খড়্গ হাতে উঠবে খল খল হাসি।

কাঁপছে নির্মলা, আহ্—এক অসহ্য আনন্দে, দুঃসহ বেদনায়। জীবনের শেষ বাঁকে প্রথম অস্ত্র পেয়ে কি করবে, কি করবে নির্মলা!

কিন্তু শ্বাস যে বন্ধ হয়ে আসছে নির্মলার! আর না, আর না—বিষ, নরক। সাত পুরুষের ভিটে—প্রণাম। এ গাঁয়ের মাটিতে আর যেন পা দিতে না হয় এ জন্মে, আর জন্মেও নয়। আজ এক্ষুনি এই সন্ধ্যের অন্ধকারেই রওনা দেবে নির্মলা।

পানু—পানু।

বাদ সাধে বিশুর মা, পাগল হয়েছেন পানুর মা—এ ভর-সন্ধ্যে বেলায়... দিনকাল ভালো নয়, রাত-বিরেতের পথে ঘাটে একটা কিছু হতে কতক্ষণ?

ভোর-রাতেই রওনা দেয় তারা। এ পথটুকু পার হয়ে ঘুরলেই আবার দু-চোখের জ্বালা—ঘাস-জংলায় ঢাকা ভিটেটুকু, উঠোনটুকু। আহা, নির্মলা গোবরজল ছড়াবে না উঠোনে, কুলগাছটির ওদিকে, বাতাবি গাছটির নিচে। ভোর হয়ে গেছে যে!

কখন একটু থমকে পড়ে। ঠাকুর ঘরের পৈঠায় মাথা নোয়াতে গিয়েও হঠাৎ দুপা পিছিয়ে আসে। না, আর প্রণাম নয়। নাকের ডগা বেয়ে কি যেন পড়ে অতর্কিতে। অনেক পিপাসা এ মাটির—চকিতে শুষে নেয়।

মা—? ছেলে মার মুখের দিকে তাকায়।

কি হল আবাব তোর?

না, বেজায় ভারী খড়্গটা, বলছিলাম কি, ওটা রেখে গেলে হত না জ্যেঠা-মশাইদের ঘরে? কি হবে ওতে আমাদের, আর বর্ডারে ধরবে না ভেবেছ?

ওঃ, ভারী আমার বুদ্ধির সাগর এসেছেন। বর্ডারের মুখপোড়াদের হাতে কাঁঠালগাছ বিক্রির পয়সাটা ধরে দিলেই খুব হবে, নির্মলা জানে।

পেছন ঘুরে পথে নামতেই ওই পাশে বাসক-ঝোপের আড়ালে দুটো বেড়ালের ঝগড়া, হুটোপুটি—একটা যেন আছড়ে পড়ে বাইরে রাস্তার ওপর, একেবারে নির্মলার সামনে। ধবধবে সাদা রং কালচে ছাই ছাই মত হয়ে আসা বেড়ালটা। আর আশ্চর্য, ঘুর-ঘুর করতে লাগল নির্মলার পায়ে পায়ে।

আ—মর, মর, বাড়ি আগলে আমায় সগ্‌গে তুলবেন—পাপ, পাপ, বিড় বিড় করে নির্মলা। কিশোরী নাথের ঘাটা ছাড়িয়ে মা-ছেলে আরও এগিয়ে যায়।

পেছনে একজোড়া চকচকে চোখ—লেজটা নড়ছে এখনও, পানুর সঙ্গে চোখাচোখি হয় আবার।

মা—

কিরে

ওটা বুঝি আমাদের মিনিটাই, দেখেছ তুমি। কি ভালোবাসত আবু—একটু থেমে আবার বলে, মিনিটা খুসি হয়েছে—কি ঘুর-ঘুর করল তোমার পায়ে পায়ে।

খুসি হয়েছে এতদিনে আবুর মিনিটা। তা হবে। নির্মলার থমথমে মুখেও একটা হাসি উঁকি মারছে। জয়ের হাসি। সেই হাসির নিচে দেখা গেল ডি. এম. এর রাইফেলের আট-আটটা গুলিতেও যেটা শুধু জখমী হয়ে পালিয়েছিল আজ এখন সেটা আর পালাতে পারল না। এই মুহূর্তে খড়্গের এক কোপে হুমকি খেয়ে পড়ল অত বড় দাঁতালো হাতিটা।

বাল্য স্মৃতি : পূর্ব আফ্রিকা

প্রতিমা বসু

কৃষ্ণ ও ধূসর নীল জমাট মেঘের সঙ্গে মিশে-যাওয়া থাকে থাকে ঘনবদ্ধ উদ্ভিদ্ সঙ্কুল পাহাড়, তার মধ্যে একটি সাজানো নগরী, নাইরোবি। ওপরে নিবিড় নীল আকাশ, নীচে শ্যামল তৃণাবৃত উপত্যকা। শীতের প্রকাশ প্রখর নয়, আরামপ্রদ। একই সঙ্গে ছয় ঋতুর সমাবেশ। পূর্ব আফ্রিকায় দেশভেদে অদ্ভুত তারতম্য কিন্তু নাইরোবিতে শীতের মধ্যে বারমাস হেমন্ত বসন্তের আনাগোনা। তাই গোলাপ, জুঁই, রজনীগন্ধা, দোপাটি, গাঁদার শোভা, রঙবেরঙের ফুল বাগান আলো করে থাকে প্রতিদিন। রাস্তার ধারে ধারে ইউক্যালিপ্টাস গাছের সারি ঘন সবুজ পাতার মধ্যে কচি ও পাকা লালচে পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের শিশু মনে যে ছবি আঁকা রয়েছে, তা আজও অস্পষ্ট হয় নি।

বাড়ির মধ্যে ছোট ছিলাম আমরা পিঠোপিঠি তিন ভাইবোন। প্রায় সমস্ত সময়ে নিয়মের গণ্ডির মধ্যে থাকতে বাধ্য হওয়ায় বাইরের দিকে দৃষ্টি দেবার সুযোগ বড় একটা ছিল না। তবু ঐটুকুর মধ্যে যা পেয়েছি তার মধুর স্মৃতি আজও অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধান ঘুচিয়ে মনকে টেনে নিয়ে যায়। একজন শিকারী বন থেকে একটা বাচ্চা গণ্ডার ধরে এনেছিলেন। আমরা দাদার সঙ্গে সেই অদ্ভুত জন্তু দেখে এলাম। সেই থেকে আমাদের একটা নতুন খেলা আবিষ্কার হল—গণ্ডার-গণ্ডার খেলা। রাত্রে খাওয়ার পর মা যতক্ষণ কাজ সেরে না আসতেন, আমরা একটা খাটে আড়াআড়ি শুতাম লেপ গায়ে দিয়ে আর তিনজনে সেটি ধরে বুক পর্যন্ত নামিয়ে গণ্ডার আসছে বলে আবার মুখ ঢাকা দিতাম। ভারী মজা হত। ক্রমে গণ্ডারের জায়গাতে এলেন পশুরাজ সিংহ। যদিও তাঁর গম্ভীর গর্জনে শিশুচিত্ত থরথর করে কেঁপেছিল তিনদিন ধরে। ঘটনাটা মজার। আমাদের কোয়ার্টারের কাছেই এক সাহেবের বাড়ি। বেলা দুপুরে একটি সিংহ নিশ্চিন্ত মনে থাবা মেলে বসে ছিলেন শোবার ঘরে। গৃহিনী মেয়ে নিয়ে রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কর্তারা সকলে অফিসে গেছেন। মেয়েটি বোধহয় মায়ের ফরমাসে ঘরে আসেন এবং সিংহকে

তদবস্থায় দেখেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে চীৎকার করে লোক জড়ো করেন। দরজায় চাবি পড়ে, তারপর দরজা-জানালার শার্সির ভেতর দিয়ে ক্রমাগত দর্শকদল বনের পশুরাজকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। অবশেষে তিনি ভীষণ গর্জন ছাড়েন, অগত্যা একদিকের শার্সি ভেঙে ভদ্রলোককে গুলি করে মারা হয়।

ঘুমে যখন চোখের পাতা ভারি হয়ে আসত, ভাবতাম স্বপনপরী মাথার পাশে বই নিয়ে স্বপ্ন দেবেন বই দেখে। স্লেট, গুলি, কাঁচভাঙা অনেক কিছু বালিশের তলায় গচ্ছিত থাকত। ঘুম ভেঙে দেখতাম সেই অতি মূল্যবান বস্তুগুলি অন্তর্হিত হয়েছে। মায়ের কাছে শুনতাম পরী এসে সব নিয়ে গেছে। ক্ষুণ্ণ হলেও স্বপনপরীর জন্য আমাদের কেমন একটা মমতার ভাব গড়ে উঠেছিল। সকালে ঘুম ভাঙতেই ভাইবোনেরা কে কি স্বপ্ন দেখলাম পরস্পরকে বলা হত। আমার আর ছোটভাই সুনীলের স্বপ্ন ছিল সংক্ষিপ্ত। ছোটদা শ্যামলের স্বপ্ন ছিল বিরাট কাহিনী, তার মধ্যে অদ্ভুত বীরত্ব ছোটদার। আমরা হাঁ করে শুনতাম আর ভাবতাম, আহা, এতবড় স্বপ্ন আমরা দেখি না কেন। দুষ্টুমি বুদ্ধিতে তার জুড়ি ছিল না, ওর জন্যে আমরাও অনর্থক মার খেতাম। জানলার শার্সি ভাঙা, সোডার বোতল ভেঙে গুলি বার করে নেওয়া গোছের বদ্‌বুদ্ধিতে ছোটদার মাথা ঠাসা ছিল।

সকালে শুধুপায়ে ঘরে নামা বারণ ছিল—ডুডু নামে এক রকম পোকার ভয়ে। আমাদের ঘরোয়া প্রথা অনুযায়ী ডাক দিতাম 'বয় ভিয়াটু লেটে' অর্থাৎ জুতো নিয়ে এস। কিকুয়ু চাকর এসে জামা-জুতো পরিয়ে দিত, তারপর 'মটোমাজি' অর্থাৎ গরম জল এনে হাজির করত বাথরুমে। আমরা মুখ ধুয়ে দাদার কাছে হাজির হতাম। এককাপ করে চা ও দুখানা করে বিস্কুট মিলত। তারপর তিনজনে বাগানে বেড়াতাম। কোয়ার্টারের সামনের দিকটা লতানে গোলাপের ডালে ঢাকা ছিল। ক্রোটন-ঘেরা নানা জাতের ফুলের গাছ পেছনে ছিল, আর ছিল সব্‌জীর বাগান। আমাদের তিনজনের ক্রোটন-ঘেরা ছোট ছোট চৌকো আকারের তিনটি ক্ষেত ছিল। মাঝে মাঝে ভোরে উঠে ছোট চারাগাছ উপড়ে দেখতাম কার গাছের শেকড় কত বড় হচ্ছে, তারপর আবার পুঁতে রেখে দিতাম। মটরশুঁটি ক্ষেতে আমরা লুকিয়ে থেকে কোমল সবুজের মধ্যে গা ডুবিয়ে কলাই ছিঁড়ে খেতাম, সেই মটরের মিষ্টিস্বাদ আজও মুখে লেগে আছে মনে হয়। ঠিক আটটার সময় খট করে জানলা খুলে যেত। মা মুখ বাড়িয়ে ডাকতেন। আমরা উঠে বাড়ির

ভেতরে যেতাম। দুখানা করে পরোটা আর ভাজি ; তখনকার মতো খাওয়া সেরে বাইরের ঘরে পড়তে বসতাম। নামমাত্র বিদ্যাচর্চা সারা হলে লম্বা ঘন্টা তিনেক সময় বারান্দায় খেলতে পেতাম। বাবা-দাদারা অফিস বা স্কুলে যেতেন, মা কাজে ব্যস্ত থাকতেন, মেজদি থাকত মায়ের কাছে। আমাদের বাইরের বারান্দা ছেড়ে কোথাও যাওয়ার হুকুম ছিল না, কাজেই বন্দী অবস্থাতেই উপভোগ করতাম মুক্তির আনন্দ। খেলা ছিল নানা ধরনের—প্রথম দিকে সুর করে 'বড়গাছ, ভাল জল' কিংবা 'লিট্‌ল্‌ বার্ড কাম টু মি' নয়তো 'সুবেরে জো খোলা আঁখ মেরে'—সমস্বরে গাওয়া। টুলের ওপর টুল বসিয়ে গাড়ি চালানো ইত্যাদি। তারপরই ঝগড়া মারামারি বেঁধে যেত, গণ্ডগোল বেশি হলেই ঠাকুর অথবা রান্নাঘর থেকে মা আসতেন আর চুল ধরে ঘা কতক চড়চাপড় মেরে দালানের ঝিলিমিলির সঙ্গে পিছমোড়া করে বেধে রেখে চলে যেতেন। তখন আমাদের করুণ কান্না পঞ্চমে উঠত। গাল বেয়ে নামত চোখের জল কিন্তু পাঁচমিটের মধ্যে সেই বাঁধা অবস্থায়ই নতুন খেলা আবিষ্কার করত ছোটদা। পেছনের বাঁধা হাতেই ঝিলিমিলের ভেতর দিয়ে কে কটা ফুল ছিঁড়ে আনতে পারে, তারপর কে কতটা জিব বার করতে পারে, আরও কত কি প্রতিযোগিতা হত। খানিক পরে মা এসে ঘরে নিয়ে গিয়ে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে সাজিয়ে দিতেন। খাওয়া হলে মায়ের কাছে বাংলা পড়তে হত। আজ জীবনের এই অপরাহ্ণ বেলায়ও সেই বাঁধাধরা অথচ চঞ্চল শিশুমনের আনন্দময় মুহূর্তগুলোর কথা কত গভীরভাবে মনে পড়ে।

বাবার সঙ্গে ছিল আমাদের আবদারের সম্পর্ক। মাকে আমরা এড়িয়ে চলতাম। মেজদা আমাদের সঙ্গে খেলাধুলোয় খুনসুড়িতে সমান আনন্দ উপভোগ করতেন, সেজদাদা ছিলেন স্বল্পভাষী শান্ত প্রকৃতির মানুষ। মেজদির ছিল নদীর মতো উচ্ছল প্রকৃতি। খেলায়, গল্পে, ছড়ায় আমাদের শিশুচিত্ত ভরিয়ে রাখতো। মেয়ে হলেও ভাইয়েদের সঙ্গে বল-খেলা পুতুল-খেলার চেয়েও প্রিয় ছিল। এই জন্যে মায়ের কাছে তার লাঞ্ছনাগঞ্জনার অবধি ছিল না। মা তার নিবিড় চুলের রাশি ধরে দস্তুরমতো পিটুনি দিয়ে বলতেন 'দিদির মত শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে, মনে থাকে যেন'। কিন্তু তার মন ছিল খোলা পাখির মতো। দাদার বন্ধু ছিল দুজন—তাঁদের নাম ভজ্ঞট ও পিরু। আমরা ওঁদের সঙ্গে খেলতে পেতাম না। তবে সামনে বসিয়ে রেখে ওঁরা নানা খেলার কসরত দেখিয়ে আমাদের তাক লাগিয়ে দিতেন ; নিচে হাত রেখে ওপরে পাতুলে হাঁটা

ঘরের দরজায় কাপড় টাঙিয়ে ভেতর থেকে ছায়ার খেলা দেখানো এমন কতো কি। আমরা টুলের ওপর বসে তাঁদের অদ্ভুত বাহাদুরি দেখতাম। মেজদাদা আর মেজদির একটা প্রতিযোগিতা হল—দাদা শ্যামলকে রাজা সাজাবে। মেজদি আমাকে রাণী সাজাবে। মা যখন ঠাকুর ঘরে যেতেন, প্রায় দুঘণ্টা, সেই সময়ে মেজদির ছিল অবকাশ। দাদার সঙ্গে শ্যামল বাইরের ঘরে আর আমি মেজদির কাছে শোবার ঘরে। দরজা বন্ধ হল। কেউ কারও কায়দা দেখে নিলে চলবে না। আমি পাউডার আর রুজ মেখে হলাম বৃটেনের সুন্দরী, মায়ের সায়া হল লুটিয়ে পড়া গাউন, একখানা রেশমের কাপড়ে হল লুটিয়ে পড়া ওড়না। টুপি ছেঁড়ার ওপর তারে জড়ানো রেশমের ফুল হল ক্রাউন। আমার হাত ধরে আমিরী চালে এসে মেজদি দরজা ধাক্কা দিল। দাদা দরজা খুলতেই আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখলাম—কালো কোটের ওপর নানা ডিজাইনের মেডেল ঝুলিয়ে খেলাঘরের রাইফেল ঘাড়ে পিনে আটকানো রঙ্গীন কাপড় লুটিয়ে মাথায় পিজবোর্ডের মুকুট পরে যেন কোথাকার সম্রাট উপস্থিত। মেজদি বেচারা হেরে গেলো। একদিন মেজদি আমাদের সাহেব মেম সাজিয়ে রান্নাঘরের কাঠের টুলের ওপর বসিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে ঘি চুরি করে এনে গরম লুচি ভেজে খাওয়ালো। আমরা খুসি হয়ে অসময়ের আহার সারলাম, আর মেজদির ভাগ্যে মিললো উত্তম মধ্যম প্রহার। এপারের খেলা সাঙ্গ করে অনেকদিনই চলে গেছে সে; তার সেই সরল মুখচ্ছবি মনে পড়ে মাঝে মাঝে।

আমরা শৈশবে যাঁদের সঙ্গ পেয়েছি, জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাঁদের প্রথম দেখেছি তাঁদের মূর্তি মনে স্পষ্ট ধরে রেখেছি। ইউসুফ কাকাকে স্পষ্ট স্মরণ হয়। ফরসা টকটকে রং, পাতলা চেহারা, হাসিখুসি ভাব। আমরা জানতাম তিনি হচ্ছেন বাবার ছোট ভাই। আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অসীম। চাকরির জন্যে তাঁকে শহরের বাইরে যেতে হল। প্রতি শনিবার বাড়ি আসতেন। আমাদের নিয়ে সারাদিন খেলাধূলো করে, বেড়িয়ে এনে রবিবার রাত্রে চলে যেতেন। জিঞ্জা থেকে আসতেন হীরালালবাবু। তাঁকে ডাকতাম কাকা বলে—তিনি যতদিন বাড়িতে থাকতেন আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না। আমাদের বাসার কিছু দূরে থাকতেন এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক—নাম শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জি। তাঁকেও কাকা বলতাম। ওঁর বড়মেয়ে বনলতা ছিলেন মেজদির সমবয়সী। ছোট ক্ষেন্তি ছিলো আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট। দুই ছেলে—ডাক নাম ঝণ্টা আর প্যাকা। এরা শ্যামল ও সুনীলের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে

আসতো। ঝণ্ডা ভাল ব্যাট ধরতে পারতো। আমরা চিৎকার করে ছড়া বলতাম—'স্যাণ্ডার ম্যাণ্ডার ল্যাণ্ডার যায়, ঝণ্ডার আউট কখনও না হয়'। স্যাণ্ডো ও ম্যাণ্ডো ছিল শ্যামল ও সুনীলের ডাক নাম। পাহাড়ের উপরে ছিল মিলিটারী ব্যারাক। সেখানে একজন বাঙালী থাকতেন—নাম অতুল ব্যানার্জি। আমরা তাঁকে বলতাম পাহাড়ের কাকা। বাবার এক পাঞ্জাবী বন্ধুর লাল নীল সবুজ কাঁচ দিয়ে ঘেরা গরুর গাড়িতে চড়ে আমরা মাঝে মাঝে পাহাড়ের কাকার বাড়ি বেড়াতে যেতাম। দুই বাঙালী পরিবার এক সঙ্গে যাওয়া হত। উঁচু ঘরের মতো গাড়িতে একসঙ্গে যাবার সময় লাল নীল সোনালী শার্সীর ভেতর দিয়ে বাইরের দৃশ্য অদ্ভুত সুন্দর দেখাত। মায়েরা গল্পে মসগুল হয়ে থাকতেন, আর আমরা মুক্ত-পাখা বিহঙ্গের মতোই হাল্কা খেলাধূলায় মেতে থাকতাম। অজস্র স্মৃতির আবর্জনার মধ্যে সেই দিনগুলি আজও অস্পষ্ট হয়নি।

বাইরে থেকে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি এসে থাকতেন এক বাঙালী ডাক্তার, নাম বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। লম্বা চওড়া চেহারা, রং আগুনের মতো উজ্জ্বল, চাপদাড়ি। সদাহাস্যময় মুখ। তাঁর উপস্থিতিতে বাড়িশুদ্ধ সকলেই আনন্দে উদ্বেল হত। আমরা তাঁকে ডাক্তারবাবু বলে ডাকতাম। তাঁর সঙ্গে গলা মিলায়ে ভজন গাইতাম। শ্যামল ও সুনীল চাণক্য শ্লোক শিখত তাঁর কাছে। তিনি যখন ফিরে যেতেন তখন বাড়ি যেন নিঝুম হয়ে যেত। আমরা আবার তাঁর আগমন প্রতিক্ষায় ব্যাকুল হয়ে থাকতাম। একজন প্রৌঢ় বাঙালী—ফনী ব্যানার্জি—আমাদের বাড়িতে থাকতে এলেন। আমাদের বলা হল যে তিনি বাবার দাদা হন, জ্যাঠামশাই বলে ডাকতে হবে। চেহারা তাঁর লম্বা, একহারা বড় বড় চোখ। মাথায় পরতেন ক্যাপ, হাতে থাকত একটা ছড়ি। তিনি চলে যাওয়ার পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জীবনবাবু এসে রইলেন আমা-দের বাড়িতে। আমাদের মাকে মা বলে ডাকলেন। মা আমাদের বড়দা ডাকতে শেখালেন, কারণ ইতিপূর্বে আমার বড় ভাই নির্মলকৃষ্ণকে মা নাইরোবিতে হারিয়ে ছিলেন। তিনি আমাদের পড়াতে শুরু করলেন। মজার মজার গল্প বলতেন। হাসির চোটে আমরা গড়িয়ে পড়তাম। মেজদার সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। কিছুদিন পর চাকরী হতে কোথায় চলে গেলেন। আর একজন বাঙালী এলেন, নাম অক্ষয়বাবু। হীরালালবাবুর শালা হতেন বলে আমরা মামা ডাকতাম। গান জানতেন, আমাদের বাইরের ঘরে একটা অর্গ্যান ছিল তার সামনে বসে গান গাইতেন। মাঝে মাঝে গানবাজনা, খাওয়াদাওয়া

হত। বাবা বাঁয়া তবলা বাজাতেন। কাকা অর্গ্যান বাজাতেন, আর এই নূতন মামা বাঁশী বাজাতেন। আমরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। সবকটি বাঙালী একত্রিত হওয়ার দিনগুলি উৎসবে পরিণত হত। বাঙালী মহিলারা একসঙ্গে রান্না করতেন। সবকটি শিশু একসঙ্গে খেতে বসতাম। কী আনন্দ সেদিন হত আমাদের আজও ভাবলে আশ্চর্য লাগে। পুজোর সময় নতুন কাপড়জামা হত আমাদের। মা ফ্রক ছাড়িয়ে নতুন শাড়ি পরাতেন। চৌকাঠে আলপনা দিতেন, দেশথেকে আনা গঙ্গাজল ছিটানো হত, বাবা মা একসঙ্গে খাবার তৈরি করতেন। একটা বড় বালতি করে দুধ আসত, দূর থেকে আমরা দেখতাম। অষ্টমীর দিন পাঞ্জাবী মেথরদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হত। বিজয়ার দিন বাড়ি বাড়ি খাবার পাঠানো হত, বাঙালী কজন পরস্পরে কোলাকুলি করতেন। আমরা সকলকে প্রণাম করতাম। মেজদা আমাদের ঘাড় ধরে প্রণাম করাতেন। ফাঁকি চলত না। তারপর নিয়মমত দুর্গা-নাম লেখা হত। কালীপুজোর দীপ সাজানো থেকে জন্মদিন, ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান কোনটারই বাদ পড়ত না। অবাঙালী হিন্দুদের বড় উৎসব ছিল রামলীলা।

সামনের বাড়িতে পরিবারে থাকতেন মুন্‌শীজি। শ্যামবর্ণ দীর্ঘকায় সদাহাস্যময় মুখে লম্বা সাদা দাড়ি, মিষ্ট ভাষী ও সদালাপী। ওদের বাড়িতে আমাদের সর্বদা যাতায়াত ছিল। ওর মাকে আমরা আম্মা বলতাম। বড়ছেলে মহম্মদ ছিলেন মেজদার বন্ধু। ছোট পীরু ছিলেন সেজদার বন্ধু। তাঁর কাছে থেকে বাংলা কথা শিখেছিলেন। আমার খেলার সাথী ছিল নান্নি, মুন্নি ও চুন্নি। যখন হুড়াহুড়ি মাত্রা ছাড়াত, তখন আমাদের আম্মা কাছে ডেকে বসে বসে অনেক রকম খেলা শেখাতেন। দুইগাল ফুলিয়ে ঘুষি মারা "আমওয়ালা আম দেও, আমসরকার কা—" ইত্যাদি ছড়া শিখেছিলাম তার কাছে। জাতিভেদ শিখিনি আমরা। বখ্‌রিদের উপঢৌকন, দেওয়ালী বা খ্রীষ্টমাসের উপহার সব কিছু সাদরে গৃহীত হত। বাবা মাংস রান্না করতেন। মা খুব নিষ্ঠা পরায়ণা ছিলেন, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলে আমরা সকলকার বাড়িতে খেতাম, মা কিছু খেতেন না। আমরা জানতাম, মা ঠাকুরের ভক্ত তাই মাকে কোথাও খেতে নেই। বিকেলে কিকুয়্যু চাকরের সঙ্গে দাদাদের ক্লাবে যেতাম। কোনো দিন মাঠে খেলতাম। শ্যামল ও সুনীলের হাতে থাকত চাকা আর লাঠি। আমার কোলে থাকত পুতুল। সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ পড়তে হত। তারপর তিন ভাইবোনে একখানি করে থালা

নিয়ে মায়ের কাছ থেকে রুটি নিয়ে মাঝের ঘরে এসে খেতে বসতাম। ছুতো-নাতায় শ্যামল ঝগড়া বাধাত। মা অগ্নিমূর্তি নিয়ে দাঁড়ালেই আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হত। ছেলেমেয়েদের খাওয়া শেষ হলে, মাঝের ঘর জুড়ে বাবা, দাদা, মেজদা, ঘরোয়া অতিথি, বাইরের অতিথি সকলে এক সঙ্গে খেতে বসতেন। হাসিগল্প তর্কাতর্কিতে ঘর গুলজার হয়ে উঠত। একজন শিখ ছিলেন, নাম তাঁর শান্ত সিং। পরিষ্কার বাংলায় কথা বলতেন বলে আমরা ওঁকে আপনার লোক ভাবতাম। অন্য জাতীয় লোকের মুখে বাংলা শুনলে খুব আশ্চর্য লাগত। মারাঠি ডাক্তার ছিলেন টিপনীষ, একটা কথা জানতেন 'তুমে কামো আছে'। আমরা উত্তর দিতাম—'ভাল আছি'। আমাদের নিয়ে বাবা যখন বেড়াতে বের হতেন তখন পথের পাশে দুদিকে থাক থাক সাজান দোকানে কোনও ভাল জিনিস দেখলেই আবদার ধরত সুনীল—'ওটা আমার চাই'। বাবা আমাদের নিয়ে যখন এগিয়ে যেতেন তখন ও রাস্তার মধ্যে বসে পড়ত, জোর করেও ওঠানো যেত না। অগত্যা তার আবদার মেটানো ছাড়া উপায় থাকত না।

অক্ষয় মামা বিদায় নিলেন। এলেন হীরালালবাবুর ভাগনে, নাম পাঁচু। সেজদাদার মত বয়েস, স্বভাবটা ছিল ভীষণ চঞ্চল। দাদার স্বভাবের ঠিক উলটো। হিরালাল কাকা জিঞ্জা থেকে মাঝে মাঝে এসে থাকতেন, তখন আহ্লাদে কোলাহলে শিশুরা মেতে উঠত। তাঁর হাতে একটা ক্যামেরা থাকত, চলতে-ফিরতে ছেলেদের ফটো তুলতেন। তাঁর একটা কাল টুপি, লম্বা কোট, আর পরচুলের শাদা দাড়ি ছিল, তাই নিয়ে সকলকে 'বুড্ঢা বাবার' ভয় দেখাতেন। বৃষ্টির দিনে আমাদের অকাট্য ধারণা ছিল ঘর থেকে বের হলেই বুড্ঢা বাবা ধরে নেবে, তাই সেদিন দুপুরে মায়ের কাছে লক্ষ্মী হয়ে গল্প শোনা হত। বাংলা গান শেখা হত "তুই কেন মন মরার মত নিঝুম মেরে থাকিস এত নাচ নারে মন হরি বলে জুড়ায়ে যাবে প্রাণের জ্বালা।" শ্যামল ছিল আমাদের মধ্যে সবজান্তা। এ কথার মানে জিজ্ঞেস করতে সে বুঝিয়ে দিল "মন—মানে নিজে মড়ার মত পরে থাকিস্ না নিজেকে বলছে।" মরা মানে ভূত বুঝতাম, গান গাইতে গেলেই ভয় করত। মেজদির কাছে ভারতবর্ষের গল্প শুনতাম। সে ছেলেবেলায় বাংলা দেশে ছিল। বলত, সেখানে আমাদের কে কে আছেন। বড় দিদির বিয়ের গল্প শুনতাম। আমরা একদিন ভারতবর্ষে যাব। সকলকে বলতাম, আমরা বাঙালী মেজদির কাছে শোনা দেশের কথা কিকুয়ুদের বলতাম।

তাঁরা বলতেন তাঁদের বাপঠাকুরদার রাজ্যের বিস্ময়কর কাহিনী। মনে আছে একদিন বলেছিলেন—"তারপর দলে দলে সাদা মানুষ এসে" কেমন করে ওদের গ্রামের চারদিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিল। হাঁটু গেড়ে বসে চোখে হাত দিয়ে চোখে দেখাতেন কীভাবে তারা পুড়ে মরেছিল। আমরা যেন ছবির মতো সেই দৃশ্য মনে মনে দেখতাম। তাদের প্রতি শৈশবের প্রগাঢ় সহানুভূতি আজও অনুভব করি। আমাদের মা ছিলেন বড় লোকের মেয়ে। তাই আভিজাত্যের অহঙ্কার তাঁকে সাধারণ মানুষদের থেকে আড়াল করে রেখেছিল। নির্দয়ভাবে খাটিয়ে নেওয়া ছাড়া ওদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা সারাদিন কাজ করে, আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসে গান ধরতেন সন্ধ্যার পর। তাঁদের বিলম্বিত তালের অদ্ভুত সুর আমাদের আকর্ষণ করত। শার্সীর ভিতর দিয়ে দেখতাম খোলা আকাশের তলায় আগুন জ্বেলে রান্না চাপিয়েছে। রাঙা আলু আর ভুট্টার আটাসিদ্ধ। শেষের খাবারটির নাম ছিল 'উজি'। ভুট্টাকে বলত 'মহিণ্ডি' অর্থাৎ ভারতীয়। একদিন ছুটির দিনে অপরাহ্নে বাবা বাগান পরিচর্যা করেছিলেন। আমরা কাছাকাছি খেলা করছিলাম হঠাৎ ধুপধাপ শব্দ শুনলাম, তারপর দেখা গেল দুটি প্রকাণ্ড নীল গাই আমাদের কম্পাউণ্ডের তারে জড়িয়ে বসে পড়েছে। আমরা এগিয়ে গেলাম। দেখি অঙ্গ তাদের ক্ষতবিক্ষত। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল, কাভিরণ্ড আস্‌কারী, অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া হ্রদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসী জাতীয় পুলিশ কর্মচারী—এসে তারের ভেতর থেকে শিং ছাড়িয়ে দিল। সকলে বলাবলি করতে লাগল জঙ্গলে সিংহের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে। আমরা নতুন একটা ব্যাপারে খুব উত্তেজিত হয়েছিলাম, কারণ তখনও আমরা শহর ছেড়ে বাইরে বার হইনি। জন্তু-জানোয়ারের ডাক ও ওদের সম্বন্ধে গল্প শুনতাম দূর থেকে।

আমাদের সেজদা স্কুল থেকে ফিরে খেলতে যেতেন। সন্ধ্যায় দরজা বন্ধ করে ধ্যান করতেন। হাঁটুর কোনো দোষে পা মুড়ে বসতে পারতেন না বলে পায়ের ওপর গোটাকতক বালিশ চাপাতেন। আমরা তিনজনে তাঁর ফরমায়েস মতো বালিশ এনে জড়ো করতাম। ধ্যান শেষ করে তিনি টেবিলে বসে ঘাড় হেঁট করে পড়া শুরু করতেন। তখন তাঁর বয়েস ছিল মাত্র তেরো বছর। কিন্তু আমাদের ধারণায় মস্ত বড়। মেধাবী বলে স্কুলে, বাড়িতে তাঁর সুখ্যাতির সীমা ছিল না। বাবা সকালে উঠে খোকা বলে ডাকতেন। সে এসে দাঁড়ালে তবে চোখ খুলতেন। এই প্রসঙ্গে একটা বেশ মজার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে।

স্বপনপরীর কল্যাণে দেখলাম দলে দলে ছেলেমেয়েরা পকেট ভর্তি করে লজেন্স বিস্কুট নিয়ে চলেছে ; জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় পেলে ?' তারা আঙুল তুলে দেখাল, ওইখানে একটা লোক দু-সেণ্টে অনেকখানি করে দিচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি দু-সেণ্ট নিয়ে বিস্কুটওয়ালার কাছে উপস্থিত হয়েছি। দেখি চাপদাড়ি-ওয়ালা মোটা কালো একজন লোক একটা বিরাট সিন্দুক রেখে 'চাই লজেন্স' 'বিস্কুট' বলে হাঁকছে। আমি যেমন তার হাতে সেণ্ট দিলাম, সে মস্ত চাবির গোছাটা সিন্দুকে ঢোকাবার আগে হঠাৎ চাবির রিং আঙুলে গলিয়ে 'আঃ আঃ' করে চেঁচিয়ে উঠতে রিংটা টিং টিং করে বেজে উঠল। আমার ঘুম ভেঙে গেল, চেয়ে দেখি বাবা 'খোকা' বলে ডাকছেন। সন্দেশ বিস্কুটগুলো হাতে এসেও এল না, এ পরিতাপের কথা আমি আজও ভুলতে পারি না।

বাবা যখন সকালে বিছানায় বসে অফিসের কাজ করতেন আমরা তখন ঘাড়ে-পিঠে ঝাঁপিয়ে তাঁকে বিব্রত করতাম। বাবা বলতেন 'ছিঁয়া ছাড়ো'। ছায়াকে ছিঁয়া বলছেন বলে আমরা হাততালি দিয়ে হেসে উঠতাম। আমাদের দৌরাত্ম্য থামত, যখন বাবা বলতেন, 'ছবি দেখগে যাও'। তিনখানি বিরাট বই ছিল—আমাদের নাড়াবার সাধ্য ছিল না, সামনে পেতে দিলে আমরা পাতা উল্টে দেখে যেতাম। প্রথম পাতাটি দাবি করত শ্যামল, কারণ সে ছিল আমার চেয়েও এক বছরের বড়, তার পরের পাতার ঘর-বাড়ি-মানুষ পড়ত আমার ভাগে, তারপর সুনীলের। ক্রমান্বয়ে চলত ছবি দেখা—কার পাতায় কত ঐশ্বর্য, রাজ্যাভিষেক, যুদ্ধবিগ্রহ তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলত। আজও চোখের সামনে ছবিগুলি ফুটে উঠে।

আমাদের বাড়ি ঝাড়ামোছা আরম্ভ হল। বিলেত থেকে কোনো বিখ্যাত সাহেব আসছেন বাবার সঙ্গে দাবা খেলতে। কাচের সরঞ্জাম, দামী দামী পর্দা, টেবিল ক্লথ এনে ঘর সাজানো হল। মহা আড়ম্বর করে ডিনার দেওয়া হল। আমাদের টুঁ শব্দ করলে কেটে ফেলা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। নূতনত্বের আভাসে আমরা কটা দিন শান্ত হয়েই রইলাম। কিছুদিন পরে বাবা পুরস্কার পেলেন, ব্যাগের মধ্যে হাতির দাঁতে তৈরি দাবার ছক, ঘুঁটি, কৌটোর মধ্যে হাতির দাঁতের দাবার ছক খেলবার সুন্দর ঘুঁটি আর মেডেল। বাবা অফিসে বিশিষ্ট সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতীয়দের ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও মিষ্ট ব্যবহারে সমস্ত দেশের লোকের চিত্ত জয় করেছিলেন। স্বদেশী নিষ্ঠায় বাবা আদর্শ পুরুষ ছিলেন। গলাবন্ধ কোটের

সঙ্গে গোল টুপি পরতেন, বাড়িতে আসনে বসে ভাত খেতেন, ছেলেদের হ্যাট বা নেকটাই পরবার হুকুম ছিল না। বাবার কাছে শুনতাম, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, সকল দেশের চেয়ে বড়, আমাদের ঠাকুরমা সব চেয়ে ভালো, তাঁকে দূর থেকেও ভক্তি করতে হয়। রাত্রে শুয়ে রামপ্রসাদী ও বাউল গান গাইতেন, শুনতে ভালো লাগত, মানেগুলো অবশ্য নিজেই ঠিক করে নিতাম, যেমন "ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা পাক দিতেছে অবিরত"—অর্থ, গাধাকে গাছে একটা লম্বা দড়িতে বেঁধে পাক দেওয়াচ্ছে, তাই গাধা বলছে। "ভজলে সীতারাম দিলকা ম্যায়লা সাফ কর ভাই তব্‌তো হয়েগা কাম"—অর্থ, সীতারাম নামধারী মেথরকে বলা হচ্ছে, নর্দমাটা ভালো করে সাফ কর।

বাবা মুর্গির মাংস রাঁধতেন, মা ছুঁতেন না মুর্গি, তাই রান্না হলে বাইরে বসে খাওয়া হত। অথচ ইশফকাকা জঙ্গলের পাখি শিকার করে আনলে মা রান্না করতেন, অবশ্য বাইরের বারাণ্ডায় বসে। ইশফকাকার একটা বিরাট কুকুর ছিল। আমাদের একটা ছোট কুকুর ছিল—নাম দিয়েছিলাম 'পপি', বাবা নাম দিয়েছিলেন 'ভৈরব'—একটা পোষা বেড়াল ছিল, তার নাম 'লক্ষ্মী', মায়ের কাছে ছিল তার আদর আর পপিকে মা ছুঁতেন না। আমাদের সকলকার কাছে ছিল তার আদর। সেজদাদার কাছে হত তার শিক্ষা।

মেজদা বন্ধুদের নিয়ে মাঝে মাঝে শিকার করতে যেতেন নাইরোবি নগরতলীর বাইরে—পাখি ছাড়া কদাচিৎ একটা হরিণ মারা হত। কাছাকাছি জেব্রা, নীল গাই, অষ্ট্রিচ মিলত অজস্র, কিন্তু লাইসেন্স নেওয়া ছিল না মারবার। যাঁরা দল বেঁধে সাফারি করে শিকার করতে যেতেন তাঁদের মধ্যে আমাদের পিসেমশাই রমনকৃষ্ণ মিত্র, ইশফআলী-কাকা আর আশুতোষ সরকার ছিলেন প্রধান। পিসেমশাই সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনতাম। আমাদের পাশের বাড়ির একজন গোয়ানিস শিকারী কালো কেশরওলা এক বিরাট সিংহ মেরে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হলেও জ্ঞান হয়নি আর। বেঘোর জ্বরে মারা পড়েন। শিকারের গল্প শুনতে আমরা বড় ভালবাসতাম। আশুবাবু মোম্বাসায় থাকতেন। হাসিঠাট্টা চেঁচামেচিতে বাড়ি সরগরম হয়ে থাকত; এমনি সময় ছিল না যে আমাদের বাড়ি অতিথি সমাগম হত না, কারণ নাইরোবি ছিল উগাণ্ডা যাওয়ার পথে, আর বাবার মেজাজ ছিল দরাজ।

বড়দিনের সময় ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউটে আমাদের স্পোর্টস্ হত। শ্যামল, সুনীল আর আমি প্রাইজ আর একটা করে সুন্দর রুমালে বাঁধা খাবার নিয়ে বাড়ি

আসতাম, আনন্দের সীমা থাকত না। আমাদের খেলনা মায়ের হাতে গেলে আলমারির ভেতর উঠে যেত। হাত দেবার অধিকার থাকত না। শুধু চেয়ে দেখাই সার হত। আমার আটপৌরে খেলনা ছিল ন্যাকড়ার পুতুল, দুপুর বেলা মেজদিও অবসর পেলে খেলত আমার সঙ্গে। বিকালে আমি বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেতাম, শ্যামল ও সুনীল ক্রিকেট খেলত বন্ধুদের সঙ্গে। আমরা স্লেট নিয়ে ছবি আঁকা খেলতাম, শ্যামলের ছবি হত হাসির ; মেজদি স্লেটে সুন্দর ঘর-সংসারের ছবি আঁকত। দুঃখের বিষয় আমাদের আর্টের কদর কেউ বুঝলেন না।

একদিন বাথরুমে শ্যামল আছাড় খেয়ে সাংঘাতিকভাবে আহত হল, দাঁত ভেঙে, ঠোঁট কেটে, চিবুকের চামড়া ছিঁড়ে একসা। রক্ত দেখে আমরা ভয়ে অস্থির। লোক ছুটল বাবাকে অফিসে খবর দিতে। তিনি ডাক্তার নিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর কদিন তার আদরও অত্যধিক বেড়ে গেল। আমাদের মধ্যে যার যখন অসুখ হত—বাকী দুজনের তখন হিংসের অবধি থাকত না। কারণ রোগী যতক্ষণ ইচ্ছে জিব বার করে ভেংচি কাটলেও তার প্রতিশোধ নেবার কোনো উপায় ছিল না, তার জন্য মায়ের আদর যেন উথলে পড়ত। সেই জন্যে আমরা অসুখ কামনা করতাম।

রবিবার দিন সকাল হতে দলে দলে সাহেব-মেম গীর্জা যেতেন আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে। এ দিনটা আমাদের কাছে ভারী মজা লাগত। বাবা একটা খুরপি নিয়ে কাজ শুরু করতেন বাগানে। আমরা ঝাঁজরি-দেওয়া বালতি নিয়ে জল দিতাম গাছে। বাগানের বেড়ার ধারে পথের পাশে বড় বড় গাছে আটা বার হয়ে থাকত, আমরা হাত বাড়িয়ে ভেঙে খেতাম। বেশ মিষ্টি লাগত। বাবার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু মা দেখতে পেলে খুব বকতেন। পাখি ও প্রজাপতির অজস্র রঙের সঙ্গে ফল, ফুল ও পাতার, আকাশ ও মেঘের বর্ণ মিশে অদ্ভুত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করত।

এক রকমে কেটে যাচ্ছিল আমাদের শৈশবের মধুর দিনগুলি—একটা পরিবর্তনের সময় এগিয়ে এল। শুনলাম আমাদের ভারতবর্ষে যাওয়া হবে। দেশ দেখার আনন্দে আমরা নেচে উঠলাম প্রথমে, পরে বাবাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবে মনে কষ্ট হতে লাগল। এর আগে আমরা কখনও বাবার কাছছাড়া হইনি, সম্পূর্ণভাবে মায়ের কাছে থাকাটা আমাদের পক্ষে ভীতিপ্রদ ছিল। সেজদাদার বন্ধুরা বেদনায় ম্রিয়মান। স্কুল থেকে তাঁর বিদায় সংবর্ধনা করা হল। তিনি একরাশ দামী বই নিয়ে বাড়ি এলেন, কিন্তু তাঁর চোখে জল

পড়তে লাগল। যথা সময়ে আমরা স্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম, এরপর আরম্ভ হল মায়ের অঝোরে কান্না, বাবার গম্ভীর মুখ, আমরা বিস্ময় বিমূঢ়; পাপি চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে করুণ দৃষ্টিতে দেখছে। একটা অস্বস্তিকর আবহওয়ার মধ্যে আমরা ট্রেনে উঠে বসলাম।

পাহাড় পথে বন্ধুর ভূমির ওপর রেল লাইন পাতা। দুধারে জঙ্গল, ঘড়াং ঘড়াং করে গাড়ি চলেছে। আমরা বিপুল বিস্ময় ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে দেখছিলাম, কোথাও হরিণের দল আপন মনে ঘুরছে। কোথাও অষ্ট্রিচরা আপন দলের সঙ্গে বেপরোয়া ঘোরাফেরা করছে, কেউ বা বনেদীচালে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের অদ্ভুত বাষ্পযানের দিকে চেয়ে আছে। আকাশছোঁয়া বড় বড় গাছের মাথায় যেন সোনালী রোদমাখা সবুজ গালিচা, দলে দলে জেব্রা চরছে, দলবদ্ধ জিরাফ বিরাট গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে। প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য চিরন্তনের ছাপ রেখে গেল তিনটি শিশুর মনে তাদের বয়স তখন পাঁচ, ছয় ও সাড়ে সাত। তারপর অবশ্য কয়েক মাসের মধ্যে ফিরে যাই আফ্রিকায় সেই একই দৃশ্য দেখতে দেখতে, কিন্তু প্রথম দেখার আনন্দ-বিস্ময় ভোলা যায় না। নামতে হয় প্রায় ছয় হাজার ফিট উঁচু সমমালভূমি থেকে সমুদ্রতীরে। মধ্যে পড়ে ঘনবদ্ধ অরণ্যানী। দিগন্তবিস্তৃত পাটকেল রঙের তৃণপ্রান্তর, ছাতার মত ছড়ানো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গাছ আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে
বাংলা দেশে শেক্সপীয়র চর্চা

কার্তিক লাহিড়ী

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও শেক্সপীয়র—এই নির্বাচনের মধ্যে মনীষী কার্লাইল শেক্সপীয়রের স্বপক্ষে রায় দিয়েছিলেন। বস্তুত, কার্লাইলের রায় সমস্ত সুস্থ মানুষের সিদ্ধান্ত। যে-কোন ব্যক্তি দ্বিধাহীন চিত্তে পর-রাজ্য গ্রাসের বৃত্তিকে সোচ্চারে নিন্দা করবেন। অবশ্য কার্লাইল যে সময় তাঁর বিপ্লবী সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন, ব্রিটেনে তাঁর অভিমতের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আজ তা জানবার কোনও সহজ উপায় নেই। তবু নিঃসন্দেহে তিনি অন্তত ইংরেজ জাতিকে এক মস্তবড় গ্লানির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। আর আমরাও কার্লাইল সাহেবকে এ মন্তব্যের জন্যে কোনও দিন বিস্মৃত হব না।

ভারতবর্ষে ইংরেজ-অনুপ্রবেশের বহুবিধ সুফল এবং কুফলের মধ্যে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হতে পারি, ইংরেজেরা আর যাই করে থাকুক, ভারতবর্ষে আধুনিকতার সূত্রপাত তারাই ত্বরান্বিত করেছে। অনেক ভাঙা-গড়া, তর্ক-বিতর্কের মধ্যে যেদিন ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা প্রচার করা হবে স্থির হল সেদিন বণিক ইংরেজ আপন অলক্ষ্যে বিশ্বের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল ভারতবাসীর সামনে। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে এসে আমাদের জগৎ গেল বিস্তৃত হয়ে। এর ফলে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি সুস্থ হয়েছে কিনা অথবা আমাদের ধ্যানধারণা বিকৃত হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিতর্ক ছাপিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন একের পর এক ইংরেজ কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকার। এঁদের রচনা পাঠ করে, এঁদের সঙ্গে মনন ও মনোজগতে আত্মীয়তার সন্ধান পেয়ে আমরা অনেক ক্ষতি স্বীকার করলাম। এখন যে বিশ্ববোধের স্বপ্ন দেখি তাতে এঁদের দান নেহাত কম নয়। বরঞ্চ এই সব কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিতি না ঘটলে বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগ আরো দীর্ঘতর হত বলে মনে হয়।

শেক্সপীয়র এমনই এক সম্পদের মধ্যমণি। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ বিশেষত ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী শেক্সপীয়রকে আপন করে

নিয়েছিলেন। খানিকটা উপরে উঠে আসার আকাঙ্ক্ষা এ প্রবৃত্তির জন্ম দিয়েছিল। সংস্কৃতি ও সাহিত্য-জগতে ইংলণ্ড তখন ভারতবর্ষ থেকে এগিয়ে। সেজন্য তাদের সঙ্গে পা-চালানো অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। আদব-কায়দা অনুকরণ করা হল, কথায় কথায় ইংরেজী বুকনি ঘুরল মুখে মুখে। কিন্তু কোথায় যেন ছেদ পড়তে থাকল। শিক্ষিতরা মুখ ফেরালেন সাহিত্যের দিকে এবং যে-কোনও সাহিত্যের চূড়াই যখন প্রথমে সহজ অথচ স্বচ্ছ দৃশ্য তখন বাঙালী-মন স্বভাবত: ঝুঁকেছিল শেক্সপীয়রের দিকে। রিনাইসান্সের অন্যতম প্রতিভূ রূপে শেক্সপীয়র আবির্ভূত হয়েছিলেন ইংরেজী সাহিত্যে এবং আশ্চর্যের বিষয় বাংলা দেশে আধুনিকতা বা নব-চেতনা সঞ্চারের যুগে শেক্সপীয়র-রচনাবলী উপজীব্য হল শিক্ষিতদের। প্রথম দু-দশক বাদ দিয়ে সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে শেক্সপীয়র-চর্চা অবিচ্ছিন্ন ছিল কোনও না কোনও উপায়ে। প্রধানত অধ্যাপনা, আবৃত্তি ও অভিনয় এবং শেক্সপীয়র নাটক অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা দেশে শেক্সপীয়র-চর্চা পুষ্টিলাভ করেছিল। এছাড়া শেক্সপীয়র-প্রভাবিত নাটকের অজস্রতা যে কোনও পাঠককে বিমূঢ় করবে। সেজন্য শেক্সপীয়র-প্রভাবিত নাটকের আলোচনা আপাতত বাদ দিয়ে প্রত্যক্ষ শেক্সপীয়র-চর্চায় মনোনিবেশ করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত।

শেক্সপীয়র অধ্যাপনা :

আমাদের দেশে কলেজী শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হল শাসকদের সুবিধার্থে। ইংরেজ সাহেব এবং সিভিলিয়ানদের প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষিত করাই ছিল এই কলেজের উদ্দেশ্য। শ্রীরামপুর কলেজ এ-বিষয়ে আরও একটু এগিয়ে ছিল। অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচার করা তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তাই প্রথমদিকে শিক্ষাব্যবস্থার আসল স্বরূপ যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর মোটামুটিভাবে ইংরেজী-শিক্ষার প্রকৃতি জানা গেল। ১৮১৭ সাল সেদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত সালের ২০ জানুয়ারী হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজের সঙ্গে সঙ্গে বন্যার মত উদ্দাম হয়ে উঠল বাংলার নব-চেতনা ও সংস্কৃতি। বস্তুত বাংলার সাংস্কৃতিক নব-চেতনার সঙ্গে হিন্দু কলেজ অবিচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত।

হিন্দু কলেজেই প্রথম ইংরেজী ভাষা আবশ্যিক বিষয় হিসাবে তালিকাভুক্ত

হয় এবং দশবছরের মধ্যে উচ্চশ্রেণীতে শেক্সপীয়র-নাটকাবলীর পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়।[১] শুধুমাত্র পঠন-পাঠনের মধ্যে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের জ্ঞান সীমিত ছিল না ; আলোচনা, বিতর্কের ভেতর দিয়ে তাঁরা এক সাহিত্যিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন, এই আবহাওয়া সৃষ্টির মূলে ছিলেন হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও। উনিশ বছরের একটি তরুণ চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক, কিন্তু আশ্চর্য তাঁর প্রতিভা ! এই তরুণ চুম্বকের মত আকর্ষণ করলেন সমস্ত ছাত্রদের। তর্কেবিতর্কে, স্বাধীন চিন্তা ও মতামত প্রকাশে ছাত্ররা কোনও দিন কুণ্ঠিত হয়নি শিক্ষক ডিরোজিওর কাছে। ডিরোজিও তাদের আপন করে নিয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'। এ সভার সভাপতি ও কর্ণধার স্বয়ং ডিরোজিও। বক্তারা ছিলেন তাঁর শিষ্য—ছাত্রের দল। অবশ্য ডিরোজিওর শেক্সপীয়র অধ্যাপনা সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা নেই, তবু তিনি যে এক উন্নত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জগতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।[২] পরবর্তী সময়ে, ডিরোজিওর জন্য অন্যান্য শিক্ষকদের পথ প্রশস্ত হয়েছিল একথা অনস্বীকার্য ; তাঁর মত শিক্ষক অধুনা দুর্লভ। অধ্যাপনা-ক্ষেত্রে এই সাফল্য ব্যবহারিক জীবনে তাঁর দুঃখের কারণ হয়েছিল, এমনকি এই জন্যেই তাঁকে শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল। বাংলার নব-চেতনা জাগরণের ইতিহাসে ডিরোজিও আপন গুণে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে আছেন। তাঁর দান অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব।

এর পর এলেন ডি. এল. রিচার্ডসন। তিনি ডিরোজিওর ধারাকে আরো উদ্দীপ্ত, প্রবহমান করলেন। রিচার্ডসন ছিলেন কবি-সাহিত্যিক। আবার মজ্জায় মজ্জায় ছিল শিক্ষকতার বীজ। শোনা যায়, মেকলে সাহেব তাঁর ওথেলো পড়া শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। একসময় বলেওছিলেন, "I may forget everything about India, but your reading of Shakespeare—never."

১। The Scholars of the Hindu College had to study two languages of which English was compulsory, and in the next ten years the study of English made great strides. In 1827, the top classes were reading 'Pope's Poems,' 'The Vicar of Wakefield,' 'Paradise Lost,' and 'Shakespeare's Plays.'

(Bengal's Love of Shakespeare—Niarendranath Roy, Page 2)

২। অবশ্য ডক্টর জন গ্রান্ট ডিরোজিও-র পরীক্ষার পর লিখেছেন—"A boy of the name Derozio gave a good conception of Shylock···"। ছাত্রাবস্থায় ডিরোজিওর শেক্সপীয়রে দখল ছিল একথা জানা যায়।

এ মন্তব্য যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। শেক্সপীয়র-অধ্যাপনায় তাঁর মত খ্যাতি খুব কম পণ্ডিত ও অধ্যাপক অর্জন করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও লিখেছেন, "একদিকে যুবক বয়স্তদিগের মধ্যে এইরূপে দেশীয় রীতি-বিরুদ্ধ আচরণ ওদিকে কালেজ গৃহে ডি. এল. রিচার্ডসন সাহেবের শেক্সপীয়র পাঠ। এরূপ শেক্সপীয়র পড়িতে কাহাকেও শোনা যায় নাই। তিনি শেক্সপীয়র পড়িতে পড়িতে নিজে উন্মত্তপ্রায় হইয়া যাইতেন এবং ছাত্রগণকে মাতাইয়া তুলিতেন।"[৩] নিঃসন্দেহে রিচার্ডসন সাহেব তৎকালের বিখ্যাত শেক্সপীয়র-পণ্ডিত ও শিক্ষক ছিলেন। তিনি ডিরোজিও-র মত শিক্ষায়তনে স্বাধীন চিন্তা ও সাহিত্যিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন। মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ বঙ্গের কৃতি সন্তান তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন। কবি মধুসূদন তাঁরই অনুপ্রেরণায় ইংরেজী-কবিতা রচনা শুরু করেন এবং হিন্দু কলেজের এক কক্ষে ঘোষণা করেন, শেক্সপীয়র ইচ্ছা করলে নিউটন হতে পারেন কিন্তু নিউটন নৈব নৈব চ।

হিন্দু কলেজের পর প্রেসিডেন্সি কলেজে শেক্সপীয়র-অধ্যাপনার মান ইউরোপের যে-কোনও শিক্ষায়তনের সঙ্গে তুলনীয়। অধ্যাপক ই. এম. পার্সিভ্যাল রিচার্ডসন-ধারাকেই পুষ্টিসাধন করেছিলেন। চট্টগ্রামে কোনও এক খ্রীষ্টান পরিবারে তাঁর জন্ম। ইংলণ্ড থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম-এ পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষকতার কার্যে ব্রতী হন। শেক্সপীয়রকে যথাসম্ভব সহজ, সরল করে পড়ানোর ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। শেক্সপীয়র পড়াতে পড়াতে ছাত্রদের সামনে এক নতুন জগতের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দিতেন। ছাত্ররা পার্সিভ্যাল সাহেবের অধ্যাপনায় অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি শেক্সপীয়র-এর বহু নাটকের সটীক সম্পাদনা করেছেন। ১৯১১ সালে পার্সিভ্যাল অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ শেক্সপীয়র-অধ্যাপনার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। স্বর্গত প্রফুল্লচন্দ্রের অধ্যাপনার কথা এখনও তাঁর ছাত্রদের মুখে মুখে শোনা যায়।

স্কুল-কলেজে শেক্সপীয়র-আবৃত্তি ও অভিনয় :

ডিরোজিও-র শেক্সপীয়র-অধ্যাপনা সম্পর্কে আমরা কোনও সংবাদ পাই না, একথা আগেই বলেছি। তবু তাঁরই একক প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজে সাংস্কৃতিক ও

৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। পৃঃ ১৫৭।

সাহিত্যিক জগৎ গড়ে উঠেছিল। তিনি ১৮২৮ সালের মার্চ মাসে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এর আগে অবশ্য হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা ইংরেজী আবৃত্তি ও অভিনয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।[৪] কিন্তু ডিরোজিও-র আগমনে শেক্সপীয়র-আবৃত্তি ও অভিনয়ের প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। সংবাদপত্র থেকে দু-তিনটি সংবাদ পরিবেশন করলে মন্তব্যটির যাথার্থ নির্ণীত হয়।

১। "অপর শেক্সপীয়র নামক ইংগ্লণ্ডীয় একজন কবিকৃত কাব্যের কএক প্রকরণ কতিপয় যুবচ্ছাত্রেরা উৎকৃষ্টোচ্চারণ পূর্ব্বক মুখস্থ আবৃত্তি করিল। কিন্তু বোধ হইল যে হরিহর মুখোপাধ্যায় নামক এক বালকের আবৃত্তিতে সকলে বিশেষরূপে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।" (সমাচার দর্পণ। ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৩০। ১০ ফাল্গুন ১২৩৬॥)

২। "হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রের দিগকে যে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ গত শনিবার টৌন হালে হয় তাহার বিবরণ আমরা ইণ্ডিয়া গেজেট নামক সম্বাদপত্র হইতে পাইলাম।...ইহাতে আলেকসান্দার ও দস্যু, আকিলস উআর্নিং, মর্চাণ্ট আফ বেনিস প্রভৃতি অভিনীত হয়।

॥ মর্চাণ্ট আফ বেনিস ॥—প্রথম আক্ট প্রথম সিন—

সৈলক—কৈলাসচন্দ্র দত্ত

টুবাল—রামগোপাল ঘোষ

সলাণিয়ো—তারকনাথ ঘোষ

সলারিণো—ভুবনমোহন মিত্র

পিটরো—তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়

তীর্থযাত্রী ও মটর—হরিহর মুখোপাধ্যায়।

ইহারদের মধ্যে সৈলকের বেশধারী কৈলাস দত্ত ও যাত্রী ও মটরের বিষয়ক পিটর পিণ্ডরের কাব্য আবর্তক হরিহর মুখোপাধ্যায় যেরূপ আবৃত্তি করিলেন তাহাতে সকলেই আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন। সেক্সপিয়র ও ওয়ালকট সাহেবের রচনার ভাব বুঝিয়া যে হিন্দু যুবলোকেরা এমত উত্তমরূপে আবৃত্তি করিলেন ইহা অত্যাশ্চর্য।" (সমাচার দর্পণ। ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৩১। ৯ ফাল্গুন ১২৩৭)

৪। "তৎপরে শ্রীশ্রীযুতের সম্মুখে বালকেরা ইংলণ্ডীয় নাটকশাস্ত্রের অনুসারে বাক্কৌশল করিতে লাগিল তাহাতে তাহারা ইংরেজি ভাষা এমত উত্তমরূপে উচ্চারণ করিল যে সকলেই আশ্চর্য জ্ঞান করিল।" সমাচার দর্পণ, ২৬শে জানুয়ারী ১৮১৮। ১৪ মাঘ ১২৩৪॥

১৮৩১ সালের এপ্রিল (?) মাসে ডিরোজিও শিক্ষকতার কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৩৫ সালে ডি. এল. রিচার্ডসন হিন্দুকলেজে এসে প্রবেশ করেন কিন্তু এই দুই মহারথীর অবসর এবং আগমনের দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও হিন্দুকলেজে শেক্সপীয়র-চর্চায় কোনও রকম ভাঁটা পড়েনি ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। স্কুল এবং কলেজে শেক্সপীয়র-চর্চাকে জীবিত রাখার সকল রকম প্রচেষ্টা শিক্ষক এবং ছাত্ররা করেছেন—

"পুরস্কার বিতরণ। গত শুক্রবার [৭ই মার্চ্চ] টৌন হালে হিন্দু কালেজের ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা গেল। ··ইহার পর নাট্য বিষয়ক আবৃত্তি হইল—

ষষ্ট হেনরী ও গ্লষ্টর—

ষষ্ট হেনরী—ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল

গ্লষ্টর—মধুসূদন দত্ত।"

(সমাচার দর্পণ। ১২ মার্চ ১৮৩৪। ৩০ ফাল্গুন ১২৪০)

গ্লস্টরের ভূমিকায় মধুসূদন দত্ত যে কবি মধুসূদন দত্ত—স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এমন সন্দেহ করেছিলেন; কিন্তু এ সন্দেহ নিরসন করার মত উপযুক্ত উপাদানাভাবে সে-বিচার পরিত্যক্ত হল।

'ডি-এল-আর' (রিচার্ডসনকে তাঁর প্রিয় শিষ্যরা এই সংক্ষিপ্ত নামে আহ্বান করতেন। মধুসূদনের পত্রাবলীতে তার নিদর্শন মেলে) এর আগমনে এক অদ্ভুত সাড়া পড়ে যায়। ডি-এল-আর ছিলেন নিজে কবি, তার উপর জাত-শিক্ষক। ছাত্রদের কবিতা-চর্চার ব্যাপক সূত্রপাতের মূলে তিনিই ছিলেন—একথা আগেই বলেছি। তাঁর আগমনে যে সাংস্কৃতিক জগৎ বিস্তৃত হবে তা নিঃসন্দেহে মন্তব্য করা যায়। রিচার্ডসন-প্রতিভা শুধুমাত্র অধ্যাপনার মধ্যে সীমিত ছিল না, ছাত্রদের আবৃত্তি, অভিনয় যাবতীয় সৃষ্টিশীল কর্মে ছিল অদম্য উৎসাহ। বলা যায়, রিচার্ডসনের বহুশিষ্য তাঁরই অনুপ্রেরণায় প্রতিভার উচ্চশীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণের সময় আবৃত্তি ও অভিনয়ের রেওয়াজ বহুদিন থেকে চলে আসছিল। ক্রমে ক্রমে নানা উপলক্ষে আবৃত্তি-অভিনয়ের ব্যবস্থা হতে থাকে।

(ক) "১৮৩৭ সনের ২৯শে মার্চ্চ কলিকাতার গবর্মেণ্ট হাউসে হিন্দু কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ হয়। এই পুরস্কার বিতরণের সময় ছাত্রেরা শেক্সপীয়র হইতে অনেকগুলি অংশ আবৃত্তি করে॥" [৫]

৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(খ) "…তৎপরে অধোলিখিত বিবিধ গ্রন্থধৃত প্রকরণ সুচারুরূপে শিষ্যগণ বক্তৃতা করণে সভ্যসকল মহানন্দিত হইলেন। তদ যথারূপক।—

গুলাবপুষ্প। শ্রীভুবনমোহন ঠাকুর॥ খদ্যোতকীট। শ্রীমোহন মুখুয্যে॥…

…হেনরী পঞ্চম রাজার বক্তৃতা তাঁহার সেনাপতি। শ্রীশ্যামাচরণ বসু। কিং রিচার্ড রাজার দুর্গে আত্মকথন। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসু…হেমলেটের আত্মকথন নিধন বিষয়ে। শ্রীঅভয়াচরণ বসু।" (সমাচার দর্পণ। ৫ই মে ১৮৩৮। ২৪শে বৈশাখ ১২৪৫)

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শেক্সপীয়র আবৃত্তি ও অভিনয় সীমাবদ্ধ থাকল না। ধীরে ধীরে অন্যান্য বিদ্যায়তনে শেক্সপীয়ার আবৃত্তি ও অভিনয়ের চর্চা আরম্ভ হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই অগাস্ট বটতলায় ডেভিড হেয়ার একাডেমির প্রতিষ্ঠা হয়।

"১৮৫৩ সনে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে সেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' নামক নাটক অভিনীত হয়। ১৮৫৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ডেভিড হেয়ার একাডেমীর ছাত্রদের দ্বারা এই নাটকের প্রথম অভিনয় ও ২৪ই ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় অভিনয় হয়।" ৬

ছাত্রদের এ অভিনয় যে অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল সে সংবাদ প্রচার করেছে সংবাদ প্রভাকর :

"গত শুক্রবার সন্ধ্যার পর হেয়ার একাডিমী নামক বিদ্যালয়ের পুনর্ব্বার ইংলণ্ডীয় মহাকবি সেক্সপীয়র সাহেব প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের, মারচেন্ট অফ ভিনিস নামক নাটকের অনুরূপ দেখাইয়া বহু লোককে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, ঐ সময়ে বিদ্যালয়ের গৃহে প্রায় ৬০০।৭০০ এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগী, কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য লোক এবং সম্ভ্রান্ত সাহেব ও বিবিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই উক্ত ছাত্রগণের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।…কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ ক্লিঙ্গার ডেভিড হেয়ার একাডেমীর ছাত্রদিগকে সেক্সপীয়রের নাটক অভিনয় শিক্ষা দিয়াছেন।" (সংবাদ প্রভাকর। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৩)

কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ ক্লিঙ্গার অত্যন্ত উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। অভিনয়ে তাঁর অসাধারণ পটুতা ছিল। পরিচালনা ও অভিনয় শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শিক্ষায়তন ক্লিঙ্গারকে আহ্বান জানাতেন। ডেভিড হেয়ার একাডেমীর তিনি নট-পরিচালক ছিলেন। এমনকি ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতেও

৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি ছাত্রদের অভিনয় শিক্ষা দিতেন। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্ররা যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। তাঁদের উৎসাহ ও প্রেরণা আমাদের সর্বদা স্মরণীয়। স্কুলের ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলেছেন এবং আশা, সেই চাঁদা দিয়ে তাঁরা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করবেন।

"আমরা শুনিতে পাইলাম যে, ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া আটশত টাকা সংগ্রহ করিয়াছে এবং ঐ টাকা দ্বারা সেক্সপীয়রের নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে একটা নাট্যশালার আয়োজন হইতেছে।" (বেঙ্গল হরকরা। ৭ই এপ্রিল ১৮৫৩)

শেক্সপীয়র-প্রীতি যে তাঁদের কত গভীর ছিল তার আর প্রমাণের দরকার হয় না। তৎকালে ছাত্ররা যেভাবে সেক্সপীয়রকে আপন করে নিয়েছিলেন, আজ তা ভাবতে অবাক লাগে। এইসব ছাত্রদের নাম আজ অনেকেই জানেন না, তবু এঁদের প্রচেষ্টা যে কত মহৎ সেইটুকু অনুভব করতে পারলে আমরা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দিতে পারব বলে মনে হয়।

রঙ্গালয়ে শেক্সপীয়র অভিনয় :

আমাদের দেশে নাট্যশালার সূত্রপাত বিদেশী লেবেডেফের হাতে। এবং আরও আশ্চর্যের বিষয়, বাঙালী প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটন হয় শেক্সপীয়রের নাটক অভিনয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও বাঙালী দর্শক যাত্রা, কবিগান, হাফ-আখড়াই নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বিলেতী ধরনের রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার তাদের ধারণার মধ্যেও ছিল না। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষিত সমাজ রঙ্গমঞ্চের অভাব বিশেষ করে অনুভব করেন। সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা স্ব-আবাসে মঞ্চ নির্মাণ করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন। স্কুল-কলেজে অভিনয় আবৃত্তি এ ধরনের প্রচেষ্টার উৎস ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর নিজ আবাসে 'হিন্দু থিয়েটার' নামে এক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। 'হিন্দু-থিয়েটার' ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর প্রথম নাট্যশালা।[৭]

৭. "Baboo Prussono Coomar Tagore has fitted up a neat little stage in his house at Narkoldunga, where some young Hindoo gentlemen, admirably schooled in the histrionic art, exercise their talents for the amusement of their native and European friends who are admitted by invitation." (Calcutta Courier, 4th April, 1832)

১৮৩১ সনের ২৮শে ডিসেম্বর এই নাট্যশালার দ্বার উন্মোচন হয়। এখানে প্রথম শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার'-এর অংশ বিশেষ এবং উইলসন অনূদিত 'উত্তররামচরিত' অভিনীত হয়। প্রথম দিনের অভিনয়ে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে এডওয়ার্ড বায়ান, কর্নেল ইয়ং, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য প্রসন্নকুমারের নাট্যশালা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। সাধারণের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং নাটকগুলি ইংরেজীতে অভিনীত হওয়ার জন্য ধনাঢ্য ব্যক্তিদের যথেষ্ট পছন্দমত ছিল না বলে মনে হয়। কারণ তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন অর্ধশিক্ষিত। ফলে এ প্রচেষ্টায় ভাটা পড়তে বাধ্য। তবু প্রসন্নকুমারের প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্যান্য ধনী এবং বিলাসী ব্যক্তি স্ব-আবাসে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে থাকেন।

প্রসন্ন ঠাকুরের নাট্যশালার পর "সাঁসুসি" নাট্যশালায় সেক্সপীয়র নাটক অভিনয়ের সংবাদ পাই: "গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে সান্সশশি নামক থিয়েটারে যেরূপ সমারোহ হইয়াছিল বহুদিবস হইল ঐরূপ সমারোহ হয় নাই। ·· এতদ্দেশীয় নর্তক বাবু বৈষ্ণবচাঁদ অদ্য ওথেলোর ভঙ্গি ও বক্তৃতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। তিনি কোনরূপ ভীত অথবা কোন ভঙ্গি অবহেলা করেন নাই। তিনি চতুর্দ্দিগ হইতে ধন্য ২ শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার উৎসাহ এবং সাহস বদ্ধমূল হইয়াছে। যে বিবি ডেসডেমনা হইয়াছিলেন তিনিও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে।" (সংবাদ প্রভাকর। ২১ অগস্ট ১৮৪৮)

বৈষ্ণবচরণ আঢ্য সুদক্ষ্য নট ছিলেন এবং তিনি যে উত্তম অভিনয় করে-ছিলেন, নাটকটির দ্বিতীয়বার অভিনয়ে সে-কথা প্রমাণিত হয়। দর্শকগণ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁরা অভিনয় দেখে ক্ষান্ত থাকতেন না, অভিনেতাদের অভিনয়ের দোষক্রটি নিয়েও আলোচনা করতেন।

"অদ্য রজনী যোগে সান্সশশি থিয়েটারে সেক্সপিয়র কৃত ওথেলো নাটক পুনর্ব্বার হইবেক। এবং বাবু বৈষ্ণবচন্দ্র আঢ্য পুনর্ব্বার সাধারণ সমীপে প্রকাশমান হইবেন। গত নাটকের রজনী যোগে যাহারা থিয়েটারে গমন করিতে পারেন নাই অদ্য তাহারা গমন করণে কদাচ বিরত হইবেন না। বিশেষতঃ যে সকল মহাশয়েরা বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের বক্তৃতা ও অঙ্গ ভঙ্গিমায় দোষ দর্শন করিয়াছিলেন এবারে তাঁহার দিগের পক্ষে নৃত্যাগারে উপস্থিত হওয়া উচিত, কারণ অদ্য

তিনি সুচারু রূপে সমুদয় সম্পন্ন করিবেন তাহার কোন সংশয় নাই।" (সংবাদ প্রভাকর। ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮)

এরপর উল্লেখযোগ্য নাট্যশালা 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার'। ১৮৫৩ সানের ২৬শে সেপ্টেম্বর ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে 'ওথেলো' নাটক প্রদর্শিত হয।

"যে চরিত্র অত্যন্ত খারাপ ভাবে অভিনীত হইবে বলিযা আমরা আশংকা করিযাছিলাম, তাহাই অতিসুন্দর অভিনীত হইয়াছিল। বাবু প্রিয়নাথ দে যে ভাবে ইয়াগোর ভূমিকা অভিনয করেন তাহাতে এই চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয পাওয়া গেল।" (বেঙ্গল হরকরা। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩)

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে অভিনেতাদের অভিনয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল এবং এলিস নামে এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা শিক্ষাদান করতেন। যথাসম্ভব ত্রুটিহীন হযে ইংরেজী ভাষা শুদ্ধ উচ্চারণ আয়ত্ত করতেন অভিনেতা অভিনেত্রীগণ। এই নাট্যমঞ্চে 'Marchant of Venice' দুবার অভিনীত হয। প্রথমবার অভিনয হয ২রা মার্চ ১৮৫৪, দ্বিতীয়বার অভিনয় হয় ঠিক এর পনেরো দিন পরে ১৭ই মার্চ ১৮৫৪। দ্বিতীযবার অভিনযে গ্রীগ্ নামে একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা পোর্শিযার ভূমিকায অভিনয করেন। এরপর প্রায় বৎসরাধিক কাল থিযেটারটি বন্ধ থাকে। "১৮৫৫ সনের ১৫ই ফেব্রুযারী উক্ত নাট্যশালা আবাব সেক্সপিয়ারের" চতুর্থ হেনরী এবং হেনরী মেরিডি পার্কারের একটি প্রহসন দেখাইবাব জন্য উন্মোচিত হয়।[৮] নবীনচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র প্যাবীমোহন বসুর গৃহে "জোড়াসাকো থিযেটারে সেক্সপিযর নাটক অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮৫৪ সনের ৩বা মে জোঁড়াসাকো নাট্যশালায় 'জুলিয়াস সীজার' অভিনীত হয়।" সংবাদ-প্রভাকর উক্ত অভিনযের প্রশংসা করেন কিন্তু হিন্দু পেট্রিযট বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন।

এছাড়া দু-চার জায়গায় শেক্সপীযর অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় গিরীশচন্দ্র ঘোষের অনূদিত ম্যাকবেথ' মিনার্ভা থিযেটারে অভিনীত হয ১৬ই মাঘ ১২৯৯। তবে নাটকটি সুঅভিনীত হযনি বলে জানা যায়।

শেক্সপীযর-নাটক অনুবাদ :

শেক্সপীয়র নাটকের অনুবাদ কিছু বিলম্বে শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধ থেকে শেক্সপীয়র-অনুবাদের নিদর্শন পাই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের

৮। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ২৪-২৫)।

ঝোঁক ছিল অনুবাদের দিকে। হিন্দু কলেজে সে-ঝোঁক মৌলিক রচনার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। নাটক অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন। বাংলা দেশে এই প্রাথমিক বস্তুটি প্রতিষ্ঠিত হয় বহু পরে, ফলে নাটক অনুবাদের কাল বিলম্বিত হয়। শেক্সপীযব নাটকের গল্পগুলি প্রথমে অনূদিত হয। ১২৫৫ সালে গুরুদাস হাজরা 'লেম্বস কৃত ইতিহাসের গ্রন্থ' অবলম্বন করে 'রোমিও জুলিযেটের মনোহর উপাখ্যান' প্রকাশ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে Edward Roer কৃত "মহাকবি শেক্ষপীর প্রণীত নাটকেব মম্মানুরূপ কতিপয আখ্যাযিকা" ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি প্রকাশ করেন।

কিন্তু শেক্সপীযর-নাটক অনুবাদের প্রথম গৌরব হরচন্দ্র ঘোষের। 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' অবলম্বনে 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' প্রকাশিত ১৮৫২ সালে—"In 1852, I published my vernacular Drama of the Merchant of Venice" (কৌরববিজযের ইংরেজী মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য)। নাটকটি মার্চেন্ট অফ ভেনিসেব মর্মানুবাদ—

"যগুপি ইহাতে উল্লিখিত ইংরেজি কাব্যের আনুপূর্বিক অনুবাদ না হউক, তথাপি বর্ণিত মহাকবি সেক্সপীযরের সম্ভাবের বহুলাংশ অঙ্গ-সম্পূর্ণ আখ্যানের মম গ্রহণ করিযাছি, তবে বহু স্থানে মূল কাব্যের সহিত মিলন করিলে নিবর্তন পবিবর্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্তু তাহা সুদ্ধ মহাশয দিগেব অবকাশ কালে গ্রন্থপাঠ মোদের আনুকূল্য বিবেচনায় করা হইল। অতএব যদি এতন্নাটক এতদ্দেশীয় ভদ্রসমাজের মনোনীত হয় তবে আমি প্রকৃষ্টরূপে কৃত স্বীয পরিশ্রম সফল বোধ করিব।" (ভানুমতী চিত্তবিলাস—ভূমিকা)

ভানুমতী-চিত্তবিলাস নাটক হিসাবে ব্যর্থ। "কোন ইংরেজ বন্ধুর উপদেশে হরচন্দ্র প্রথমে আক্ষরিক অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরে অনুবাদের অকিঞ্চিকরত্ব বুঝিয়া নাটকটিকে দেশীয রূপদান করেন কিন্তু তাহাতে বইটি নাটক হিসাবে ব্যর্থ এবং পাঠ্য হিসাবে অসার্থক হইযাছে।"[১০] হরচন্দ্র ঘোষ অভিনযের জন্য রোমিও জুলিয়েটের অনুকরণে 'চারুমুখ চিত্তহরা' নাটক রচনা কবেছিলেন—"It was also suggested that it should be rendered in the simplicity and elegance of colloquial language with the view to adapt the same more to the stage than to study (ইংরেজী ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

৯ ও ১০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)—ডাঃ সুকুমার সেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুশীলা-বীরসিংহ নাটক' এবং চন্দ্রকালী ঘোষের 'কুসুমকুমারী নাটক' শেক্সপীয়রের cymbeline নাটক অবলম্বনে রচিত কিন্তু উভয় নাটকের ভাষা যথেষ্ট উন্নত নয় এবং এই দুটি নাটক অভিনীত হয়েছিল কিনা, তার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না।

পরবর্তীকালে কয়েকটি অনুবাদ মঞ্চে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এইসব অনুবাদের একাধিকবার অভিনয়ের সংবাদে একথা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বের অনুবাদের মতো এগুলি নিরস এবং কৃত্রিম ছিল না। নাটকগুলির মধ্যে বেণীমাধব ঘোষের 'ভ্রমকৌতুক'—'কমেডি অফ এররস্'-এর অনুবাদ, তারিণীচরণ ঘোষালের 'ভীমসিংহ'—ওথেলোর অনুবাদ। হরলাল রায়ের 'রুদ্রপাল' নাটক 'ম্যাকবেথ' অবলম্বনে লিখিত হয়। বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Tempest-এর অনুবাদ করেছিলেন 'নলিনী বসন্ত' নামে। ১২৯৫ সালে হেমচন্দ্র রোমিও-জুলিয়েট-এর অনুবাদ করেছিলেন। ঠিক অনুবাদ নয়, মর্মানুবাদ বলাই ভাল—

"এই পুস্তকখানি, শেক্সপীয়রের 'রোমিও-জুলিয়েট' নামক নাটকের ছায়ামাত্র, তাহার অনুবাদ নহে।····· আমি রোমিও-জুলিয়েটের কেবলমাত্র ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি প্রকাশ করিলাম। মূলের কোন-কোনও স্থান পরিত্যাগ বা পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছি, কোথাও দু-একটি নূতন গর্ভাঙ্কও সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষদিগের নাম ও কথাবার্তা দেশীয় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু প্রধান প্রধান নায়ক-নায়িকাগণও তাহাদের চরিত্রগত ভাব, মূলে যেখানে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।"

(রোমিও-জুলিয়েট—ভূমিকা, পৃঃ ⁄৹। বসুমতী সংস্করণ)

সেকালের অন্যতম খ্যাতিমান নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জুলিয়াস সীজার' অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদটি সহজ এবং সুন্দর। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত বহু নাটক অনূদিত হয়েছিল। নিচে কয়েকটি অনুবাদের নাম উল্লেখ করা হল :

"প্রমথনাথ বসুর 'অমরসিংহ' (১৮৭৪, হ্যামলেট), যোগেন্দ্রনারায়ণ দাস ঘোষের 'অজয়সিংহ-বিলাসবতী' (১৮৭৮, রোমিও-জুলিয়েত), তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ম্যাকবেথ' (বরাহনগর ১৮৭৫), অজ্ঞাতনামার 'মদনমঞ্জরী' (১৮৭৫, উইন্টার্স টেল), প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়ের 'সুরলতা' (১৮৭৭,

মার্চেন্ট অফ ভেনিস) এবং চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "প্রকৃতি নাটক" (১৮৮০ হইতে ১৮৮৪র মধ্যে, Tempest)। "[১১]

নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। নাটকটি 'মিনার্ভা থিয়েটারে' অভিনীত হয় কিন্তু অভিনয় যথেষ্ট উন্নত স্তরের হয়নি। এমনকি জনসাধারণ সে-নাটক যথেষ্ট আপন করে নেননি বলে মনে হয়।

শেক্সপীয়র-প্রতিভা সে-সময়ের সমস্ত কবি-সাহিত্যিকদের আকৃষ্ট করেছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 'ম্যকবেথ' নাটকের ডাইনী-দৃশ্যের অনুবাদ করেছিলেন।[১২] নাটকের অনুবাদ ব্যতীত বিদ্যাসাগর মহাশয় Comedy of Errorsএর গদ্যানুবাদ 'ভ্রান্তিবিলাস' নামে প্রকাশ করেন—"প্রহসনের উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত ও ভ্রান্তি-বিলাস নামে প্রচারিত হইল।" (ভূমিকা)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখকগণ শেক্সপীয়রকে কিভাবে আপন করে নিয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে আলোচনার জন্য অন্য একটি প্রবন্ধের প্রয়োজন। বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধে শেক্সপীয়র উদ্ধৃতি ব্যতীত বহু লেখকের লেখায় শেক্সপীয়র-প্রভাব এত প্রকট যে সে-প্রভাব নির্ণয় করতে গেলে মহাভারত লিখতে হয়। অতএব সে-কাজ অন্য কোনও দক্ষ কর্মীর জন্য তোলা হইল।

উপসংহার :

মোটামুটিভাবে দেখা গেল সারা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে শেক্সপীয়র চর্চা অবিচ্ছিন্ন ছিল।

১। শেক্সপীয়র-অধ্যাপনা আরম্ভ হয় হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে।

২। স্কুল-কলেজে শেক্সপীয়র-আবৃত্তি ও অভিনয় ১৮৩০ থেকে।

৩। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাণবান ছিল।

৪। রঙ্গালয়ে ইংরেজী নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৩১ সালে এবং জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত শেক্সপীয়র-অভিনয় প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

১১। তালিকাটি ডাঃ সুকুমার সেন-এর "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" (দ্বিতীয় খণ্ড) থেকে উদ্ধৃত।

১২। জীবন-স্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫। শেক্সপীয়র-অনুবাদ শুরু হয় শেষ অর্ধ থেকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছরই একটি না একটি অনুবাদ প্রকাশিত হত।

বর্তমানে শেক্সপীয়র-চর্চা শুরু হয়েছে আমাদের দেশে। শেক্সপীয়র-এর অমর রচনার যে সাধারণ মানুষের সম্পদ—একথা আমরা বুঝতে শিখেছি। এটা আমরা বুঝতে শিখেছি, শেক্সপীয়র মানুষকে দেখেছিলেন তন্নিষ্ঠভাবে। সে দেখায় কোনও খাদ ছিল না। শেক্সপীয়র সম্পর্কে আলোচনায় যোগদান করাও তাই বিশেষ মহৎ কাজ বলে বিবেচিত হচ্ছে আজকাল।

বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় লিখিত শেক্সপীয়র-সমালোচনার কথা উহ্য রাখা হল। অন্য প্রবন্ধে সেই অপূর্ণতার পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা করা যাবে।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে রহস্যবাদ

সুশোভন সরকার

॥ এক

আর্থার কোয়েস্‌লার নাকি এতদিনে রাষ্ট্রিক আলোচনার রণক্ষেত্র ত্যাগ করেছেন, তারপর এই তাঁর প্রথম বড় রচনা। অধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয় এর বিষয়বস্তু, লেখা আরম্ভ হয় ১৯৫৪ সালে, প্রকাশের তারিখ বর্তমান বৎসর। লেখকের পাণ্ডিত্য, মননশীলতা, লিপিচাতুর্য নিঃসন্দেহে পাঠককে আকৃষ্ট করবে। গ্রন্থের তথ্যসম্পদ ও নূতন আলোক-সম্পাত উল্লেখযোগ্য। ব্যবহৃত মালমশলার অনেকাংশ এতদিন ইংরাজিতে দুষ্প্রাপ্য ছিল, কোপার্নিকাসের মূল বইটির ইংরাজি অনুবাদ হয় মাত্র ১৯৫২ সালে. কোয়েসলারের বহু লেখা আজও ভাষান্তরিত হয়নি। শুধু নিছক ফ্যাক্ট-সংগ্রহ নয়, কোয়েস্‌লারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সন্ধানী-আলোর মতো আলোচনা'র নানাদিক উদ্ভাসিত করতে পেরেছে, ভূমিকায় অধ্যাপক বাটারফিল্ডের এই প্রশংসাও নিতান্ত অত্যুক্তি বলব না। পূর্ববর্তী লেখায় দীপ্তির চেয়ে উত্তাপের আতিশয্য যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁদের কাছে এবারকার ব্যাপকতর উপলব্ধি ও শান্ত প্রাসাদগুণ সমাদর লাভ করবে। বইখানি বিজ্ঞানের ইতিহাস-চর্চায় একটা বিশিষ্ট স্থান পাবার যোগ্য।

কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। নির্দিষ্ট বিষয়ের গণ্ডির মধ্যেও একে যুগান্তকারী বলা দূরে থাক, উপস্থাপিত সমস্যার আলোচনায় তার নূতনত্বের দাবি পর্যন্ত অনেকটা অসঙ্গত, সমস্যার সমাধান এখানে সুদূরপরাহত নয়তো বা কষ্টকল্পিত। ফ্যাক্টের ঐশ্বর্য সত্ত্বেও লেখক ঐতিহাসিকদের তৃপ্তি দিতে পারেন নি, গভীর তত্ত্ব উত্থাপন করলেও ইতিহাস-দর্শন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বলা চলে না, লেখার স্বচ্ছতা থাকলেও এতে সাধারণ পাঠকের ধারণা পরিষ্কার হওয়ার বদলে বিভ্রান্তির মোহ বিস্তারের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে কিছুটা দখল থাকলে বইখানি উপকারে আসবে, নূতন তথ্য ও পুরানো প্রশ্নের পুনরালোচনা অভিজ্ঞ লোকের কাজে লাগা সম্ভব। যাঁরা অনভিজ্ঞ, প্রাঞ্জল বর্ণনার স্রোতে ভেসে গিয়ে তাঁদের পক্ষে কিন্তু পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। শক্তিশালী লেখায় যুক্তিসঙ্গত

সুসম চিন্তা ও সতর্কতার অভাব থাকলে এই বিপদ দেখা দেয়। পাঠক মহলে কেউ কেউ কোয়েসলারের নূতন রচনায় ইতিমধ্যে অভিভূত হয়ে পড়েছেন শুনতে পাই। বুদ্ধিবাদীরা অল্পে বিচলিত হন, ইতিহাসে তার সাক্ষ্যের অভাব নেই। যুদ্ধোত্তর পশ্চিমী জগতে আজ রহস্যবাদ ও দুর্জ্ঞেয়তাব সাধনার বন্যা এসেছে, তার ছায়া আমাদের উপরেও পড়েছে এ-ও আজ অবিদিত নয়। ভরসার কথা এই যে মানুষের সহজ বুদ্ধি অপরাজেয় না হলেও দুর্জয়। জ্ঞানস্পৃহা ও স্পষ্টচিন্তা বার বার আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেও পরিণামে দুর্দম।

॥ দুই ॥

বিজ্ঞানের প্রথম স্বর্ণযুগ, মধ্যযুগের অন্ধকার, দ্বিধাগ্রস্ত কোপার্নিকাস, দুই জগতের অন্তর্বর্তী কেপলার, গ্যালিলিও-নিউটনের নূতন অভিযান, এবং পরিশেষ —এই ছয় অংশে বইখানি বিভক্ত। বিজ্ঞানে অগ্রগতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এর মধ্যে পাওয়া যাবে না, অধ্যাপক বার্নালের 'ইতিহাসে বিজ্ঞান' গ্রন্থের ব্যাপক বিবরণের সঙ্গে এর পার্থক্য প্রথমেই চোখে পড়ে। এর সঙ্গে তুলনীয় বরং অধ্যাপক বাটারফিল্ডের 'আধুনিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি' বইটি। বিজ্ঞানে সামগ্রিক ইতিহাস অনুসরণ না করে কোয়েস্‌লার বিষয়বস্তু বেছেছেন একটি প্রসঙ্গে—কস্‌মোলজি অর্থাৎ বহির্বিশ্বতত্ত্বই তাঁর আলোচ্য। কস্‌মোলজি অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাপার; নিউটনে এসে থামবার কারণও এই যে নিউটনীয় বিশ্বব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত আমাদের বিজ্ঞান-চর্চার মূল কাঠামো। আইনস্টাইন-যুগের নানা চমকপ্রদ আবিষ্কার এখনও সে-ব্যাখ্যাকে স্থানচ্যুত করে নূতন বহির্বিশ্বতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

কোয়েস্‌লারের বইটির প্রধান আকর্ষণ কস্‌মোলজির বিচিত্র বিবর্তনের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত কাহিনী। দিনের সূর্য, রাতের আকাশে চাঁদ-গ্রহ-তারা, পৃথিবীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ মানুষের মনকে স্বভাবতই আলোড়িত করেছে, মানুষ চেষ্টা করেছে এদের গতি ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়। প্রাচীনতম সভ্যতা মিশর-ব্যাবিলনে তার নিদর্শন দেখি, তার মধ্যে অবশ্য দেবদেবীর লীলা ও রূপকথার ছড়াছড়ি ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আইওনিয়া-র গ্রীক দার্শনিকেরা অতিপ্রাকৃত কল্পনা ছেড়ে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার প্রথম চেষ্টা করলেন।

বিশ্বপ্রকৃতির মূল উপাদান কি এ সম্বন্ধে আইওনিয়ার চিন্তায় বিস্তর মতানৈক্য দেখা দিলেও তার সাধারণ লক্ষণ ছিল এই প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার অনুসন্ধান।

পশ্চিমে বিজ্ঞানের আসল আরম্ভ এইখানে, তার অন্তর্নিহিত সূত্র জড়বাদ, প্রধান কীর্তি অ্যাটমের সমষ্টি হিসাবে বিশ্বকল্পনা। মতের অনৈক্য অনেকাংশে দূর হল পিথাগোরাসের আবির্ভাবে, তিনি সংখ্যাতত্ত্বের মূলসূত্রে গ্রীক বিজ্ঞানে সমন্বয় আনলেন। তাঁর শিষ্যদের চোখে বিশ্বসংসার এক সুসংবদ্ধ রূপ নিল যার রহস্য গণিতের সাহায্যে উন্মোচন করা সম্ভব। পিথাগোরাসের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও অধ্যাত্মিক আবেগের সমন্বয়-ও লক্ষ্যণীয়; সেদিনের অর্ফিক ধর্মের উন্মাদনাকে তিনি বহির্জগতের রহস্য সম্বন্ধে এক গভীর অনুভূতিতে রূপান্তরিত করলেন। পিথাগোরাসের কস্‌মোলজি একাধারে বহির্মুখীন বিজ্ঞান ও অন্তর্মুখীন ধর্মভাব।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের আন্দাজ ৪৫০ থেকে ২৫০ বৎসর আগে, পিথাগোরাসের অনুবর্তী গ্রীক বৈজ্ঞানিকেরা বহির্বিশ্বতত্ত্বের যে-রূপরেখা এঁকেছিলেন তার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের মূলগত মিল সুস্পষ্ট। পৃথিবী গোলাকার এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় পিথাগোরাসের সময়। তারপর ফিলোলাস প্রচার করলেন যে আমাদের পৃথিবী স্থির নয় শূন্যে চলমান। হেরাক্লাইডিস বললেন যে অন্তত কয়েকটি গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, যদিও সূর্য চলে পৃথিবীকে ঘিরে। অবশেষে আরিস্টার্কাস নিশ্চিত হলেন যে পৃথিবী সৌরজগতের গ্রহ মাত্র আর সকল গ্রহ-ই ঘোরে সূর্যের চারিধারে।

আঠারো শতাব্দী পরে এই মতবাদেরই পুনরুদ্ধার হয় কোপার্নিকাসের তত্ত্বে। ইতিমধ্যে গ্রীক সূর্যকেন্দ্রবাদকে কোনঠাসা করে প্রচলিত হয় ভূকেন্দ্রবাদ, ইতিহাসে যার নাম টলেমির মতো। টলেমি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের লোক। মানুষের সহজাত বুদ্ধিতে মনে হয় যে পৃথিবী স্থির, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা তাকে প্রদক্ষিণ করে অবিরাম চলেছে, প্রতিদিন তাদের উদয় ও অস্ত আমরা লক্ষ্য করছি। শিশুর মতো এই সরল বিশ্বাসকে টলেমি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করলেন, সতেরো শতক পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত রইল অবিচল প্রায়। অথচ টলেমির আগেই গ্রীক বিজ্ঞান বহির্বিশ্বতত্ত্বের মূল সত্যের সন্ধান পেয়েছিল।

সূর্যকেন্দ্রবাদ এইভাবে ত্যাগ করাকে কোয়েস্‌লার আখ্যা দিয়েছেন স্নায়বিক দুর্বলতা, গ্রীক সভ্যতার অন্তিম যুগে সাহসের অভাব। তার প্রথম লক্ষণ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে অন্তর্মুখীন দর্শনের বহুল প্রচার। প্লেটোর মতে আইডিয়া বা ভাবরূপই সার সত্য, স্থূল বস্তু তার খণ্ডিত ছায়া মাত্র। বিজ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞানের আওতার বাইরে পড়ে তাই অবহেলিত হতে থাকল।

আরিস্টটলের অবশ্য বস্তুচর্চায় আগ্রহ ছিল, কিন্তু তিনিও কার্যত বিশ্বজগৎকে দুই-মহলা প্রাসাদ হিসাবে চিত্রিত করলেন—নিচের তলা চাঁদের নিচে পার্থিব স্তর, আর উপরে বিরাজ করছে আকাশস্থিত স্বর্গীয় স্তর। এর আগে হেরাক্লাইডিস বলেছিলেন যে বিশ্বসংসারে আসল ব্যাপার হচ্ছে পরিবর্তনের অন্তহীন প্রবাহ, অথচ পারমেনাইডিস বলতেন যে পরিবর্তন বলে কিছু নেই অর্থাৎ পরিবর্তনের ধারণা সত্য নয়, মায়া মাত্র। আরিস্টটল এই দুই মতেরই একটা সহজ সমন্বয় আনতে চাইলেন—বিশ্বে নিচের পার্থিব মহলে পরিবর্তন চোখে পড়লেও উপরের তলাতে রয়েছে সনাতন চিরস্থিরতা। পরিবর্তন আবার চক্রাকারে পরিক্রমণ মাত্র, আদি থেকে পরিণতিতে বিবর্তন সে-ছকের মধ্যে পড়ে না। বোঝা সহজ যে দর্শনের এই পরিধির মধ্যে বহির্বিশ্বতত্ত্বের কোনও বস্তুনিষ্ঠ রূপ ফুটে উঠতে পারল না।

গ্রীসের সন্তান রোম-সভ্যতার অবসানের দিনে খ্রীষ্টধর্ম পশ্চিম ইয়োরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নবযুগের সূচনা হল বটে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় চিন্তানায়কেরা প্লেটোর দার্শনিক মতকেই আশ্রয় করলেন তাঁর অপার্থিব ঝোঁককে আরও প্রকট করে। নিও-প্লেটনিজম দর্শন পঞ্চম শতকে অগাষ্টিন ও জাল ডায়নিসিয়ুস্-এর আমল থেকে ছয় শতাব্দীকাল ইয়োরোপকে অচ্ছন্ন করে রাখে, আরিস্টটলের পার্থিব বস্তুচর্চা পর্যন্ত তখন উপেক্ষিত হল, কারণ চিরসত্যের সন্ধান-ই মানুষের কাম্য, দুদিনের পান্থশালা এই পৃথিবী সম্বন্ধে ঔৎসুক্য সময়ের অপব্যবহার। বহির্বিশ্বতত্ত্বে এ-যুগে টলেমির সহজবুদ্ধি ছাড়িয়ে অন্য কিছু সন্ধানের প্রেরণা রইল না। এমনকি কস্‌মাস-এর লেখায় দেখি পৃথিবী প্রাচীন খ্রীষ্টীয় মন্দিরের মতোই চতুষ্কোণ, যদিও বীড প্রভৃতি পণ্ডিতেরা পৃথিবীর অন্তত গোলরূপের ধারণা আবার ফিরিয়ে আনেন।

মধ্যযুগ সুপ্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বচিন্তায় আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। দুই-মহলা জগতের মধ্যে যোগসূত্র নানা স্তরে বিভক্ত শৃঙ্খলের বাঁধন কল্পিত হল, ধাপে ধাপে ভাগ-করা স্বর্গ-মর্ত্যের সিঁড়ি হিসাবে যাকে বর্ণনা করা চলে। উপরে ভগবান থেকে নিচে পৃথিবীর সামান্যতম বস্তু পর্যন্ত এই সিঁড়ির বিস্তার। প্রতি ধাপে অবস্থিত জীব বা বস্তুর নির্দিষ্টস্থান রয়েছে, স্বস্থান অতিক্রম করা সম্ভব নয়, করলে বিশ্বশৃঙ্খলা থাকতে পারে না। বিশ্বজগৎ প্রাচীরবেষ্টিত গণ্ডিবদ্ধ এক সৃষ্টি, নানা স্তরের স্থির বাঁধনে তার স্থিতি। টলেমির মতানুসারে পৃথিবী এই বিশ্বের কেন্দ্রে, কিন্তু তাকে ঘিরে রয়েছে পর পর চক্রাকারে একটি স্তর, এক এক স্তরে

অধিষ্ঠিত রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ ইত্যাদি। সর্বোচ্চ স্তরে আছে স্থির তারকাগুলি, তারও উপরে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য। ভূগর্ভে অবস্থিত আছে নানা স্তরের পাতাল, নরক তার মধ্যে নিম্নতম। খ্রীষ্টীয় মধ্যযুগে বিশ্বতত্ত্বের মোটামুটি রূপ এই।

এদিকে এগারো-বারো শতকে চিন্তার অধিনায়কত্বে প্লেটোর স্থানে এলেন বিস্মৃত-প্রায় আরিস্টটল। আরব সভ্যতার স্রোতে পশ্চিম ইয়োরোপে ভেসে এল লুপ্ত গ্রীক লেখার নানা টুকরা, অবশ্য অনুবাদের অনুবাদ মারফত। তেরো শতকে স্কলাসটিক পণ্ডিতদের দৌলতে আরিস্টটল দর্শনাচার্য আখ্যা পেলেন। আরিস্টটল-প্রবর্তিত যুক্তিতর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণ প্রচুর সমাদর পেল, প্লেটোর ধোঁয়াটে ভাব-রহস্যের চেয়ে এর আকর্ষণ হল প্রবলতর। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক সেণ্টটমাস এর নিদর্শন। তিনি বলতেন যে ঈশ্বরদত্ত ধর্মে বিশ্বাস নিশ্চয় সবচেয়ে বড় কথা, কিন্তু মানুষের সহজাত বিচারবুদ্ধির নিজস্ব মর্যাদা আছে। বিচারবুদ্ধি ধর্মবিশ্বাসের সহায়ক সম্মানিত, সহচরী, উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।

অনাদৃত বাহ্য-প্রকৃতিচর্চা আরিস্টটলের প্রভাবে এখন জাতে ওঠে বটে, কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে আরিস্টটলের সিদ্ধান্ত এবার অবিচল অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হল। ফলে বিজ্ঞানের মূল প্রেরণা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা, অন্তহীন অনুসন্ধান বাধা পায়— কারণ শেষ সিদ্ধান্তও দর্শনাচার্যের উক্তিতেই নিহিত আছে আর তারও উপরে আছে শাস্ত্রের নির্দেশ। এ-বাধা চুরমার না হলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব ছিল না। সে-অগ্রগতি যখন এল তখন দেখি রেনেসাঁসের যুগে আরিস্ট-টলীয় শৃঙ্খলের মোচন আর নূতন করে প্লেটোর ছায়ায় মুক্তির সন্ধান।

গোটা মধ্যযুগের চিন্তাধারায় আমরা পাঁচটি মৌলিক বাধা দেখতে পাই, তার প্রত্যেকটি বিজ্ঞানের অগ্রগতি রুদ্ধ করে রেখেছিল। প্রথম বিশ্বাস, বিশ্বসংসার দুই মহলে বিভক্ত, একটির প্রকৃতি অবিচল ও দৈব, অপরটি চঞ্চল ও পার্থিব। দ্বিতীয় বাধাকে টলেমি-প্রতিষ্ঠিত ভূকেন্দ্রবাদ বলা চলে। তৃতীয় ধারণা, গতির স্বাভাবিক রূপই হল চক্রবৃত্ত, কাজেই গ্রহণক্ষত্রের আকাশ চলার পথটুকু চক্রাকার হতে বাধ্য। চতুর্থ বাধা ছিল প্রকৃতিচর্চায় গণিতের অভাব। পঞ্চম সিদ্ধান্ত আরিস্টটলের বিখ্যাত সূত্র যে বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থাই হল স্থিতি-শীলতা, বাইরে থেকে জোর প্রয়োগ না করলে তাতে গতি আসতে পারে না, যে-কারণে তখন মনে করা হত যে গ্রহতারকাদের চালিত করার জন্য স্বর্গদূতদের প্রয়োজন হয়।

এই পাঁচ বাধাকে অপসরণ করে আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয় ষোলো ও সতেরো শতকে। নূতন বহির্বিশ্বতত্ত্ব গড়ে তোলার নায়ক হলেন কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও এবং নিউটন। আরিস্টার্কাসের কস্‌মোলজি ফিরে এল, কিন্তু এবার আর কেবল সূর্যকেন্দ্রবাদের চমকপ্রদ ধারণা মাত্র নয়, গণিতের প্রয়োগে আবিষ্কৃত হল তার মূলসূত্র আর বিশিষ্ট প্রকৃতি। বিশ্বজগৎ প্রকাশিত হল এক বিরাট যন্ত্রের রূপে ; অজেয় সৃষ্টিকর্তা সে-যন্ত্রকে সৃষ্টি করে থাকতে পারেন কিন্তু তাকে চালু রাখতে আর কোনও দৈবশক্তি কল্পনা করার অবকাশ রইল না। ভগবানে বিশ্বাস দূর হল বলা চলে না, কিন্তু বিশ্বযন্ত্রের নিয়মকানুন এল মানুষের বুদ্ধির আয়ত্তে।

আধুনিক বহির্বিশ্বতত্ত্বে প্রথম পথিকৃৎ কোপার্নিকাস সূর্যকেন্দ্রবাদ পুনরুদ্ধার করলেন। উপহাসের ভয়ে তিনি কিন্তু জীবনের শেষ বৎসর পর্যন্ত তাঁর মূল গ্রন্থ প্রকাশে রাজি হন নি। আকাশে জ্যোতিষ্কের গতিপথ চক্রবৃত্ত, টলেমির এ বিশ্বাসও তিনি আঁকড়ে থাকেন। ষোলো শতকের শেষ পর্যন্ত তাঁর নূতন মত পণ্ডিত-মহলেও অনাদৃত থেকে যায়। টাইকো ব্রাহি গ্রহদের যাত্রাপথ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করেন, কিন্তু তিনি আরিস্টার্কাস পর্যন্ত না এসে তাই হেরাক্লাইডিসের মতটুকুই আশ্রয় করলেন। কেপলার সরাসরি সূর্যকেন্দ্রবাদ গ্রহণ করে নূতন তত্ত্ব প্রচারেই সন্তুষ্ট রইলেন না, টাইকোর পর্যবেক্ষণ অবলম্বন করে তিনি গ্রহদের গতি সম্বন্ধে তিনটি নিয়ম সূত্রবদ্ধ করেন। তার প্রথমটি হল এই সিদ্ধান্ত যে সকল গ্রহের গতিপথের রূপ elliptical, অর্থাৎ উপবৃত্ত, চক্রবৃত্ত নয়। আকাশপথে গতি যে চক্রাকার এতদিনের এই বিশ্বাস গণিতের যুক্তিতে ভেঙে পড়ল। গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রে প্রমাণ করলেন যে চাঁদের পিঠ মসৃণ নয় অসমান, বৃহস্পতি গ্রহেরও চাঁদ বা উপগ্রহ আছে, শুক্রগ্রহের হ্রাসবৃদ্ধি হয় চাঁদের কলার মতো, মহাকাশে অসংখ্য তারা আছে—খালি চোখে যাদের নাগাল পাওয়া যায় না। আরিস্টটলের বিশ্বদৃষ্টিকে গ্যালিলিও প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করলেন। তিনি আরও বললেন যে জড়বস্তুর আয়তন ইত্যাদির কয়েকটি প্রাথমিক গুণ আছে যেগুলি বাস্তব সত্য, রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদি অন্যান্য গুণ শুধু দর্শকের দেখবার কারসাজি মাত্র। শেষে এলেন নিউটন—যিনি কেপলারের নিয়মগুলিকে মাধ্যাকর্ষণের মূলসূত্রে নিবদ্ধ করেন। সকল বস্তুর পারস্পরিক টানাপোড়েনের ফল হল বিশ্বজগতের গতি, যে গতি বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম, গণিতের গণনায় যার পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব। আজকের

দিনের বহির্বিশ্বতত্ত্ব নিউটনের এই গণনার কাঠামো অবলম্বন করেই দাঁড়িয়ে আছে।

নিপুণ হাতে সরসভাবে কোয়েস্‌লার কস্‌মোলজির ইতিহাস চিত্রিত করেছেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু গভীরতর বিশ্লেষণের চেষ্টা তাঁর অনেকখানি ব্যর্থ হয়েছে। তিন দিক দিয়ে এই ব্যর্থতার কিছু আলোচনা করা যাক।

প্রথমত মানসিক বিবর্তনের সমস্যা। মানুষের চিন্তায় যুগে যুগে মোড় ফেরে, বহির্বিশ্বতত্ত্বের ইতিহাসে তার স্বাক্ষর অতি স্পষ্ট। গ্রীক বিজ্ঞানের উদয়, সূর্যকেন্দ্রবাদের পিছুহটা, অন্ধকার মধ্যযুগে নব প্লেটোবাদ, পারণত মধ্যযুগে আরিস্টটলের আধিপত্য, রেনেসাঁসের সময় কেন্দ্রবাদের চরম পরাজয়, সতেরো শতকে আধুনিক কস্‌মোলজির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা—এসব কি আকস্মিক, না এর ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান, বিচার-বিশ্লেষণের পর্যায়ভুক্ত, কেবল পণ্ডশ্রম নয়?

কোয়েস্‌লার স্পষ্ট উত্তর দেবার চেষ্টা করেন নি, দ্বিধাগ্রস্তভাবে একথা-সেকথার অবতারণা বিভ্রান্তি সৃষ্টিরই সহায় হবে। ইতিহাসে অবশ্য প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ সর্বসম্মত শেষ উত্তর সম্ভব নয়, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার চেষ্টা নিশ্চয় তার প্রাণস্বরূপ। আজকের দিনে পশ্চিমে এ-চেষ্টায় পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে ঐতিহাসিকেরা তাঁদের বিদ্যাকে অলৌকিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, তাঁদের সেই প্রবণতাকে যুগসন্ধির সময়ে সাহসের অভাব, ভীতিগ্রস্ত মনের 'স্নায়বিক দুর্বলতা' আখ্যা দিলে কি নিতান্ত অন্যায় হবে?

কোয়েস্‌লার বিব্রত হয়ে বলছেন, বিজ্ঞানের গতি বড়ই আঁকাবাঁকা, বক্রতা তার বৈশিষ্ট্য, জ্ঞানবৃক্ষ সরল ঋজুভাবে বেড়ে ওঠে না, বহুবিস্তৃত সমতলভূমির মধ্যে হঠাৎ মাঝে মাঝে গিরিশিখরের মতো বৈজ্ঞানিকেরা দেখা দেন (ভূমিকা, ৫০, ৩৪০, ৩৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই পুনরুক্তি শুধু তাঁর বিবর্তনের ধাঁচ সম্বন্ধে অস্পষ্টতার পরিচয় দেয়। এ-কথা তো সুবিদিত যে বিবর্তন সরল রেখায় আসে না, অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণের বন্ধুর পন্থাই তার চিহ্ন, অন্তর্বিরোধ তার প্রকৃতি-গত, পরিবর্তনের গতি সর্বদাই অসমান। এ-প্রসঙ্গে এভলিউশন সম্পর্কে লেনিনের বিখ্যাত বর্ণনা স্মরণীয়। ডায়ালেক্‌টিক দৃষ্টির অভাবই এখানে কোয়েস্‌লারের দ্বিধা-সন্দেহের মূলে রয়েছে।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে চিন্তার মোড় ফেরা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস এই যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থা ও সামাজিক চাপের প্রভাব ক্ষীণ (৪১ পৃষ্ঠা) অন্যত্র তাঁর বক্তব্য কিন্তু এ-বিশ্বাসকে খণ্ডন করছে; অন্তত 'সামাজিক আবহাওয়া'র

শক্তিশালী অস্তিত্ব তিনি হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। গ্রন্থকারের এই স্ববিরোধ লেখার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। গ্রীক-সভ্যতার অন্তিম যুগে পরিবর্তন সম্বন্ধে গভীর ভয় ভাববাদী দর্শনের উৎসে ছিল, মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্মের পরলোকসাধনা প্রকৃতি থেকে মানুষের মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল, রেনেসাঁসে মানুষ ও বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে নূতন ঔৎসুক্য বিজ্ঞানের পথ খুলে দেয়। কোয়েসলার স্বীকার করছেন যে যুগবিশেষে বিভিন্ন ধারণা মানুষের মনে দেখা দেয়, তার মধ্যে যুগোপযোগী ধারণাগুলিকেই সমাজ বেছে নেয় তার প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে। ব্যাপারটা অনেকখানি জীব-বিবর্তনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো, উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য যেখানে প্রাধান্য পায় অনাবশ্যকের উপরে (পরিশেষ)। মধ্যযুগের সমাজ স্থিতিশীল, স্তরবিভক্ত নেতৃত্ব-মুখাপেক্ষী, দৈব নিযন্ত্রণে সম্পূর্ণ আস্থাবান, এই ঝোঁকের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন ধ্যানধারণার তখন তাই প্রবল প্রতাপ।

এতখানি স্বীকার করেও কোয়েসলারের লেখায় অস্বস্তি ফুটে উঠেছে তার কারণ 'সামাজিক আবহাওয়া'র মূলসন্ধান তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। সামাজিক ঝোঁকের সঙ্গে আর্থিক বিবিধব্যবস্থার সামান্যতম, অদৃশ্য, পরোক্ষ যোগ মেনে নিলেও সর্বনাশ, হয়তো বা মার্কসবাদের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে। তটের নিরাপদ উপকূলে সাবধানে বসে থাকাই শ্রেয়। বস্তুবাদী ইতিহাসের ছোঁয়াচ এড়িয়ে তাই গ্রন্থকার এ প্রশ্ন তুললেন না যে বিভিন্ন সামাজিক আবহাওয়ার সঙ্গে আর্থিক অবস্থা ও সংগঠনের উত্থান, পরিবর্তন, অবসানের কিছু যোগ আছে কিনা। মাত্র এক জায়গায় (১০৬ পৃষ্ঠা) উল্লেখ পাই যে রেনেসাঁস জীবনে স্পন্দন এনেছিল তখনকার বাস্তব মেটিরিয়াল অবস্থা। ধনতন্ত্রে অনুরাগীদের পক্ষে বোধহয় বণিকযুগের প্রেরণাটুকু উপলব্ধি করা সহজতর। কিন্তু দাসপ্রথায় জর্জরিত হেলেনিক সমাজে ভীতিবিহ্বল জরাগ্রস্ত অবসাদ, রোমের পতনের পর অরাজক আর্থিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে আতঙ্কিত পলায়ন প্রবৃত্তি ফিউডাল ব্যবস্থা গড়ে উঠবার পর উচ্চ-নীচের শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থিতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি এ-ধরনের যোগসূত্র সন্ধান এখানে অনুপস্থিত বলেই লক্ষ্যণীয়। মার্কসের সন্ধানী দৃষ্টি এখনকার চিন্তাবীরদের কাছে অস্বস্তিজনক, আজকের দিনের যুগসন্ধির স্বরূপ তাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। তাই তাকে অবজ্ঞায় অবহেলা করাটাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ।

॥ চার ॥

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ বৈজ্ঞানিক মনের বিশ্লেষণ, আবিষ্কার-প্রক্রিয়ার রূপ নির্ধারণ। আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণেই বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে, বিজ্ঞানীকে দেখানো হয়েছে স্বপ্নচারী হিসাবে। স্বপ্নে পরিক্রমণ অজ্ঞাতসারেই লোককে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, পথবিচারের প্রশ্ন ওঠে না, লক্ষ্যনির্দেশ অবান্তর, অথচ যাত্রা-শেষে হঠাৎ দেখা যায় সাফল্য। কলাম্বাস ভারতের পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে নূতন মহাদেশ আমেরিকা আবিষ্কার করলেন, কেপলারের কীর্তি-ও নাকি তার অনুরূপ।

এখানে বিজ্ঞান-চর্চাকে দেখানো হয়েছে এক দিকে অতি সরল রূপে, বাধা-বিপত্তি, শ্রমাকীর্ণ পথ বিজ্ঞানী যেন স্বপ্নাদিষ্টের মতো অতিক্রম করেন। অপর দিকে বিচার-বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াটিকে রহস্যের ধূম্রজালে ধোঁয়াটে করে তোলার চেষ্টাও লক্ষণীয়। বিজ্ঞানীর মন ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক নয় একথা ঘোষণার দরকার ছিল না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান স্বপ্নচারীর নির্বিচার অভিযান একথা কি অনর্থক রহস্য সৃষ্টি নয়? আবিষ্কার অবশ্যই আকস্মিক হতে পারে, কিন্তু কোন যুক্তিবলে তাকে অতিপ্রাকৃত বলা চলে? কৌতুকের কথা এই যে গ্রন্থে বর্ণিত বিস্তারিত বিবরণই স্বপ্নচারীতত্ত্বকে খণ্ডন করে গেছে। সেদিকে লক্ষ্য না রেখে গ্রন্থকার অথচ কাহিনীর উপর একটা দার্শনিক প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা পেয়েছেন।

স্ববিরোধের কথা আবার এখানে উঠছে। সামাজিক আবহাওয়া যদি বিজ্ঞান-চর্চাকে আচ্ছন্ন করতে পারে, তাহলে বিজ্ঞানী-বিশেষের পক্ষে অজ্ঞাতসারে স্বপ্নচারী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কোথায়? সামাজিক আবহাওয়া অবশ্যই স্বপ্নাদেশের তুলনীয় হতে পারে না। গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন যে চলমান পৃথিবীর ধারণা মধ্যযুগের শেষের দিকে আবার মাথা তুলছিল কোপার্নিকাসের আগেই (২০৫ পৃষ্ঠা)। বিজ্ঞানের পথে পাঁচটি প্রধান বাধা ভেঙে পড়তে থাকে রেনেসাঁসের 'নূতন আবহাওয়া'য় (১১৩ পৃষ্ঠা)। শুধু সামাজিক আব-হাওয়া নয়, বিজ্ঞান-সাধনায় অগ্রগামীদের দান-ও অসামান্য। সেই দানের প্রভাব পড়ে বিজ্ঞানীর মনের উপর, সে-প্রভাব স্বপ্ন নয় বাস্তব সত্য। গ্রীক সূর্যকেন্দ্রবাদ গড়ে ওঠে পিথাগোরাস্-প্রদর্শিত চিন্তাবিকাশের স্তরে স্তরে। কেপলারের সাফল্যের পিছনে ছিল জার্মানিতে গণিতচর্চা ও জ্যোতি-বিজ্ঞানের পুনরুত্থান (২০৭-২০৮ পৃষ্ঠা), টাইকো ব্রাহির কুড়ি বৎসর ব্যাপী আকাশ-

পর্যবেক্ষণ, কেপলারের নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা ও সোপার্জিত জ্যামিতিক জ্ঞান (৩২৮ পৃষ্ঠা)। কেপলার বা গ্যালিলিও যে আরও অগ্রসর হতে পারেননি তার কারণ যে বিশ্লেষণী জ্যামিতি ও গণনার ক্যালকুলাস পদ্ধতি তখনও দানা বাঁধে নি (৩৯৭ পৃষ্ঠা)। কেপলার ও গ্যালিলিওর সমন্বয় সাধনে নিউটন এনেছিলেন তীক্ষ্ণ গাণিতিক জ্ঞান (৫০৪ পৃষ্ঠা)। এইসব তথ্যকে কি তুলনা করা চলে স্বপ্নচারীর অজ্ঞেয় প্রেরণার সঙ্গে?

আকস্মিকতা আবিষ্কারের একটা অঙ্গ, বিজ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টিও বাস্তব সত্য। কিন্তু তাকে হেঁয়ালিতে পরিণত করা বিচারসহ নয়। আমেরিকা আবিষ্কার অপ্রত্যাশিত বটে, কিন্তু তার পিছনে ছিল শতাব্দীব্যাপী জলযাত্রার অভিজ্ঞতা, কম্পাস ইত্যাদি যন্ত্রের ব্যবহার, রেনেসাঁসের পণ্ডিতদের গোলাকার পৃথিবী সম্বন্ধে প্রচার, স্পেন-পর্তুগালের মধ্যে জলপথ নিয়ে কাড়াকাড়ি, কলাম্বাসের সাহসিক অভিযান। এর মধ্যে স্বপ্নচারণ কোনটা? অন্তর্দৃষ্টি অবশ্যই সুলভ নয়, কিন্তু সেটাও মানুষের প্রাকৃতিক শক্তি, তার পিছনেও থাকে সামাজিক অভিজ্ঞতার আলোক, পূর্বগামীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সামাজিক আবেষ্টনীর বিশেষ বিশেষ তাগিদের অস্তিত্ব। আবিষ্কার-প্রক্রিয়ার পূর্ণ বিশ্লেষণ হয়তো দুঃসাধ্য, কিন্তু বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে অলৌকিক ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া দুর্বলতার চিহ্ন। এ-পথে পা বাড়ালে সব কিছুই অতিপ্রাকৃত প্রতিপন্ন হতে পারে।

॥ পাঁচ ॥

তৃতীয় কথা, সমাজ-জীবনে সার্থক আদর্শ। ধর্ম ও বিজ্ঞান, বিশ্বাস ও বিচারের সমন্বয় কোয়েস্‌লারের প্রচারিত তত্ত্ব। এটা কি আদৌ সম্ভব? ইতিহাস কি গ্রন্থকারের বক্তব্য সমর্থন করে?

পিথাগোরাসের সমন্বয় গ্রীক-চিন্তায় উৎকর্ষ এনেছিল, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সেই সমন্বয়ে ধর্ম একটা অস্পষ্ট আবেগ মাত্র, আর বিজ্ঞান অপরিণত বিদ্যা, দার্শনিক কৌতূহল থেকে অভিন্ন প্রায়। সে সমন্বয়ও কিছু সমাজ ও বিজ্ঞানের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারে নি। জরাজীর্ণ সমাজে বিজ্ঞান গতিরুদ্ধ হয়ে পড়ল, প্রকৃতি থেকে দর্শনের দিকে পশ্চিম দেশ চোখ ফেরাল।

খ্রীষ্টীয় মধ্যযুগে অবশ্য ধর্মই সমাদৃত, বিজ্ঞান অবহেলিত। সুখের কথা এই যে কোয়েস্‌লার আজকের দিনের অনেক বুদ্ধিবাদীর মতো মধ্যেযুগের স্তাবক নন, বিরূপ সমালোচনাই বরং তার লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। এই নিন্দিত মধ্যযুগের কেন্দ্রীয় অধ্যায়ে কিন্তু আমরা বিশ্বাস ও বিচারের সমন্বয় প্রয়াসই

দেখি। গ্রন্থকার তার সুফল স্বীকার করেন নি, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় আমাদের সেন্ট টমাসের পথে আবার টানবে না কি? ধর্ম ও বিজ্ঞানের মিলনে স্বভাবতই সমস্যা ওঠে, কোনটা প্রধান? ধর্ম উপরে থাকলে স্কলাস্টিকেরা কি দোষ করেছিলেন? আর বিজ্ঞানকে যদি উপরে বসানো যায় তবে ধর্মবিশ্বাসে সংকোচন আসাই স্বাভাবিক নয় কি? আধুনিক ইতিহাস তাই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কোয়েস্লারের ঝগড়া আসলে এই আধুনিক কালের সঙ্গে। সরবে তিনি প্রচার করছেন যে মধ্যযুগ যেমন বিজ্ঞান-বর্জিত ধর্মের যুগ, সতেরো শতকের পরবর্তী সমাজ তেমনি ধর্ম-বর্জিত বিজ্ঞানের আমল। উভয় আদর্শই নিন্দনীয় তাই নূতন সমন্বয় চাই। দুই দৃষ্টিতে পার্থক্য এলে কোনটি বরণীয় পুরাতন সেই প্রশ্ন সমন্বয়বাদীরা এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত। সেন্ট টমাসের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তত বলিষ্ঠ, এঁদের সে-বালাই নেই।

বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আধিপত্যের বিষময় ফল কোথায়? বিজ্ঞান পৃথিবীকে হয়তো বা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, কিন্তু সে কি ধর্মের অভাবে না মানবিকতার অভাবে অন্ধ স্বার্থের তাড়নায়? ধর্মকে মানবিক আদর্শ বা উন্নত সুখী সমাজ গঠনের সাধনার সঙ্গে এক করে দেখাটা নিতান্তই অযৌক্তিক। ধর্মবর্জিত লোকের মধ্যে হিউম্যানিজম ও মহান আদর্শের অভাব অতীতে দেখা যায় নি, এখনও দেখা যায় না। পক্ষান্তরে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রভাব যে মঙ্গলজনক হতে বাধ্য, এমন ধারণা সত্যের অপলাপ মাত্র। ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, দেশ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়েছে, ধ্বংসের আয়োজনে উন্মুখ হয়েছে, এ-দৃষ্টান্ত কি এতই বিরল?

ধর্ম ও বিজ্ঞান, বিশ্বাস ও বিচারকে নিজ নিজ স্বতন্ত্র কোঠায় আবদ্ধ রেখে দিন কাটানো শক্ত নয়। এই ধরনের আপোসে অনেকেই অভ্যস্ত, বিশেষত আমাদের তাই বোধহয় দেশাচার! কিন্তু একে সমন্বয় বলি কোন যুক্তিতে? অন্দর-বাহির বিভিন্ন কামরায় জীবন ভাগ করাকে অন্তত জীবনদর্শন বলা চলে না। বিচার না বিশ্বাস, কোনটা প্রধান এ-প্রশ্নের এতেও উত্তর নেই।

আর এক পথ হল ধর্মকে মুখের কথায় পরিণত করে, ব্যবহারিক জীবনে সকল দ্বন্দ্ব এড়িয়ে কার্যত বিজ্ঞানের অনুসরণ করা। অথবা বিজ্ঞানকে অভীষ্ট সিদ্ধির টেক্‌নিকাল হাতিয়ার হিসাবে প্রয়োগ করে তার সামগ্রিক দৃষ্টির দিকে চোখ বন্ধ রাখা। এভাবে শান্তি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু চিন্তাশীল মনে তৃপ্তি

আসে না। সমন্বয় অথবা মূল প্রশ্নের সমাধান কোনোটা এখানেও সম্ভব নয়।

সার সত্যকে মাপকাঠি হিসাবে খাড়া করে আজকাল বলা হয় যে বিজ্ঞান তো নিছক সত্য নয়, কাজ চালাবার উপায় মাত্র। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অ্যাটম আজ মিলিয়ে গেছে, বস্তু হয়েছে আকাশে বিলীন, কণা ও তরঙ্গের সংজ্ঞা একাকার হয়ে গেল, গতি হয়েছে অহেতুক অনির্দিষ্ট বেগমাত্র, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অঙ্কের ফর্মুলায় পর্যবসিত হল। বহু প্রচারিত এই দৃষ্টি ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় কিনা জানি না কিন্তু সমন্বয়বাদী কোয়েসলার ও দেখি ঐকতানে সুর মিলিয়েছেন। বস্তুর কণায় কণায় এত ফাঁক যে চেয়ারে বসলে তিনি মনে করেন শূন্যের উপর বসে আছেন (৫৩০ পৃষ্ঠা)। এই অনুভূতির জন্য কণায় কণায় ফাঁকের তত্ত্ব আনবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, দার্শনিক মায়াবাদ এ সিদ্ধান্ত বহুপূর্বেই তুলে ধরেছিল।

বিজ্ঞান ভ্রান্ত বা অজ্ঞেয় হলে সমন্বয়ের প্রশ্ন তুলে লাভ কি? প্রচলিত বিজ্ঞান সার-সত্য না হলে কি প্রমাণিত হয়ে গেল যে ধর্মবিশ্বাস নির্ভেজাল সত্য? বস্তুর স্বরূপ বর্ণনা যখন বুদ্ধির নাগালের বাইরে মনে হয়, তখন বুদ্ধিবাদী পণ্ডিতেরা বলতে আরম্ভ করেন যে বস্তুর অস্তিত্ব নেই—এডিংটন বলেন যে মনই আসল সত্তা, জীনস বলেন যে বিশ্বজগৎ বিরাট যন্ত্র নয় বিরাট ভাবনা মাত্র (৫৩১ ৫৩২ পৃষ্ঠা)। যুক্তি প্রয়োগে বিজ্ঞানের অসারতা 'প্রমাণ' করবার পর যুক্তি বিসর্জন দিয়ে ধর্মের আশ্রয় নেওয়াটা কৌতুকজনক সন্দেহ নেই। বৃথা বিজ্ঞান ও বিচারের দোহাই না দিয়ে সংস্কার ও অনুভূতির মন্ত্রে ধর্মভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করা এর চেয়ে শ্রেয়।

কোয়েসলার প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন যে আজকের বিজ্ঞানের এই বিমূঢ় ভাব হয়তো বা সাময়িক। পিথাগোরাস ও নিউটন তাঁদের পূর্ববর্তী বিশৃঙ্খল চিন্তাকে যেমন নূতন সমীকরণে সরল করে তুলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। সে যাইহোক, বিজ্ঞানের সংকটের দিনে স্পষ্ট চিন্তার প্রয়োজন আছে। বস্তুর গড়নের সঠিক ব্যাখ্যা না করতে পারলে বস্তু উড়ে যায় না, প্রমাণিত হয় না যে ভবিষ্যতেও ব্যাখ্যা সম্ভব হবে না। পূর্ণসত্য বিজ্ঞানের আয়ত্তে না এলে প্রমাণিত হয় না যে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আংশিক সত্যও নয়। সার্থক ব্যবহারিক প্রয়োগে বিজ্ঞানের সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়। ধর্মভাবের নির্ভর যুক্তি গ্রাহ্যতা নয়, অন্য কিছু। বিচার ও বিশ্বাসের সমন্বয়-সাধন তাই ইতিহাসে সফল হয়েছে বলা চলে না।

The Sleepwalker's by Arthur Koestler (Hutchinson).

সমালোচনা

ফিল্ম

অপুর সংসার

একটি ছেলে ছিল। দরিদ্র কিন্তু সেন্‌সিটিভ। বাপ-মাকে সে অল্পবয়সে হারিয়েছে। সামান্য পুরুতগিরি তার পোষাল না, ছেলেটি অ্যাম্‌বিসাস। চেষ্টা করে সে মহৎ কিছু করার। দারিদ্র্য সে ঘোচাতে পারছে না, অভাব তার মিটছে না ; তবু সে বড় কিছু করতে চায়। জীবনকে যে ভালবাসে, দূরে সরে আসছে না সে জীবন থেকে। এ-ধরনের কয়েকটা কথার মধ্য দিয়েই একটি আশ্চর্য উপন্যাসের উৎসের কথা অপু বন্ধুকে শুনিয়েছে। সে-কাহিনীর আদিতে 'পথের পাঁচালী'র ইংগিত, মধ্যে 'অপরাজিতর' উল্লেখ, আর অন্তে 'অপুর সংসারে'র প্রস্তুতি। কিন্তু ছায়া-ছবিতে এই পরিণতি সম্পূর্ণ নিজস্ব ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। অপু-কাহিনীর তৃতীয় অধ্যায় হলেও 'অপুর সংসার' স্বয়ংসম্পূর্ণ ; পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির সঙ্গে এর শুধু মৌলিক পরম্পরাগত আত্মীয়তা—চরিত্র, ভাবাবেগ ও আন্তরিক গুণাগুণের দিক থেকে ব্যবধান বিস্তর। আরো বেশি দূরত্ব মূল কাহিনী অর্থাৎ বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' উপন্যাসের দ্বিতয়ার্ধের সঙ্গে।

এখানে অপু শুধু কবিমন নিয়ে বেঁচে থাকে না ; বাড়িওয়ালার সঙ্গে সে বক্রোক্তিতে রসিকতা করে ; ছোটখাটো ঘটনায় ও উপকরণে নবদম্পতির জীবন অনিবার্যভাবে বিশ্বাসযোগ্য ও মধুর হয়ে ওঠে। জন্মলগ্নে যে শিশু মাকে হারাল, শৈশবের প্রথম কয়েক বছর চিনল না তার বাবাকে, জন্মগতভাবে যে জন্মদাতার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পায়নি ; বরং একাকীত্বে একটু ছেলেমানুষী নিষ্ঠুরতায় সে এখানে বাস্তব হয়ে উঠেছে ; শিশু কাজলের আসল রূপ পরিবেশ-গত মুখোসে ঢাকা পড়ে ছিল, যতদিন পর্যন্ত না কাজল সত্যিকারের স্নেহের আহ্বান পেয়েছে। এমনি অনেক দিক থেকে মূল উপন্যাসের সঙ্গে ছবির ভাবগত পার্থক্য স্পষ্ট। অপুর জীবন-অনাসক্তির সঙ্গে নিজ সন্তানের প্রতি সাময়িক বিরূপতার ব্যাখ্যা চিত্রনাট্যকার উপস্থিত করেছেন অপুর কথায়,

"কাজল আছে বলে অপর্ণা নেই।" পিতা অপুর সুপ্ত চেতনার উন্মেষ যেভাবে ছবিতে উপস্থিত, তাকে অপু-চরিত্রের প্রতি নতুন আলোকপাত বলা চলে।

বিশ্ব চলচ্চিত্রের একজন সার্থক শিল্পস্রষ্টা হিসেবে সত্যজিৎ রায় ইতিমধ্যেই স্বপ্রতিষ্ঠ। কাহিনী বিন্যাসে, চরিত্র চিত্রণে, প্রয়োগশৈলীতে, তাঁর ছবি কাব্যময় প্রতীকধর্মী, সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত হয়ে যে শিল্পরসের সঞ্চার করে, ভারতীয় কথাচিত্রের ইতিহাস তা নিঃসন্দেহে অনন্য ও অসামান্য। জীবনবোধ, মননকল্পনা, বিষয়বস্তুর বাস্তবানুগ পরিবেশনের সঙ্গে, আঙ্গিকের মৌলিকতা, দৃশ্যনির্মানের অর্থবহ গভীরতা মিলে, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে মহৎ শিল্পের আবেদন, একথা অনস্বীকার্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'অপুর সংসার' ব্যতিক্রম নয়, বরং কোনো কোনো দিক থেকে সত্যজিৎ রায়ের সৃজনীপ্রতিভার নতুনতর রূপের স্বাক্ষরবহনকারী। দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা, দরদী শিল্পীমন, কলা কৌশলের মুন্সিয়ানা, ভাষা পর্যবেক্ষণশক্তি ও সর্বোপরি মহৎ জীবনশিল্পীর বোধ ও বৈশিষ্ট্য 'অপুর সংসারে' সুস্পষ্ট।

কাহিনীর পটোত্তোলন অপুর বেকার-জীবন দিয়ে। দ্বিতীয় পর্ব অপু ও অপর্ণার দাম্পত্যজীবন।

অপর্ণার মৃত্যুতে অপুর জীবনে আরেক পরিবর্তন—তার সংসার-বৈরাগ্য ও নিরুদ্দেশ যাত্রা। অপু কাজলের সম্পর্কের টানাপোড়েনে ছবির আখ্যানভাগের শেষ পর্যায়। বিচ্ছিন্নভাবে ছবির একেকটি সিকোয়েন্স যেমন সাবলীল ও সুমিত, প্রামাণ্য ও রসময়, অন্যদিকে পর্যায়গুলির সামগ্রিক পরম্পরাগত আবেদনও মর্মস্পর্শী। আপাতদৃষ্টিতে যা সরল অনাড়ম্বর, তার অভ্যন্তরে কত অর্থ, ইংগিত, ও দ্যোতনা থাকতে পারে, অপুর সংসারের অধিকাংশ দৃশ্য তার অপূর্ব নিদর্শন। অপর্ণাকে অপুর প্রশ্ন "তোমার অনুশোচনা হয় না?" অপর্ণার কাছে দুর্বোধ্য শব্দ 'অনুশোচনা' সংলাপ গুণে, ওর মুখে ফিরে এসে দর্শককে একসঙ্গে চমকিত ও অভিভূত করে। অপর্ণার কণ্ঠে 'কাজল' শব্দটি আর অপুর মুখে কাজলের প্রথম নামোচ্চারণে যে সূক্ষ্ম যোগসূত্র, তা আশ্চর্যভাবে করুণ হয়ে উঠেছে। ছোটখাটো ঘটনা, সিগারেটের প্যাকেটের মতো সামান্য জিনিস কিংবা একটা দেশলাইয়ের আলো যেভাবে সূক্ষ্ম হাস্যরস বা ইংগিতসহ পরিবেশিত হয়েছে, যাতে মুগ্ধ হতে হয়। ফুলশয্যার রাত থেকে ট্রেনে অপর্ণাকে তুলে দেবার দৃশ্যের মধ্যে দরিদ্র অথচ মধুর সাংসারিক জীবনের যে রসঘন রূপ সত্যজিৎ রায় উপস্থিত করেছেন, তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আপাতদৃষ্টিতে যা সামান্য—তা

সে বাক্যই হোক আর বস্তুই হোক—প্রয়োগচাতুর্যে, চরিত্রের মুড ও কাহিনীর পরিবেশের সঙ্গে, তা দৃশ্য থেকে দৃশ্যের গভীরে অনায়াসে দর্শকমনকে আকর্ষণ করেছে। থিয়েটার থেকে গভীর রাত্রিতে অপু ও পুলুর বাড়ি ফেরার দৃশ্য, ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে অপর্ণার অসংলগ্ন সংলাপ, নাগপুরে অপু ও পুলুর তর্কাতর্কি, কিংবা অপুর প্রতি কাজলের আকর্ষণের উন্মেষ—এমনি অনেক দৃশ্যের রস-সংবেদনা হৃদয় স্পর্শ করে। অফিসে, ট্রামে, রেল লাইনের ধারে অপর্ণার চিঠি পড়ার মধ্যে যে মধুর অনুরণন অপুর মনে, যার তীব্রতা পরিচালক ধাপে ধাপে তুলেছেন, তার সমাপ্তি অপর্ণার মৃত্যু সংবাদে। চূড়ান্ত আনন্দঘন মুহূর্তে, চরমতম শোক-সংবাদের আঘাতে যে প্রচণ্ডতা, তার অভিব্যক্তি অপুর নিষ্ঠুরতায়, আত্মনিগ্রহে, ও আত্মহত্যার প্রচেষ্টায়। মধুর পরিবেশের শান্তরস থেকে চিত্রনাট্য যে করুণ রসে সিঞ্চিত হয়েছে, সম্পাদনা ও আলোকচিত্র গ্রহণের নৈপুণ্যে, তা আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রতিকী দ্যোতনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। অপু ও কাজলকে কেন্দ্র করে ছবির যে শেষ পর্যায়, তার মানসিকদ্বন্দ্ব ও প্রকাশ সত্যজিৎ রায়ের বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচায়ক।

অপর্ণার মৃত্যুতে কাহিনী যে মোড় নিয়েছে, সেই পর্বে, জীবনবিমুখ অপুকে চিত্রনাট্যকার লোকালয়, সমাজ থেকে দূরে প্রকৃতির নানা পটভূমিতে নিয়ে গেছেন। শুধু উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে তার রওনা হওয়া, আর শেষ পর্যন্ত ঝরাপাতার মতো তার পাণ্ডুলিপির পাতা ফেলে দেওয়ার রিক্ততায় অসংগতি না থাকলেও এখানে ভাবাবেগ আশানুরূপভাবে বেড়ে ওঠেনি। এই পর্বের ব্যঞ্জনা ও সমাহিত শান্তভাবের সম্মোহন থাকলেও, মানুষ অপু হারিয়ে গেছে। নিঃস্ব যোগীর মতো বসে-থাকা অপুর মানসগঠনের দিক থেকে অর্থপূর্ণ হলেও এর পরিবেশন একটু যেন নাটকীয়। অন্যান্য পর্বের মতো স্বচ্ছন্দগতি এ-পর্ব নয়। কোলিয়ারীতে অপু ও পুলুর সাক্ষাৎকারে, অন্তরস্পর্শী আলাপআলোচনা ও নয়নাভিরাম লোকেশন থাকা সত্ত্বেও, ওদের দূরত্ব ও দূরত্বের সঙ্গে ধ্বনিতরঙ্গের অসংগতি ও প্রতিধ্বনিতে পর্যায়টির স্বতঃস্ফূর্ততা কম। ছবিতে বিভিন্ন মানুষের আপেক্ষিক গুরুত্বের সঙ্গে ধ্বনির অসংগতি, শেষ দিকে অপু ও কাজলের কথাবার্তার মধ্যেও রয়ে গেছে। কাজলের ঢিল ছোড়া ও অপুর গায়ে ক্রিকেটের বল লাগার দৃশ্যে কলাকৌশলগত সামান্য ত্রুটি রয়েছে।

ঘটনার ও চরিত্রের মানসিক পরিস্থিতি অনুসারী পরিবেশ, প্রামাণ্য দৃশ্যপট, সহজগ্রাহ্য অথচ গভীর ব্যঞ্জনাময় চিত্রভাষা এবং আবহের শব্দধ্বনি 'অপুর

সংসারে'র বিশেষ সম্পদ। ফ্ল্যাটবাড়ি, ঘিঞ্জিগলি, রেলের ইয়ার্ড, নদীর পার একদিকে অনায়াসে ছবিটির অলংকার হয়েছে, অন্যদিকে তার বক্তব্যকে ঘনীভূত করেছে। চিত্রনাট্যকে স্বচ্ছন্দগতি করতে, দৃশ্যপারম্পর্যে রস সংবেদনা গভীরতর করতে সম্পাদক দুলাল দত্ত যেমন নিপুনভাবে সহায়তা করেছেন, তেমনি কম্পোজিশনে, দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে, আংগিক অনুযায়ী বক্তব্য পরিস্ফুটনে কুশলতা দেখিয়েছেন আলোকচিত্রী সুব্রত মিত্র ও শিল্পনির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্ত। সুর সংযোজনায় রবিশংকর আগের মতো অভিভূত না করলেও, সুনাম তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

'অপুর সংসারে'র সংলাপ এক কথায় বিস্ময়কর। চলচ্চিত্র মাধ্যমে সার্থকতম সংলাপের নিরিখ হয়ে এ ছবির অনেক দৃশ্য অসাধারণ গুণসম্পন্ন বলে বিবেচিত হবে। দৈনন্দিন জীবন ও মানুষের মন সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের অভিজ্ঞতা যে কত গভীর, মানবিক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংযোগ ও রসবোধের মিলন যে কত অঙ্গাঙ্গী, তার অন্যতম প্রধান ছবিটির সংলাপ। একদিকে যেমন স্বাভাবিক ও চরিত্রানুগ, অন্যদিকে তা আশ্চর্যভাবে মৌলিক ও ব্যঞ্জনাময়। কলকাতায়, নৌকোয় ও নাগপুরে অপু ও পুলুর কথোপকথন, বাড়িতে ঘোড়ার গাড়িতে কিংবা স্টেশনে, অপু ও অপর্ণার কথাবার্তা, অপু ও কাজল পর্বে সংলাপ অন্যদিকে তেমনি সহজবোধ্য ও চূড়ান্তভাবে বাস্তব। চরিত্র গঠন ও পরিবেশ অনুযায়ী অনিবার্য লাগে বলে তা এত মর্মস্পর্শী। সমস্ত ছবিতে দু চারটা সংলাপ অবান্তর বলে মনে হয়েছে। বিয়ে বাড়িতে অপর্ণার মার সঙ্গে অপুকে পুলুর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় মুখপাত্র হিসাবে অপুর উল্লেখ একটু অসংগত মনে হয়, বিশেষ করে কাকতালীয় যোগে কথাটিকে যেন ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে হয়। বিয়ের দৃশ্যে অপর্ণার মার কথাগুলিও কিছুটা অতি নাটকীয়। এই প্রসংগে আরেকটা বিষয়ও লক্ষণীয়। বিয়ের কনেকে তার মায়ের সাজিয়ে দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ নয়, তবে বাস্তবক্ষেত্রে তা সাধারণত ঘটে না বলে (বোধ হয় বিয়েবাড়ির নানাকাজে মায়ের ব্যস্ততার জন্যই তা সম্ভব হয়ে ওঠে না) অপর্ণাকে তার মায়ের সাজিয়ে দেওয়ার দৃশ্যটিতে খুঁত রয়ে গেছে।

সমস্ত ছবিতে পরিবেশ ও সংলাপের গুণে সামান্য দু-চারটি বাক্যের মধ্য দিয়েই কয়েকটি অনবদ্য টাইপ-চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। স্কুলবাড়ি, ওষুধের কারখানা, অপুর অফিস ও ফ্ল্যাটবাড়ির জীবনযাত্রার দৃশ্যগুলি এই প্রসংগে স্মরণীয়। পর্যায়গুলি প্রয়োগ পারিপাট্যে শুধু সুপ্রযুক্ত ও নিটোল নয়, এগুলির

হাস্তরসও হৃদয়গ্রাহী। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর ও স্বপন মুখোপাধ্যায়কে তিনটি মূল চরিত্রে যেমন মানিয়েছে, তেমনি প্রাণবন্ত হয়েছে তাদের অভিনয়। অলোক চক্রবর্তী যে কোনো দর্শকের মন জয় করে নেবে।

আগেই বলেছি, বিভূতিভূষণের কাহিনীর তন্নিষ্ঠ রূপায়ণ এ-ছবি নয়। পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের পথে অপু-জীবনের যে আলেখ্য ছায়াছবিতে, ভাষান্তরিত, তা বলতে গেলে নতুন এক শিল্পসৃষ্টি। সেদিক থেকে চলচ্চিত্র কাহিনীর ঘটনা, পরিবেশ, বিশেষ করে, পাত্র-পাত্রীর চরিত্র ও পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তার অভিব্যক্তি কনভিনসিং ও রিয়াল কিনা, সেই আলোকেই 'অপুর সংসার' মূলত বিচার্য। চিত্রনাট্যকার-পরিচালক হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের পরীক্ষা সেখানেই। আর সে পরীক্ষায় নিঃসন্দেহে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ। মূল উপন্যাসের যে ভিত্তিভূমি থেকে এ-চিত্রনাট্যের সূত্রপাত, তার শিল্পমণ্ডিত, জীবন-অন্বিষ্ট, রসাশ্রিত উপস্থাপনে, বর্ণনায় ও পরিণতিতে 'অপুর সংসার' এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অনন্যসাধারণ শিল্পকর্ম হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অসীম সোম

বই

অমিল থেকে মিলে—মণীন্দ্র রায়, ১৩৬৫ ; পৃ: ৪৭। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম : ১.৫০ নঃ পঃ ॥

কবি মণীন্দ্র রায়ের কবি-খ্যাতি প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে তাঁর প্রথম কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গেই স্থাপিত হয়। তাঁর সেদিনের স্বাক্ষরে যে অভিনবত্ব ছিল তা যতটা চিৎসম্পদের তার চেয়েও বেশি নৈপুণ্যের অভিনবত্ব। স্থির নিষ্ঠার সঙ্গে সেই কবি-প্রকৃতি এতদিন ধরে আপনার চিদ্‌ধর্মের সন্ধান ও অনুশীলন করে চলেছে, প্রকাশ-ধর্মকেও সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছে পরিণত স্বচ্ছতা। 'কৃষ্ণচূড়াতেও' (১৩৬৩ বাং) আমরা তার পরিচয় পেয়েছিলাম—

'অমিল থেকে মিলে' (১৩৬৫) পৌঁছে দেখি কবির চিত্তে এসেছে সেই বেদনার সংযত পরিণতি, অনুভূতির সুস্থির সংহতি, সকৌতুক নিশ্চয়তা-বোধ। আর সেই সঙ্গে তাঁর কাব্যের প্রকাশ-কলায় এসেছে স্বচ্ছতর ঔজ্জ্বল্য, বাণী-বিন্যাসের নিঃশঙ্ক নৈপুণ্য, এবং অন্তরঙ্গ আলাপের সুচতুর মাধুর্য। বিস্তৃত

উদ্ধৃতি দিতে পারলে হয়তো আমার বক্তব্য পাঠকের নিকটও স্পষ্ট হয়ে উঠত। সামান্য এক-আধটি খণ্ডিত উদ্ধৃতিতে তার আভাস দিতে পারা যাবে কিনা জানি না।

জীবন কবির চোখে কী, তার সহজ ইঙ্গিত এই সামান্য অবিস্মরণীয় কথাটি—

··· কেননা জীবন এক ধৈর্যময় গবেষণাগার—
বিশাল কয়লার খাদে হীরা রেখে যে বলে বেছে নে।

কবি জানেন—তার 'মিল' কতখানি 'অমিলের' দামে কেনা, আনন্দ এবং আনন্দের মধ্যে রয়েছে কতখানি ইতিহাস

যা কিছু হয়েছে, হবে, সে কি জল-পড়ে-পাতা নড়ে
এত সোজা। বীজের খোলস ভাঙতে চারা কেন তবে
বাঁকায় পিঠের ধনু? নদী ছুটে যায় না সাগরে
টর্চের আলোর মত ঋজু পথে?

যায় না, কারণ মানুষ এই 'আকাশের প্রেমে নির্বাচিত'—যদিও 'মানুষের পাখা নেই।' এ বোধে পৌঁছতেও 'অমিলের' পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে আগন্তুক, 'হয়ে ওঠা' প্রভৃতি কবিতা সে স্মৃতি-বিজড়িত। এই 'মিলের' বোধে পৌঁছেও কোনো সুলভ নির্দ্বন্দ্ব স্থিতির আশা নেই—অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো সবাইকে কবি সে অভিজ্ঞতা বলছেন—

এগিয়েছি দু চার কদম
সম্মুখে আমিও। তবু এ কেমন কাজীর বিচার—
যে দেয় সে সবি দেয় শোনে শুধু আগে কহো আর।

কবি মণীন্দ্র রায়ের নিজস্ব কৃতিত্ব—এই বিশেষ প্রকাশ-ভঙ্গিমায়—একই কালে তিনি মনের এক দরজা থেকে আর-এক দরজা খুলে দিয়ে দেখাতে পারেন পাখি ডাকা ভোর—

একটি পাখির ডাকে
রাত্রি-শেষ স্তব্ধতার সারেঙ্গী যেমন
বেজে ওঠে ছড়ের আঘাতে,
কাঁধের উপর দিয়ে প্রেমিকের ফিরে-চাওয়া-মুখ
যেমন আচমকা মনে খুলে দেয় অনেক কপাট,
আমরা পাইনি সেই তীব্র অভিজ্ঞতা—

আর অন্য দরজা খুলে দিয়ে ঠিক তেমনি অনায়াস কৌতুকে তিনি দেখিয়েছেন—

অমিল অনেক, সে কি আমিও জানি না ?
এ প্রায় ছাত্রের কাছে পৃথিবীর কমলালেবুকে
আধাআধি ভাঙার প্রয়াস।
অথচ গভীর প্রেমে আকাশের বুকে বাঁধা তবু
সূর্য থেকে ঘাস।

রূপকল্প ও সংহত বাণী রচনার পরেই আধুনিক বাঙলা কবিতার নতুনত্ব দেখা যায় সম্ভবত এই কথ্য শব্দ নির্বাচনে ও কথ্য বাচন-ভঙ্গিমায়—বিশেষ করে সব্যঙ্গ দৃষ্টিতে। কবি মণীন্দ্র রায় সেদিকে পারদর্শী। বিশেষ করে তাঁর দৃষ্টি শুধু ব্যঙ্গের নয়, কৌতুকের ও বুদ্ধিশুভ্র আলাপের যা দুর্বোধ্য নয় কিন্তু দুর্লভ এবং সুনিপুণ কবি-প্রয়াসেরও প্রমাণ।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ধারা ও মার্ক্সীয় দর্শন। রবি রায়। সিগনেট॥
দর্শনের ভূমিকা। ডাঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী। এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং॥

দর্শনের ছাত্ররা জানেন—ভারতীয় দর্শন ইংরেজি বা কোনো পাশ্চাত্ত্য ভাষায় পরিবেশন করা কী দুঃসাধ্য কর্ম। পাশ্চাত্ত্য দর্শন বাঙলা ভাষায় পরিবেশন করা তত কঠিন কাজ নয়, তথাপি আয়াসসাধ্য। অথচ, আজকের পৃথিবীর একটা প্রধান প্রয়োজনই হল প্রত্যেক প্রধান ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীর প্রধান প্রধান চিন্তাধারাকে সমুপস্থাপিত করা। একাজে চিন্তার মৌলিকতা অপেক্ষা ভাষাবোধ ও কাণ্ডজ্ঞানই বেশি চাই। উপরের গ্রন্থ দুখানা সাধারণ দর্শন-জিজ্ঞাসুর জন্য লিখিত। এরূপ সহজ বুদ্ধির জোরেই বই দুখানি গ্রাহ্য।

শ্রীযুক্ত রবি রায়ের মূল উদ্দেশ্য মার্কসীয় দর্শনের আলোচনা, এবং সেই সূত্রে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের চিন্তাধারার পশ্চাৎপট (হেগেল পর্যন্ত) শতখানেক পৃষ্ঠায় বিবৃত করা। এ কাজ ইংরেজি-জানা বাঙালীর জন্য আবশ্যকীয় নয় ; ইংরেজিতে বই আছে। বাঙলায়ও এরূপ পুস্তক আছে। বিচার্য হচ্ছে দুটি কথা—লেখকের গ্রন্থ সেদিক থেকে পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য হয়েছে কিনা।

এবং দ্বিতীয়ত এই বিবরণ মোটামুটি শুদ্ধ ও সঠিক হয়েছে কিনা। এই বিচারে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গেই সমুত্তীর্ণ—সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বক্তব্য পরিবেশন করেছেন, মার্কসীয় দর্শনের মূল তত্ত্বও বিবৃত করেছেন। সুবিবেচনা প্রকাশ পেয়েছে—পরিভাষিকের প্রতিশব্দ নির্বাচনে ও মূল-পারিভাষিক লিপ্যন্তর করে পাশাপাশি দেওয়ায়, পারিভাষিক নির্ঘণ্টে ও পুস্তকতালিকা নির্দেশে। এই হিসাবে বইখানা পাঠকের কাজ দেবে।

'দর্শনের ভূমিকা' বইখানি সম্ভবত কলেজপাঠ্য বই রূপেই প্রণীত। সেদিক থেকে বিচার্য হবে ছাত্রদের পরীক্ষার পক্ষে এ বই কতটা কাজে লাগবে, এই স্থূল মানদণ্ডের দ্বারা। সাধারণ পাঠক যদি পড়েন তা হলে যোগ্য অধ্যাপকের কৃপায় ফিলজফির মেটাফিজিক্সের পাঠ্য-পুস্তকে কি থাকে তা বুঝতে পারবেন।

বিষয়, বিভাগ, বিচার-বিশ্লেষণ সবই ধারাসম্মত; ভাষাও সরল। পাঠ্য-পুস্তকের জ্ঞানতত্ত্ব, দেশ, কাল, দ্রব্য ও কারণ থেকে মূল্যতত্ত্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আলোচিত বিষয়সমূহের একটা সামান্য ধারণা লাভ করা যায়।

গোপাল হালদার

বিশ্বভারতী পত্রিকা। পঞ্চদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (কার্তিক-পৌষ ১৮৮০ শক)। সম্পাদক, শ্রীপুলিনবিহারী সেন ॥

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা। পঞ্চষষ্ঠিতম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা। পত্রিকাধ্যক্ষ, শ্রীপুলিনবিহারী সেন ॥

বিশ্বভারতী পত্রিকা সম্বন্ধে বছর পনেরো আগে আমি পরিচয়ের পত্রিকা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলাম যে ঐ পত্রিকায় বিশ্বের পরিচয় প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। এই মন্তব্য সম্বন্ধে অনেকেই আমাকে কড়া কথা শুনিয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ একাই একশো, সুতরাং প্রমাণ আকারের পুরো একটি ত্রৈমাসিক শুধু তাঁকেই অবলম্বন করে চলতে পারবে না কেন? কথাটি হয়তো খাঁটি, কিন্তু কার্যত দেখছি যে ত্রৈমাসিক বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে থেকেও শুধু তাঁকেই অবলম্বন করে থাকেনি ও ফলে এই পত্রিকাটি দিনে দিনে সমৃদ্ধিলাভ করেছে ও তার ফলে রবীন্দ্রনাথের গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি বরঞ্চ প্রশস্তর পটভূমিতেও তাঁর পরিচয় আরো বাস্তব হয়েছে। সম্প্রতি পুলিন বিহারী সেনের সম্পাদনা যে এই সমৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা হয়েছে তা নিঃসন্দেহ পত্রিকা-সম্পাদনায় পুলিনবাবু নতুন মান প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। এর প্রমা পাওয়া যায় বর্তমান সংখ্যাতেই। অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পাদক এ সংখ্যায় জড়ো করেছেন ভারতবর্ষের তিনজন মহাপুরুষের জীবনের ও কর্মে বৃত্তান্ত: বাংলার জগদীশচন্দ্র বসু ও বিপিনচন্দ্র পাল আর মহারাষ্ট্রের না শিক্ষাব্রতী ধোন্দো কেশব কার্বে, যিনি একশো বছর অতিক্রম করেও আ জীবিত আছেন। ১৯৫৮ সালে এই তিন মহাপুরুষেরই জন্মশতবার্ষিকী পালি হয়েছে। সুতরাং বিশ্বভারতী পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যাটি, কোথাও সে কথ উল্লেখ না থাকলেও, বলা যেতে পারে এই তিন মহাপুরুষের জন্মশতবার্ষি সংখ্যা। এই তিনজনেরই যথেষ্ট ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায় এই সংখ্য প্রবন্ধগুলিতে ও অন্যান্য সংগৃহীত উপকরণে (যেমন চিঠিপত্র)। আলো

আলাদা করে এই সব প্রবন্ধ বা চিঠিপত্রের পরিচয় দেওয়া এক্ষেত্রে সম্ভব নয় তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধের নাম না করলে অন্যায় হবে, যেমন, জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যস্মৃতি', ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসুর 'জগদীশচন্দ্র বসু ও জড় ও জীবনের সাড়া' ও স্বয়ং সম্পাদকের লেখা। 'জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' (এই প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য রচনার চাইতেও চিঠিপত্রের নির্বাচনে ও পারম্পর্য অনুসারে এগুলির সন্নিবেশে) , বিপিনচন্দ্র সম্বন্ধে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর 'বিপিনচন্দ্র পাল স্বদেশী আন্দোলনের ঋত্বিক', ও বিনয় ঘোষের 'বিপিনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' সম্বন্ধে পরিচয়-প্রবন্ধ কাবে সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছোট্ট একটি রচনা ও সুশীল রায়ের লেখা কাবের জীবন কথা'। বিশেষ করে অপরিচিত লেখক সুশীল রায়ের লেখা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। সহজ সুন্দর বাংলায় এই রকম বাহুল্যবর্জিত তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ কদাচিৎ পড়া যায়।

নতুন সম্পাদক পুলিনবিহারী সেনের হাতের ছাপ বর্তমান সংখ্যার ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ইতিমধ্যেই বেশ ফুটে উঠেছে মনে হয়। বিশ্বভারতী পত্রিকার মতন এই পত্রিকাও একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র। এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ 'বাঙ্গালীর নিজস্ব বাণী-মন্দির' প্রবন্ধে একদা লিখেছিলেন "আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বঙ্গের একটি বিশেষত্ব, ইহার মত দীর্ঘায়ু ও বহুলকীর্তি প্রতিষ্ঠান ভারতের আর কোনো প্রদেশে নাই।" ১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ৭ তারিখের 'দেশ' পত্রিকা থেকে এই প্রবন্ধটি বর্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তাছাড়া আছে ঐতিহাসিক যদুনাথ সম্বন্ধে দিলীপকুমার বিশ্বাসের একটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ ও রজনীকান্ত সেন ও অনুরূপা দেবীর জীবন ও রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'মহারাজ কুম্ভকর্ণ পরিকল্পিত শ্রীগীতগোবিন্দ প্রবন্ধ' বর্তমান সংখ্যায় ঐতিহাসিক গবেষণার ঐতিহ্য রক্ষা করেছে। এই জাতীয় রচনা মূল্যবান হলেও সাহিত্য-পরিষদের মতন 'বহুলকীর্তি' প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের একমাত্র উপকরণ হওয়া যে বাঞ্ছনীয় নয় তা বোধহয় সকলেই মানবেন। আশা করা যায় বিশ্বভারতী পত্রিকা বিশ্বের নাড়ির স্পন্দনে যে-ভাবে প্রাণবন্ত হয়েছে, নতুন সম্পাদকের প্রেরণায় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকাও অচিরে তাই হবে—স্বকীয় চরিত্র রক্ষা করে। যদি একই মানুষের ডান ও বাঁ হাতের ছাপ এই পত্রিকা দুটি বহন করে তাহলে দুটিরই চরিত্র লুপ্ত হবে।

হিরণকুমার সান্যাল

কেরলার 'বিদ্রোহ'?

শিক্ষা-সংস্কার উপলক্ষ করে কেরলার প্রতিক্রিয়া-শক্তি যে কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা উচ্ছেদ আন্দোলনের সূচনা করছে, একাধিক কারণে তার স্বরূপ দেশের জনশক্তির এবং সংস্কৃতিকামীদেরও লক্ষণীয়। কেরলা শিক্ষা-আইনের কথাটা এই প্রসঙ্গে উত্থাপন এখন প্রায় অবান্তর হত যদি না জানতাম—কেরলার সর্বাপেক্ষা প্রবল ও ঘৃণিত যে চক্রীদের উপর কমিউনিস্ট-বিরোধীরা নির্ভর করে তাদের এই চক্রব্যূহ রচনা করছে, সেই চক্রীদের রোষ শিক্ষা-আইনের বিরুদ্ধে, শিক্ষা-সংস্কারের বিরুদ্ধেও, এমনকি ভূমিসংস্কার ও সমাজসংস্কারের সকল প্রয়াসেরই বিরুদ্ধে। এই চক্রীরা হচ্ছে একদিকে ক্যাথলিক গির্জাগুরুরা, অন্যদিকে নায়ার-সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা।

পৃথিবীর সর্বদেশেই ক্যাথলিক চার্চের অভিযান চলে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে, জনশক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠার সর্বপ্রয়াসের বিরুদ্ধে। এ-জন্যই বহু দেশ ও সমাজ আত্মরক্ষার দাবিতেই ক্যাথলিক যাজক-মণ্ডলীকে নিরস্ত্র করতে বাধ্য হয়, এমনকি নির্বাসিত না করেও পারে না। বহুদেশের মতই কেরলায় ক্যাথলিক চার্চের প্রধান বল হল—কেরলার খ্রীষ্টান কায়েমী স্বার্থ। দ্বিতীয় প্রধান বল—শিক্ষাক্ষেত্রে চার্চের আধিপত্য। বর্তমান সময়ে সরকারী ভূমিসংস্কার প্রস্তাব পণ্ড করা ও শিক্ষা-সংস্কার আইন বাতিল করা কেরলার ক্যাথলিকদের আশু লক্ষ্য। ভূমিসংস্কার প্রস্তাব এখনো বিধানসভায় আলোচিত হচ্ছে—কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা এই প্রস্তাব বিধিবদ্ধ না করে নিরস্ত্র হতে চান না। তাই বিরুদ্ধ পক্ষের সমস্ত প্ররোচনা সত্ত্বেও তাঁরা এই আইন আগামী ১৫ই জুনের মধ্যে আলোচিত বিধিবদ্ধ করতে দৃঢ় সংকল্প। শিক্ষাসংস্কার আইনের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষের নানা প্রতিরোধ ভারতবর্ষের বর্তমান কালের ইতিহাসের একটি অধ্যায়।

শিক্ষাবাবদ সরকারী আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করলে এই আইনের নিয়মানুযায়ী স্কুল পরিচালনা করতে হবে। অবশ্য যারা সেই সাহায্য নেবে না, তারা সম্পূর্ণ

নিজেদের ইচ্ছামত স্কুল পরিচালনা করতে পারবে। কেরলার ক্যাথলিক গির্জাগুরুদের কিন্তু এরূপ 'স্বাধীনতা' মনঃপূত নয়। তাদের 'স্বাধীনতার' দাবি এই—সরকারী সহায়তাও নেবেন, আইনও মানবেন না। শিক্ষক-শিক্ষকাদেব বেতন থেকে বঞ্চিত করে গির্জার কর্তারা এতদিনকার নিজেদের নিয়মে ৫।১০৲ বেতনেই কাজ করাবে। নিজেদের ইচ্ছামত বণ্ড লিখিয়ে, সেলামী নিয়ে, শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করবে, ধর্ম ও আর্থিক ক্ষমতার চক্রজালে তাদের ক্রীতদাসের মত শাসন করবে, এবং সরকারী সাহায্যও যদৃচ্ছা ব্যয় করবে—হিসাবের দায়িত্ব নেই। এমন নয় যে কেরলের ক্যাথলিক গুরুদের এই কীর্তি ও দাবি কারও অগোচর। এ দেশের এমন একটি সংবাদ-পত্রও নেই যে, কেরলার পাদ্রিদের 'শিক্ষা স্বাধীনতার' দাবির স্বরূপ জানেন না, কিংবা সে দাবির সমর্থন করেন। একথাও ওঠেনি যে কেরলার 'শিক্ষা-সংস্কার' আইনের বিধি-বিধানসমূহ অবিদিত—কিংবা কেরলার বিধানসভা, শিক্ষক ও শিক্ষিত সাধারণ বা জনগণ সেসব বিধিনিয়ম আলোচনা করবার সুযোগ পাননি, বরং ভারতবর্ষের শিক্ষা-অশিক্ষা-কুশিক্ষার কোনো আইন নিযে কেন্দ্রের রাষ্ট্রপতি থেকে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত এত মাথা ঘামান নি, এত বিলম্বিত সুবিবেচনা ও বিচারমুখিতার পরিচয়ও দেননি। আর শেষ পর্যন্ত, এও সুবিদিত যে এই শিক্ষা আইনের প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ মূলত কংগ্রেসেরই প্রতিশ্রুত শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রণীত। কমিউনিজম, সোশ্যালিজম-এর নামগন্ধও তাতে নেই—আছে সাধারণ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক উদারনীতির কাম্য শিক্ষা-সংস্কার। অবশ্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নীতিকেও ক্যাথলিক চাচ পারলে কোনও দেশেই পথ ছেড়ে দেয় না।

এই হল সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন বিরোধী দলের বিরোধের স্বরূপ। এরাই ছুরি শানাচ্ছেন, নিজেদের তাঁবের স্কুল বন্ধ করছেন, ভলাণ্টিয়ারের মহড়া দিচ্ছেন, নিজেদের ধর্মীয় প্রভাবের সুযোগ নিযে কেরলাতে নূতন 'ক্রুসেডের' উদ্যোগ করছেন। এদের সহযাত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছেন, এই আইনের পূর্ববর্তী সমর্থক নায়ার সম্প্রদাযের সাম্প্রদায়িক নেতা পদ্মনাভন প্রমুখ ক্ষমতাবান নায়ার প্রভুরা। নায়াররা পূর্বতন রাজার জাতি, কেরলার সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত। বুর্জোয়া শিক্ষা-সংস্কারে তাদের সম্মতি নেই। কারণ, পূর্বেকার মতই পশ্চাৎপদ সংখ্যা প্রধান 'এঝবা' জাতির জন্য সংখ্যানুপাতে শিক্ষকের পদ নির্দিষ্ট থাকবে, তাতে শিক্ষায় অগ্রসর নায়ারদের চাকরি কম হবে, শিক্ষাক্ষেত্রে আধিপত্য ক্রমে খর্ব

হবে। নায়ারদের আপত্তি সাম্প্রদাযিক আপত্তি, এবং অনেক সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভের মতই তার মূলে 'চাকরি' কিন্তু এদেশে সাম্প্রদাযিক ইন্ধনের মত ইন্ধন আর কিছুই নেই। কমিউনিস্ট বিরোধিতায নায়ার ক্যাথলিক মিলনও স্বাভাবিক। কারণ কায়েমী স্বার্থের শক্তিতেই এই দুই পুষ্ট ও চালিত। আর ঠিক এই কারণেই এর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন কৃপালনী, অশোক মেহেতা ও থানু পিল্লাইর প্রজাসোশ্যালিস্ট পার্টি—বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট-বিরোধী জেহাদের যাঁরা ভারতীয ঠিকাদার, কায়েমী স্বার্থের বি টিম হিসাবে খেলায় নামতে তাদের কোনো সমযেই বাধে না। 'কাযেমী স্বার্থের যুক্ত ফ্রন্টে' এসে সামিল হচ্ছেন 'বিপ্লবী সোশ্যালিস্ট পার্টি'। শিক্ষা আইনের তাঁরা বিরোধী নন, কিন্তু এই সুযোগে ছাত্র মজুর প্রভৃতি যে কোনো অনুচরদের সাহায্যে কেরলায় কমিউনিস্টদের নির্বিবাদে মারপিট করার মত 'বিপ্লবী' প্রোগ্রাম তাঁরাই প্রথম চালু করেছেন, কমিউনিস্ট উচ্ছেদরূপ জেহাদের তাঁরাই অগ্রচমূ। এবং সর্বশেষে অহিংস অসহযোগীর ধ্বজা নিযে বহুচিন্তার পর—কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরার নির্দেশ, তাত শ্রীযুক্ত জওহরলালজীর সদুপদেশ, শ্রীযুক্ত দেশাই বা শ্রীমতী কৃপালনীর আদেশ নিযে—বহু আলোচিত ও বিবেচিত 'অভিযোগপত্র' নিযে এই যুযুৎসবাদের সঙ্গে সম্মেলিত হচ্ছেন কেরলার কংগ্রেস বাহিনী—পরোক্ষে যাদের পৃষ্ঠরক্ষী ভারতের কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার ও বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস সরকার, এই কথা দেশে-বিদেশে কারও অবিদিত নেই। আর এই সঙ্গে মুসলিম লীগ (হিন্দু মহাসভারই সহোদর) যখন আছেন, তখন নিশ্চযই সর্ববিরোধীর এই প্রতিবিপ্লবের নাম হবে 'ন্যাশনাল রিভোল্ট'।

কিন্তু কেন? দেবীকুলমের নির্বাচনের পরে এই প্রতিক্রিয়া ফ্রন্টের কাছে এ সত্য স্পষ্ট যে কোনো খণ্ড বা সাধারণ নির্বাচনের পথে তারা কমিউনিস্টদের মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কৃত করতে পারবেন না (চাকো প্রভৃতি কংগ্রেস-পাণ্ডারা তা প্রকাশ্যেও বলেছেন)। অথচ আর একটি সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করাও তাদের পক্ষে নিরাপদ নয়, ভূমিসংস্কার ও নানা সংস্কার কায়েমী স্বার্থের শক্তি দুর্বলতর হবে, জনসাধারণের সম্মুখে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের (কংগ্রেস, পি-এস-পি, আর-এস-পি) অসাধুতার ও অক্ষমতার ইতিহাস আরও পরিষ্কার হবে, এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব-প্রতিপত্তি জন-সমাজে আরও বৃদ্ধি পাবে। পরে তাদের খর্ব করা আর সম্ভবই হবে না। তাই ছলে-বলে-কৌশলে, যে করেই হোক এখনই তাদের ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করতে হবে। স্বভাবতই মনে পড়ে,

এই জাতীয় কৌশলের দৃষ্টান্তই কি তিব্বতের লামাতন্ত্রও দেখিয়েছে। নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার চেষ্টায় জনশক্তি যখন প্রবল হতে চলেছে তখন তাকে বিনষ্ট করা প্রয়োজন। অবশ্য তিব্বতে গণতন্ত্র ছিল না, ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের বিধান ও ব্যবস্থা চালু আছে, দুই দেশের পার্থক্য তাই এক হিসাবে মৌলিক। এ কথা আমরা মেনে নিয়েছি। পালামেণ্ট-আশ্রয়ী গণতন্ত্রের মধ্য দিয়েই ভারতীয় সমাজ আপাততঃ আত্মবিকাশ করতে চায়, কিন্তু তার অর্থ কি এই কেন্দ্রে এবং রাজ্যে চিরদিন এই কংগ্রেসী ধনিক (উদার ও রক্ষণশীল) পার্টির নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অব্যাহত থাকবে? অর্থাৎ এক পার্টিরই রাজত্ব চলবে? কোথাও কোনো সময়ে, কোনো জনতার পার্টি নির্বাচন মাধ্যমে শাসন চালনার অধিকারী হলেও তাকে সে অধিকার দেওয়া হবে না? বরং ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে উড়িষ্যার রাজন্যদের, কিংবা কেরলায় থাণু পিল্লাইর মত লুব্ধ মন্ত্রি পুত্তলিকাকে। 'পালেমেণ্টাশ্রয়ী গণতন্ত্রের' স্বরূপ কমিউনিস্টদের অজ্ঞাত নয়। ভারতীয় বিধানতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা বিষয়েও ভারতের কমিউস্টরা সম্পূর্ণ অবহিত। কেরলার কমিউনিস্ট পার্টি তাই কেরলায় সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের কোনো প্রোগ্রামই প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেন নি। বুর্জোয়া উদারনীতির স্বীকৃত যে সংস্কারসমূহ প্রবর্তনে কংগ্রেস পার্টি চিরদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এবং কোনোদিন প্রবর্তনের চেষ্টা করেনি, কেরলা কমিউনিস্ট পার্টি সেই বহুস্বীকৃত চিরকাম্য সংস্কারই প্রবর্তনে অগ্রসর হয়েছেন। তারই নাম 'শাসনের সুযোগ নিয়ে কমিউনিস্টদের আত্মপ্রতিষ্ঠা'। তাই প্রতিক্রিয়ার বিদ্রোহ। তাতেই কংগ্রেস ও অন্যান্য পার্টির পালেমেণ্টারী গণতন্ত্র বিনাশের সংকল্প। বুঝা যায় ভারতের একটি প্রান্তেও যদি সত্যই ভূমি সংস্কার ও সমবায় গঠন আরম্ভ হয়, সীমাবদ্ধ প্রয়াসের ফলেও কমিউনিস্টরা নিজেদের আন্তরিকতার ও কর্মক্ষমতার প্রমাণ দেন, কেন্দ্রেও অন্যান্য রাজ্যের মত বিরোধী জেহাদ যদি কেরলায় সরকারী সাহায্যে হালকা করা হয়, শিক্ষায় দীক্ষায় যদি কংগ্রেস সোস্থালিস্ট ক্যাথলিক-মুসলিম প্রভৃতি দলগত ইতরামি ও ধর্মগত গোঁড়ামির 'স্বাধীনতা' আর না থাকে, শিক্ষায় ও শাসনের নানা বিভাগে যদি রাজনৈতিক সন্দেহভাজন বলে কমিউনিস্টদের প্রবেশ রুদ্ধ না করা যায়, সাধারণ মানুষ যদি ভয় ও ভ্রান্তি কাটিয়ে রাজনৈতিক বিচারে অভ্যস্ত হয়—হাঁ তাহলে—তাহলে কেরলার ক্যাথলিক, মুসলিমলীগ, নায়ার সাম্প্রদায়িক সমিতি এবং কংগ্রেস, পি-এস-পি, আর-এস-পি যোদ্ধাদের ঘোষণা

হল—'পরিত্রাণ' চাই। পার্লেমেন্টারী ডিমোক্রাসি নিপাত করাই প্রয়োজন—অস্ত্র সংগ্রহ কর, যোদ্ধা সাজাও, ছাত্রদের সামনে পাঠাও, গুণ্ডাদের ছুরি মারতে অভ্যস্ত কর, আর পরিবারের মেয়েদের সর্বাগ্রে রেখে দাঙ্গায় অগ্রসর হও, যাতে তাদের রক্ষার জন্য কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করে, দেশব্যাপী উত্তেজনা সৃষ্টির সুযোগ হয়।

ভারত রাষ্ট্র তিব্বত নয়। তবে প্রতিক্রিয়ার সম্মেলিত ফ্রন্ট এখানেও বিদ্রোহ করছেন। যেমন করেছেন। যেমন করেছেন তিব্বতে 'জাতীয় বিদ্রোহ'। যখনি যেখানে জনশক্তির ক্ষমতা পাবার মত কারণ ঘটে, তখনি সেখানে প্রতিক্রিয়াপন্থী বিদ্রোহ করবে, তার বিনাশের চক্রান্ত করবে। এ ঐতিহাসিক সত্য। এই সত্য কেরলায় রূপ গ্রহণ করছে পার্লেমেন্টারী ডিমোক্র্যাসি বিনাশের ষড়যন্ত্ররূপে।

কেরলার পরীক্ষা নিশ্চয়ই জনতার। কেরলার ও ভারতের জনতার। আর সেই জনতার মুখপাত্র রূপে নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট পার্টিরও পরীক্ষা। ভারতের 'পার্লামেন্টারী ডিমোক্র্যাসিকে' রক্ষার দায়িত্ব ভারতের কমিউনিস্টদের হাতে এসে পড়েছে। এই কারণে, অবিচলিত দৃঢ়তায় সেই সাধারণ কর্তব্য পালনের সূত্রেই, জনতার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে কোথাও যেন ভ্রান্তি না থাকে।

'তাৎক্ষণিক অনুবাদ'

সংবাদে প্রকাশ—পশ্চিম বাঙলার বিধানসভা গৃহে বক্তৃতাদি শ্রবণ সম্পর্কিত যে-সব নূতন প্রয়োগিক (টেক্‌নিক্যাল) ব্যবস্থা হচ্ছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে তিনটি ভাষায় তাৎক্ষণিক অনুবাদ-ব্যবস্থা। ইংরেজি, বাংলা বা হিন্দী এ তিন ভাষার যে ভাষাতেই বক্তা বক্তৃতা করুন, নেপথ্যকক্ষে তৎক্ষণাৎ সেই বক্তৃতার অনুবাদ অন্য দুইটি ভাষায় করা হবে ; এবং যে ভাষায় যিনি শুনতে চান তিনি ইয়ার-ফোন বা কানের যন্ত্র কানে পরে সেই নম্বরের সুইস টিপে বসলে মাইকের কথার মত সেই নেপথ্য-অনুবাদকের কথা তার কানে যাবে— অন্য ভাষার কথা কানে যাবে না।

এ ব্যবস্থা অবশ্য বিদেশে আন্তর্জাতিক যে কোনো সম্মেলনেই প্রায় গৃহীত হয়। প্রতিনিধি দু-তিন হাজার লোকের প্রত্যেকের জন্যই কর্ণযন্ত্রে ছড়াছড়ি, পাঁচ-সাতটি ভাষায় অবিরত অনুবাদ—এসব শুনতে-শুনতে বারেবারেই মনে হয়েছে—সাংস্কৃতিক বা সামাজিক যে-কোন সর্বভারতীয় আলোচনা পরিচালনা এরূপ প্রণালীতে মোটেই অসাধ্য নয়। নয়া-দিল্লীর 'বিজ্ঞান-ভবনে' এরূপ

প্রয়োগিক আয়োজন আছে—১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে 'এশীয় সাহিত্য সম্মেলনে' আমরা তার সার্থক ব্যবহারও দেখেছি। অবশ্য প্রায় দশ-বারো বৎসর যাবত আমরা কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে পূর্বাপর বলছিলাম—ভারতের লোকসভায় ও রাজ্যসভায়, এবং প্রয়োজন মতো রাজ্যসমূহের বিধান সভায়ও এরূপ তাৎক্ষণিক অনুবাদের ব্যবস্থা করা আবশ্যক; আর সেরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হলে বিভিন্ন ভাষাভাষী নিজ-ভাষায় বক্তৃতা করবার এবং অন্য ভাষা না জানলেও নিজ ভাষায় বক্তৃতা শুনবার সুযোগ লাভ করবেন। ভাষা-বিষয়ে অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করবেন। প্রধান প্রধান ভাষাগুলি (ইংরেজিই হোক, কি হিন্দী হোক) অনেকটা স্বাভাবিক পথে জাতীয় জীবনে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করবার মতো অবকাশ লাভ করবে। লোকসভা-রাজ্যসভায় তামিল সদস্যরা (যতদূর জানি বাঙালীরা কেউ বাঙলায় বলবার জন্য আগ্রহান্বিত নন) নিজ ভাষায় বক্তৃতা করতে পারলে ও শুনতে পারলে তাঁদের হিন্দীর বিরুদ্ধে, এমন কি, ইংরেজি স্বপক্ষেও, মনোভাব স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

বিধানসভায় এ ব্যবস্থা গ্রহণে মোট দুলক্ষ টাকার থেকেও অনেক কম ব্যয় হবে। অতএব, লোকসভা-রাজ্যসভা বা অন্য কোনো সর্বভারতীয় আয়োজনের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে বিশেষ বাধা আছে, একথা বোধহয় কেউ বলবেন না। আমরা পশ্চিম বঙ্গের কর্তৃপক্ষের এ জন্য সাধুবাদ করি। কিন্তু একটি কথা মনে হয়—ব্যয় কিছু বেশি হলেও নেপালীভাষীদেরও এরূপ সুযোগদান করা বাঞ্ছনীয়।

সরকারী ভাষা পরিচ্ছেদ

সন্তর্পনেই কথাটি উত্থাপন করছি—ভারতের সরকারী ভাষা বা 'অফিসিয়েল ল্যাঙ্গোয়েজ' পরিচ্ছেদ এখন কোন পর্বে? এ সম্পর্কে সঠিক কি সিদ্ধান্ত হয়েছে তা কি কেউ আমাদের জানাবেন? লোকসভার কমিটির দাখিল করা রিপোর্ট আজ পর্যন্ত আমরা দেখবার সুযোগ পাই নি। সংবাদপত্রে তার যে সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়েছিল, তা অবলম্বন করে কিছু বলা শ্রেয় মনে করিনি। ইংরেজির স্বপক্ষে মিস্টার অ্যান্থনির প্রস্তাব নিয়ে সে সময়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ হবার সম্ভাবনা ছিল। ভাষাবিষয় অশুভ উত্তেজনার ইন্ধন জোগানো একান্ত ভাবেই আমাদের অনভিপ্রেত। কিন্তু 'আষাঢ়ে মেঘাড়ম্বরের মতো' কিংবা 'অজাযুদ্ধের মতো' অ্যান্থনি বিতর্ক দেখছি বিলুপ্ত হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে 'সরকারী

ভাষা' সম্বন্ধীয় সমস্ত আলোচনাই হয়েছে একেবারে নিশ্চিহ্ন। হয়েতো অন্যবিধ উত্তেজনার কারণ জুটেছে, এবং রাজনীতি-ধুরন্ধরেরা সকলেই একটি 'মৌন-চক্রান্তে' জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে যোগদান করে ফেলেছেন। তাই আবার প্রশ্ন করি—'সরকারী ভাষা বিষয়ক' প্রশ্নে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে? লোকসভায় ও রাজ্যসভায় কি ভারতের বিধানসম্মত ইংরেজি সুদ্ধ প্রধান ভাষাগুলির এরূপ অনুমোদন ও তাৎক্ষণিক অনুবাদ ব্যবস্থা সম্ভব নয়? এবং কেন্দ্রের যে-সব আদেশ ঘোষণা আইন-কানুন জন-জীবনকে স্পর্শ করে কার্যত বরাবর তা প্রত্যেকটি প্রধান ভারতীয় ভাষায় পরিবেশন করা হচ্ছে, এখন কি তা পরিত্যক্ত হবে? অবশ্য 'কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষার' প্রশ্নের প্রধান গুরুত্ব আইন-কানুন, হাইকোর্টের ভাষা ব্যাপারে, চাকরির ভাষা বিষয়ে, আমরা তা জানি। কিন্তু সে সব প্রশ্নের কি কি সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা জানি না।

আর একটি কথাও এ সম্পর্কে আমাদের জানবার আছে। পশ্চিম বঙ্গীয় সরকারের নিকট প্রশ্ন করে এখনো উত্তর পাই নি।

কথাটি এই—পশ্চিম বাংলার আইন-সভার ১৯৫৮এর জুন-জুলাই সেশনে সর্বদলের সর্বসম্মতিক্রমে ভাষাবিষয়ক যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল, তাকে কার্যকর করবার জন্য কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে?

প্রস্তাবটির মর্ম এরূপ :

সরকারী ভাষাকমিশনের সুপারিশগুলি সম্বন্ধে বিধান সভা ও বিধান পরিষদের আপত্তি আছে। ভারতের ঐক্য ও প্রগতির জন্য সরকারী ভাষার সমগ্র প্রশ্নটি পুনর্বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। বিধান সভা ও পরিষদের অভিমত এই যে,

(১) বিশেষ বিশেষ আনুষ্ঠানিক কাজে ভারতসরকারে নির্দেশ মতো সংস্কৃত ব্যবহার করা উচিত।

(২) যতক্ষণ পর্যন্ত হিন্দী ও অন্য কয়েকটি ভারতীয় ভাষা ইউনিয়নের সরকারী ভাষা রূপে গ্রাহ্য না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজি ভাষাকেই সরকারী ভাষারূপে গণ্য করার জন্য পার্লামেণ্টে ব্যবস্থা করুন।

(৩) পশ্চিমবঙ্গ ও ইউনিয়ন বা অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিম বাঙলা রাজ্যের আদানপ্রদান দ্বিভাষিক পদ্ধতিতে চলবে—তার একটি হবে বাঙলা, অন্যটি ইউনিয়নের যখন যেটি সরকারী ভাষা বলে গ্রাহ্য হবে সেইটি। সংবিধান এভাবে সংশোধিত হউক।

(৪) ১৯৬০-এর মধ্যে বাংলাকে এ রাজ্যের সর্বকর্মে সরকারী ভাষা রূপে

গ্রহণের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হোক—যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ আবশ্যক মত ইংরেজিও বিশেষ স্থলে চলবে।

(৫) ভাষা শিক্ষার কোন ছক প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষায় গ্রহণযোগ্য ও কিভাবে তা প্রযোজ্য, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে পঃ বঃ সরকার তা স্থির করবেন।

(৬) শিক্ষাদানের ও পরীক্ষার ভাষা অবশ্যই বাঙলা হবে।

অবশ্য, ভাষিক সংখ্যাল্পদের মধ্যস্তরের শিক্ষা পর্যন্ত নিজ ভাষায় শিক্ষাদির দাবি স্বীকার করা হবে।

—আশা করি, এই সর্বদল-স্বীকৃত প্রস্তাবটি ইতিমধ্যে সর্বদলবিস্মৃত প্রস্তাব হয়ে ওঠে নি, অন্তত বাঙালী জনসাধারণ হতে দেবেন না।

গোপাল হালদার

PARICHAYA : June, 1959. Reg. No. C 3953

জয়ন্তী-সংকলন

[গল্প]

পরিচয়

পরিচয়-এর 'জয়ন্তী সংকলন' এখনো কিছু বিক্রয়ের জন্য আছে। প্রকাশকালে অনেকে দুঃখ করে জানিয়েছিলেন, মূল্যাধিক্যের জন্যে তাঁরা সংকলনটি সংগ্রহ করতে অক্ষম।

এই কারণে আমরা 'জয়ন্তী সংকলন' পরিচয়-এর অবশিষ্ট খণ্ডসমূহ **দু টাকা দামে** বিক্রয় করা স্থির করেছি। আগামী **৩১শে শ্রাবণ, ১৩৬৬** পর্যন্ত ক্রেতারা এই সুযোগ পাবেন

কর্মাধ্যক্ষ

পরিচয়

দাম : পঁচাত্তর নয়া পয়সা

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোরঞ্জন গুপ্ত

অশোক মুখোপাধ্যায়

অবজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সিদ্ধেশ্বর সেন

যুগান্তর চক্রবর্তী

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

গোপাল ভট্টাচার্য

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

গোপাল হালদার

আষাঢ় : ১৩৬৬

সূচীপত্র

২৮শ বর্ষ ॥ আষাঢ়, ১৮৮১ ; ১৩৬৬ ॥ ১২শ সংখ্যা

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং 'পরিচয়' কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়

২৮ বর্ষ ; ১২শ সংখ্যা

আষাঢ় ১৮৮১ ; ১৩৬৬

পাঁচজন আধুনিক কবি

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

কৃত্তিবাস থেকে গণনা করলে বাংলা কাব্যের বয়স প্রায় পাঁচশত বৎসর হতে চলল। এই সময়ের মধ্যে বাংলা কাব্যের ক্রম-পরিণতি সম্বন্ধে অনুধাবনযোগ্য ও আশা করি তা কেউ সুসম্পন্ন করবেন। কৃত্তিবাসের সময় বাংলা কাব্যের শিশু-কাল; তাহলেও সে শিশু বেশ কথা বলতে শিখেছে। মুকুন্দরাম সম্ভবতঃ শেক্সপীয়রের কাছাকাছি সময়কার, কিন্তু কত প্রভেদ উভয়ে! পদাবলীর যুগে বিদ্যাপতি—মৈথিলীতে ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি খাঁটি বাংলায় যা রচনা করলেন তাতে যে কাব্যমাধুর্য, মানবিকতা, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার সুর, পূর্বরাগ ও মিলনে দেহমনের ও বল্লভের সঙ্গে মিলনের মত ঈশ্বরমিলনেচ্ছায় যে আত্মার ক্ষুধা নিবারণ সন্ধান বিকশিত হয়েছিল তা সে কালের ও পরবর্তীকালের দেশী-বিদেশী কাব্যে বিরল। ভারতচন্দ্রের হাতে ছন্দগঠন ও ছন্দোবৈচিত্র্য, অনুপ্রাস ও বর্ণনাপটুতা অর্জন করেছে, বাংলা কাব্য কৌমার্যে উপনীত হয়েছে। কিন্তু সমসাময়িক বিশ্বকাব্যের তা অনেক পিছনে। তারপর বাংলা কাব্য কিছুকাল আর অগ্রসর হয়নি—যদিও রতি-বর্ণনাত্মক কাব্য আরও কিছু রচিত হয়েছে ও গানে ও ছড়ায় কিছু কৃতিত্ব এসেছে, এবং বাউল ও মরমিয়া কবিদের অভ্যুদয় হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে দেখা যায় ভারতচন্দ্র প্রবর্তিত ও চিরাচরিত ধারা থেকে মুক্ত হবার অধৈর্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃজন করে ও পয়ারকে ছাঁচে ফেলে মধুসূদন বাংলা কাব্যে দিলেন নূতন প্রাণস্পর্শ। সমসাময়িক বিশ্বকবিদের অনেক পশ্চাতে হলেও সে স্পর্শ কাব্যে নূতন তাৎপর্য এনেছিল। রবীন্দ্রনাথ দিলেন বাংলা কাব্যের প্রকৃত নবজন্ম। তা শুধু ব্যঞ্জনায়, বিষয়-বৈচিত্র্যে, রস ও কাব্যসম্পদে নয়। বাংলার ভাষাগত ধ্বনিতে যে সম্পদ আত্মগোপন করে ছিল যুক্তাক্ষর ও যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রার মর্যাদা দিয়ে ছন্দে তা তিনি ব্যক্ত করলেন। বাংলা কাব্যে নির্মিত হল আর এক ভুবন। পয়ার সম্প্রসারিত করলেন।

সৃষ্টি করলেন মুক্তছন্দ, বলাকার ছন্দ, গদ্যকবিতা। বাঁধ ভেঙে মন্দাকিনীর বন্যায় বাংলা কাব্যের উষর ভূমি প্লাবিত হল। তখনও কিন্তু বাংলা কাব্য রইল বিশ্বকাব্যের প্রায় ৫০ বছর পিছনে। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কাব্য যে অগ্রগমন সুসিদ্ধ করেছে তা পরম বিস্ময়কর। আধুনিক বাংলা কবিদের অশেষ কৃতিত্ব এবং বাংলা ভাষার অশেষ গৌরব যে, তাঁরা বাংলা কাব্যকে বিশ্বের আধুনিক কাব্যের সমপর্যায়ে তুলে এনেছেন। এ ছাড়া ছান্দসিকদের দুর্লঙ্ঘনীয় মাত্রা বিধিনির্দেশ লঙ্ঘন করে মাত্রাছন্দের ঐশ্বর্য পূর্ণ বিকশিত করেছেন; পয়ার ও মুক্তছন্দ বহুভাবে রূপায়িত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। বাক্যরীতি ও কাব্যরীতির বাহুবন্ধন হয়েছে। বাংলা কাব্য ভরাপালে জোয়ারের জলে ভেসে চলেছে। এখানে এটুকু স্মরণীয় যে ছন্দ বাংলা কাব্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

এই আধুনিক বাংলা কাব্যে যাঁরা রূপ ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁদের থেকে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী এই পাঁচজন, প্রথম শ্রেণীর কবি বা major poets বেছে নিয়ে শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠি আলোচনা করেছেন তাঁর সদ্য প্রকাশিত "আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়" গ্রন্থে।* আধুনিক কবিতা ও আধুনিক বাংলা কবিতাপ্রসঙ্গে আলোচনা নিতান্ত অপ্রতুল নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে মোহিতলাল, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, অমলেন্দু বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি কবি ও সমালোচকবৃন্দের যে সকল আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে তা যথেষ্ট সৌষ্ঠবশালী। গ্রন্থকর্ত্রী এসব আলোচনার যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছেন ও এ ছাড়া ইংরাজীতে প্রকাশিত আধুনিক কাব্য আলোচনা ও বিশ্লেষণেরও যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছেন। এ ভিন্ন তিনি বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করতে ও সাহায্য নিতেও পরাঙ্মুখ হন নি। ফলে অনধিক ৪০০ পৃষ্ঠার এই বইটি সম্যক ও মনোগ্রাহী হয়েছে। গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধির থিসিস রূপে রচনা করে লেখিকা ঐ উপাধি লাভে কৃতকার্য হয়েছেন। বাংলা কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে ডক্টরেট উপাধিলাভের জন্য যে সকল রচনা অনুমোদিত হয়েছে বলে জানা আছে তার মধ্যে এ বইখানি একটি বিশিষ্ট স্থানলাভের উপযোগী। এটাও আনন্দের কথা যে, আধুনিক বাংলা কাব্য বিষয়টি ডক্টরেট

* আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়: দীপ্তি ত্রিপাঠি; নাভানা।

উপাধির জন্য নির্বাচিত হল। বইটির রচনায় যে শ্রমসাধ্য উদ্যম ও অধ্যবসায় নিয়োগ করেছেন তার জন্য লেখিকাকে সর্বান্তঃকরণে সাধুবাদ জানাই।

এই দীর্ঘায়তন বইটি সম্বন্ধে প্রথমেই আমাদের মনে হয়েছে যে লেখিকার নির্বাচনে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বাদ দেওয়া হয়েছে কেন। অবশ্য কবি বা বিষয় নির্বাচনে তাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তবু আধুনিক বাংলা major poets-দের কাব্য নিয়ে আলোচনা যদি অভিপ্রেত হয় তবে প্রেমেন্দ্রকে কেমন করে বাদ দেওয়া যায়—আমার বুদ্ধির অগম্য। বুদ্ধদেব বসুকে যখন নির্বাচন করা হয়েছে তখন প্রেমেন্দ্র মিত্র না হবেন কেন? ভূমিকায় লেখিকা প্রেমেন্দ্র মিত্রের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সে কথা আলাদা। ইঙ্গিত করেছেন যে রবীন্দ্র-যুগ ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র মাত্র সেতুস্বরূপ। তাহলেও তাঁর কাব্য-আলোচনার দাবি অনস্বীকার্য। ভূমিকা দীর্ঘ হয়েছে এবং অনেক কথার ও অনেক প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ হয়েছে কবিসমূহের আলোচনাংশে। এ সবের কিছু সংকোচ সাধন করে প্রেমেন্দ্রের কাব্য সংক্ষেপে স্থান দেওয়া চলত। নির্বাচিত পাঁচজন কবির মত তিনিও কাব্যকে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত করার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। অন্যদিকে ত্রিশ-চল্লিশের অন্তবর্তী ও পরবর্তী যাঁরা পূর্বোক্ত আধুনিক কবিদের প্রভাবান্বিত ও যাঁরা প্রভাবান্বিত নন, কিঞ্চিত আলোচনা সঙ্কোচ করে তাঁদেরও দু-চার জনকে—যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সমর সেনকে—স্থান দেওয়া যেতে পারত, আর তাহলে গ্রন্থটি অধিকতর সুসম্যক হত।

আধুনিক কাব্যের সংজ্ঞা ও লক্ষণ কি, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ও দেশী-বিদেশী সাহিত্যিকদের মতামত নিয়ে লেখিকা বিস্তর আলোচনা করেছেন। আধুনিক বাংলা কবিরা যেহেতু ইংরাজী ও ফরাসী কবিদের প্রভাবান্বিত তাই লেখিকা এলিয়ট, ওয়েন, রিল্কে, পাউণ্ড, স্পেণ্ডার, বোদলের, মালার্মে, ভালেরির কাব্য থেকে উদ্ধৃত করে বিশদ আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে আলোচনা করেছেন এলিয়টের কাব্য। আধুনিক বিদেশী কাব্যে প্রবেশের পক্ষে লেখিকার আলোচনা বেশ সহায়ক সন্দেহ নেই; তবে আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রবেশেও কি এত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন আছে? অন্যান্য যে সকল বস্তুর প্রভাব আধুনিক বাংলা কাব্যের উপর বিস্তৃত হয়েছে লেখিকা তার মধ্যে অন্তর্গত করেছেন—বিজ্ঞানের বিপ্লব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। ঐতিহাসিক ধারার গতি-পরিবর্তন, জীবতত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ, ফ্রয়েড-ইয়ুংয়ের মনস্তত্ত্ব ও মার্কসীয় দর্শন।

কিন্তু প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হিসাবে তিনি গণ্য করেছেন রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্তির প্রয়াস।

যুগধর্ম ও যুগ-লক্ষণের ছাপ কাব্যকলা, শিল্পকলা প্রভৃতিতে সুস্পষ্ট মুদ্রিত হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? সমাজ, রীতিনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, চিন্তাধারা, সকলই কাব্যে ও শিল্পে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু লেখিকা যে যে বিষয়ের নাম করেছেন কবিকে ও পাঠককে সেই সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভে বিজ্ঞ হতে হবে একথা ভাবলে হতাশ হতে হয়। মনে হয় এ বিষয়ে লেখিকা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের দুরূহতার যে নালিশ আছে তার একটি কারণ স্বরূপ তিনি চিন্তাধারার "উল্লম্ফনের" কথা উল্লেখ করে তুলনা দিয়েছেন, বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক কর্তৃক আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রনের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে উল্লম্ফনের। কবিতায় পারম্পর্যহীন "উল্লম্ফন" আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারপ্রসূত নয়। বাংলা ছড়াতেও তা যথেষ্ট দেখা যায়—

কমলাপুরীর টিয়েটা,
সূর্যিমামার বিয়েটা।
সূর্যি গেছে পাটে—
কদমতলার হাটে—
আয় নন্দ হাটে যাই, এক খিলি পান কিনে খাই।
পানে দেছে মৌরিবাটা, ইস্কাবনের বিবি আঁটা।

কমলাপুরীর টিয়ের সঙ্গে সূর্যিমামার বিয়ের কোনও পারম্পর্য নেই; পানের খিলিতে মৌরি দেওয়ার সঙ্গেও তাসের বিবির কোন পারম্পর্য নেই। অবশ্য পানের আকৃতি ও ইস্কাবনের আকৃতিতে সৌসাদৃশ্য আছে। কাব্যে এরকম অসংলগ্ন বিনিসুতোর মালাগাঁথা আছে: সেখানে সুতো নেই, কিন্তু মনের, অনুভবের যাতায়াত আছে। ইলেক্‌ট্রনের "উল্লম্ফন" অন্যবিধ বস্তু। প্রকৃতপক্ষে প্লাঙ্কের আবিষ্কার হল শক্তির atomicity; অর্থাৎ একমাত্রা, দুইমাত্রা ইত্যাদি ক্রমে শক্তির আয়ব্যয় হতে পারে, কিন্তু মাত্রাংশে পারে না। সঙ্গীতের তালে একমাত্রা, আধমাত্রা, সিকিমাত্রা, শ্রুতি ইত্যাদি হতে পারে, শক্তি-কণায় তা অসম্ভব। এক কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ইলেক্‌ট্রন যে উল্লম্ফন করে এ সিদ্ধান্ত আর একজনের; ইনি হলেন নিল্‌স বোর। যাহোক ইলেক্‌ট্রনের "উল্লম্ফন" ও চিন্তার উল্লম্ফন একজাতীয় বস্তু নয়। তাছাড়া ইলেক্‌ট্রনের জগৎ এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুর জগৎ। লেখিকা Principle of Indeterminacyর কথাও উল্লেখ

করেছেন। সেও হল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগতের বিধি। দেখা গেছে আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ স্থূল জগতের বিধির সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ সূক্ষ্ম জগতের বিধির অসামঞ্জস্য আছে। কিন্তু এই আপাতবিরোধ সম্বন্ধে মনে রাখতে হবে যে বৈজ্ঞানিক বিধির কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এগুলি প্রত্যক্ষ জগতের আচারব্যবহারকে শ্রেণীবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দেখাবার জন্য মানুষেরই মন থেকে সৃজিত বিধি। ফলত ওগুলি অভিজ্ঞতারই সংক্ষিপ্তসার। যেটুকু অসামাঞ্জস্য স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের মধ্যে দেখা গেছে তার একটা সমন্বয় সম্ভব, এইটেই মোটামুটিভাবে বিজ্ঞানের ইঙ্গিত। এলিয়টের—

"time present and time past

Are both present in time future"-এর ব্যাখ্যায় আপেক্ষিকতাবাদ প্রয়োগেও তিনি ভ্রান্ত হয়েছেন। এতে আপেক্ষিকতার কোনও ছায়াপাত নেই; এ হল সূক্ষ্মীকৃত কালের সম্মুখীন গতি; বিপরীতমুখী হবার কোন উপায় নেই। আপেক্ষিকতাবাদেও নেই। "প্রত্যেক মুহূর্ত চিরন্তনকালে বিস্তৃত হয়ে আছে"—বিজ্ঞানে অর্থহীন। বের্গসঁর Elan vital-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন ওটি ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। বের্গসঁ ছিলেন দার্শনিক ও তাঁর মতকে ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও মতেই বলা যায় না।

গ্রন্থকর্ত্রী আধুনিক বাংলা কাব্যের লক্ষণ হিসাবে ২৪টির ফর্দ পেশ করেছেন। সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। সে সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাবমুক্তির প্রয়াস। তৎসম ও বিদেশী শব্দের বহুল ব্যবহার ও তাদের সঙ্গে সাধারণ বাংলা শব্দের মিশ্রণ, বেদ-পুরাণ, রোম গ্রীসের উপাখ্যান, ইংরাজী কাব্য নাটক প্রভৃতি ও মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ থেকে বাক্যাংশ ও ভাবাংশ আহরণ করে নিজ কবিতায় ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন, বাক্যরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ, ছন্দ মিশ্রণ ও ছন্দে নানা নতুন নতুন পরীক্ষা। এ ছাড়া আধুনিক যুগ-লক্ষণাক্রান্তি ধ্রুবত্বে সংশয়, নৈরাশ্য ও ক্লান্তি, নগ্নকাম, মার্কসীয় দর্শন ও সাম্যবাদ এবং বিশেষতঃ মননধর্মিতা—এ লক্ষণগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সকল বিষয় নিয়ে লেখিকা সযত্নে ও যোগ্যতাসহকারে আলোচনা করেছেন। বেদ-পুরাণাদি থেকে আহরণ ও কাব্যে তা স্থাপন মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃকই আরব্ধ হয়েছিল—তবে সে অন্যভাবে ও গোটা কবিতাকে। আর আধুনিক বাংলা কবিরা যেভাবে আহরণ ও সে সব স্বীয়কবিতায় গ্রোথিত করেছেন সে অন্যতরভাবে।

ভূমিকায় লেখিকা দীর্ঘ আলোচনা করেছেন কাব্যে রেনেসাঁস ও রোমাণ্টিসিজম সম্বন্ধে ; কিন্তু তা ইংরাজি কাব্য আশ্রয়ে নিষ্পন্ন হয়েছে ! এ বিষয়ে বহু ও সম্যক আলোচনা আছে। প্রশ্ন জাগে, বাংলায় ক্ল্যাসিক্যাল—রেনেসাঁস—রোমাণ্টিক ধারা কোনগুলি ? ভারতের চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও সঙ্গীতপদ্ধতি থেকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে কি উক্ত যুগধারা বা তার কাছাকাছি ধারার কোনও নির্দেশ পাওয়া যায় না ? পদাবলীর কবিদের ও ভারতচন্দ্রকে বোধহয় রেনেসাঁসের অন্তর্গত, মধুসূদনকে রোমাণ্টিক ও নিও-রেনেসাঁস এবং রবীন্দ্রনাথকে বোধহয় রোমাণ্টিকের অন্তর্গত করা যেতে পারে।

সে যাহোক, আধুনিক বাংলা কাব্যে আধুনিক বিদেশী কাব্যের লক্ষণ সমধিক প্রকটিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আধুনিক কবিতা সবিশেষভাবে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল। এও তিনি বলেছেন, "আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতা কী, তাহলে আমি বলব বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখা। আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।" একেই তিনি অন্যত্র বলেছেন, "মনোহারিতা নয় মনোজয়িতা," "লালিত্য নয় যাথার্থ্য।" এই নিদর্শনই আধুনিক কাব্যকে রোমাণ্টিক কাব্য থেকে পৃথক করেছে। কাব্যে মনের সংক্রমনকে বৈদিক ঋষিরা আহ্বান করেছিলেন। ঐতরেয় উপনিষদে আছে "ওঁ বাঙমে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্" ; বাক্যে এসে আমার মন প্রতিষ্ঠিত হোক, মনে প্রতিষ্ঠিত হোক বাক্য। কাব্যই ছিল তখনকার বাহন ; সেই আদি কবিদের বিজ্ঞপ্তি আধুনিক কাব্যে সুসঞ্জাত হয়েছে। কাব্য আজ সৌন্দর্য সাধনার ধ্যান ছেড়ে দিয়ে মননধর্মিতার পথ গ্রহণ করেছে। এই মননধর্মিতার জন্য আধুনিক কাব্য দুরূহ হয়েছে সন্দেহ নেই : দুরূহতা অংশত এ যুগের সমৃদ্ধ জ্ঞান প্রতিফলন জনিত, অংশত প্রতীক ব্যবহার ও মানসিক ক্রিয়ার অসম্বদ্ধতার প্রতিফলন জনিত।

আধুনিক কবিদের মধ্যে লেখিকা প্রথম আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসুর কাব্য ও বলেছেন যে বুদ্ধদেবই আধুনিক কাব্যযজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন ও নৈষ্ঠিক ঋত্বিকের মত আজও সে অগ্নি রক্ষা করে চলেছেন। আধুনিক কাব্য পথে কে প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন সে কথা আধুনিক কবিদের বিচার্য। কিন্তু বুদ্ধদেব কাব্যে যে অগ্নি জ্বেলেছেন সে হল প্রধানত যৌবন

ও যৌনকামাচারের অগ্নি। এক বিষয়ে বৈদিক ঋত্বিকদের সঙ্গে তাঁর তুলনা যথাযথ হবে—বৈদিক উপনিষদকার ঋষিদের কোনও sex inhibition ছিল না—সাধারণতঃ আধুনিক কাব্যেও নেই। কিন্তু বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসুর কামার্ত কাব্যে এ-বস্তু একেবারেই অনুপস্থিত। লেখিকা বলেছেন, চল্লিশোর্ধে প্রৌঢ়ত্বের সম্মুখীন হয়ে অগ্নি নির্বানোন্মুখ হওয়ার সম্ভাবনায় কবি বিষণ্ণ। কবির নায়ক দেহজ কামনা ও প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী, "বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন," "নির্লজ্জ কামুক···শুধু চাহে ইন্দ্রিয় মিলন," তাঁর নায়িকা "রক্ত মাংসের নারী"—"চর্ম সাথে চর্মের ঘর্ষণ একমাত্র সুখ যাহাদের!" এ প্রসঙ্গে লেখিকা বুদ্ধদেবের উপর বোদলের, লরেন্স ও রসেটির প্রভাবের বিষয় আলোচনা করেছেন। যাহোক, উগ্র যৌনকামনাই বুদ্ধদেবের কাব্যের একমাত্র বিষয়বস্তু নয়; তাঁর কাব্যে আছে জীবনে যা-পাওয়া-যায়-এর মাধুর্যময় স্বীকৃতি :

"সব কেড়ে নিতে পারেনি দিনের ফাঁকি
তবু আছে রাত, তবু কিছু আছে বাকি,"

আছে সমাজচেতনা—জীবিকান্বেষণ,—

"প্রতিদিন পিঠে পড়ে জীবিকার হাতুড়ি—"

মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলাভীতি, ধর্ষিত অপমানিত আফ্রিকার জাগরণ, শহর-চেতনা, এরোপ্লেন কর্তৃক দেশ-দেশান্তরের মধ্যে রাখীবন্ধন, ইত্যাদি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তাঁর কবিতায়। লেখিকার মতে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যের ঋতুবদল হয়েছে "দময়ন্তী" কাব্যে ও তারপর "রূপান্তর" ও "দ্রৌপদীর শাড়ি"র মধ্য দিয়ে এসে সমাপ্ত হয়েছে "শীতের প্রার্থনা ও বসন্তের উত্তর"-এ। (c.f. If winter comes can spring be far behind ?) যৌবন অভিযানের পর্ব শেষ হয়ে প্রেমের শান্তি রূপে শান্তি পেয়েছেন।

বুদ্ধদেবের একটি বড় প্রিয় বস্তু হল চুল। নারীর চুলকে তিনি তাঁর কাব্যে বারবার আবাহন করেছেন—লেখিকা তার অনেকগুলি উদ্ধৃত করেছেন। গ্রন্থকর্ত্রী শেষাংশে বুদ্ধদেবের কাব্যের শিল্প-প্রকরণ আলোচনা করেছেন। বস্তুত তিনি তাঁর নির্বাচিত প্রত্যেক কবিরই কাব্য ও শিল্প-প্রকরণ পৃথক করে আলোচনা করেছেন। বুদ্ধদেবের শিল্প-প্রকরণে প্রধান হল বাক্যরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ, বিদেশী শব্দ ব্যবহার ও পয়ার ছন্দে দক্ষতা।

লেখিকার মতে মাত্রাছন্দের চেয়ে পয়ার ও স্বরপ্রধান ছন্দেই তাঁর দক্ষতা অসামান্য। পয়ার-প্রসঙ্গে লেখিকার উক্তি হল—বুদ্ধদেব বলেছেন পয়ারের আছে "অফুরন্ত সঙ্কোচন-সম্প্রসারণশীলতা"। লেখিকাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই পয়ারের অশেষ সঙ্কোচন-সম্প্রসারণ ক্ষমতার কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই প্রথম বিবৃত করেছিলেন। পয়ারে বুদ্ধদেব যুক্তাক্ষরকে একমাত্রা দুমাত্রা উভয় হিসেবেই ব্যবহার করে ছন্দরীতির পরিধি বাড়িয়েছেন। কবিতায় মধ্যমিলের কথাও লেখিকা উল্লেখ করেছেন দৃষ্টান্ত সমেত।

জীবনানন্দকে গ্রন্থকর্ত্রী আখ্যা দিয়েছেন 'এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি'। কবি বিভ্রান্ত হোন বা না-হোন পাঠককে অনেক সময় তাঁর কবিতার পূর্ণ অর্থোদ্ঘাটনে বিভ্রান্ত হতে হয়। লেখিকা বলেছেন অতি আপাত সুখবোধ্য হলেও তাঁর কাব্য সংশয়-সংকুল, অন্তর্দ্বন্দ্বপূর্ণ ও দুর্জ্ঞেয়ও। তাঁর কাব্যে এসেছে ক্লান্তি, নৈরাশ্য ও বিশেষ করে মৃত্যু-চেতনা—morbidity। মূল্যবোধ শেষ হয়েছে জীবনের, ফসল গিয়েছে ফলে, বুড়ী হয়েছে পৃথিবী, মনে এসেছে গভীর শূন্যতাবোধ। এত অবসন্নতা থাকলেও তাঁর কাব্যে পরম আকর্ষণীয়তা আছে। সে আকর্ষণ তাঁর কাব্যের চিত্রকল্পতায়। বাংলার মাঠ ঘাট নদী পুকুর ক্ষেত উঠান কুঁড়েঘর, বন-জঙ্গল আকাশ ও বাংলার বাইরে মরু বালি পাহাড় সমুদ্র প্রভৃতি সম্বলিত landscapes, রং ও তুলি দিয়ে আঁকার মত। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন জীবনানন্দের কবিতা চিত্ররূপময়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবিতা স্বাদ-স্পর্শ-গন্ধময়ও। এ বিষয়ে আধুনিক কবিতায় একটা নতুন ধারা তিনিই এনে দেন। তাঁর অনেকগুলি কবিতা শিকারের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। লেখিকা তাঁকে Impressionist school-এর অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন, আবার Surrealist পর্যায়েও স্থান দিয়েছেন। রং ফলানোর কৌশলে যেমন এক ঝলকে সমগ্র রূপের একটা পরিচয় পাওয়া যায়, এও যেমন বর্তমান, বাস্তব ও অবাস্তবের মিশ্রণও আছে তাঁর কাব্যে। বন্যজন্তু, পাখি—প্রাণীজগৎ, কাঁদাখোঁচা, বুনোহাঁস, ডাহুক, হরিণ, বাঘ—শিকারের প্রধান কটি বস্তু—চিল, জোনাকি ইত্যাদি পুনঃপুনঃ তাঁর কাব্যে সংযোজিত। লেখিকা মনের অবচেতন স্তর সঞ্জাত কবিতার ও প্রতীক ব্যবহারের ও মিশ্রণের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক চেতনার কথাও তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আর্য ঋষিদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে আকাশ ভ্রমণ, ব্যাবিলন, উর, আসিরিয়া, সিংহল, ভূমধ্যসাগর, বিদিশা, শ্রাবস্তী, বিদর্ভ, পারস্য প্রভৃতির ব্যবহার তাঁর কাব্যে মিলে। এ সবের জন্য তাঁর কাব্যকে কতটা ইতিহাস-চেতন

আখ্যা দেওয়া যেতে পারে তা বিবেচনা সাপেক্ষ। অনেক মৌখিক প্রচলিত শব্দ ব্যবহারের কথাও লেখিকা উল্লেখ করেছেন, যথা—ছুঁড়ি, জ্যান্ত, সেমিজ, শরীর ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, নারী সম্পর্কে শরীর শব্দ পড়ে তিনি ও শব্দটিকে নতুন আবিষ্কার করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে "ক্লান্তি শরীর জুড়ায়ে"। সুতরাং কাব্যে শরীর শব্দের ব্যবহার নূতন নয়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ছুঁড়ি শব্দের ব্যবহার আছে—"যত সব···ছুঁড়ি হাঁকিয়ে জুড়ি গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে"। জীবনানন্দ কর্তৃক বরিশালের ক্রিয়াপদ "আছিল" শব্দের ব্যবহার (যথা "টলতে আছিল")-এর কথা লিখেছেন। ভাওয়ালের কবির কবিতায় এ রকম ব্যবহার পূর্বেই হয়েছে—"স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে, এ দেশ তোদের নয়।" জীবনানন্দের কাব্যে শব্দালঙ্কারের সম্পদ ছাড়াও ছন্দে এক রকম বর্ণাঢ্যতা ও ইন্দ্রিয়ঘনতার ছাপ ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ছাড়া তিনি বলেছেন, ছন্দে ক্লান্তি ও অবসাদের মন্থর লয় সম্মোহন আনে। অনেকের মতে রবীন্দ্রকাব্যের রোমান্টিসিজমের রাস্তা ছেড়ে সম্পূর্ণ নূতন পথে পদক্ষেপ প্রথমে জীবনানন্দই করেন। তাঁর কাব্য—বিশ্বাস সৌন্দর্য ও অতীন্দ্রিয়তার ধ্যান ত্যাগ করে। আলঙ্কারিকদের আদর্শ পিছনে রেখে, ইন্দ্রিয়ঘন দৃষ্টিতে, প্রতীক ও মননীয়তা অবলম্বনে, বেদনা ব্যর্থতা ও মৃত্যু স্বীকৃতির পথে নূতন মূল্যবোধের সন্ধানে যাত্রা করেছে।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যকে লেখিকা বলেছেন ভ্রষ্ট আদমের আর্তনাদ। তিনি স্বর্গচ্যুত কিন্তু মর্ত্যে অবিশ্বাসী। তাঁর মতে "কবি যেন নিঃসঙ্গ চূড়ায় দাঁড়িয়ে নিঃসীম শূন্যতা নৈরাশ্য-ভারাতুর নয়নে অবলোকন করছেন।" প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আর্তনাদ সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের সুর নয়। অবিশ্বাস মর্ত্যে নয়, অবিশ্বাস অতীন্দ্রিয়ের স্বর্গলোকে। সুধীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, তিনি ক্ষণবাদী। নিছক প্রত্যক্ষ বর্তমানই সত্যের সবটুকু, তদতিরিক্ত শুধু 'ফাটা ডিমে তা দেওয়া'। লেখিকা যে নব্যবিজ্ঞানের প্রভাবের কথা অন্যত্র উল্লেখ করেছেন তার অন্তর্গত আপেক্ষিকতাবাদ, অনিশ্চিতবিধি ও ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলাঙ্কের (entropy) ছায়াপাত প্রকৃতপক্ষে সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় সুস্পষ্ট। বিবর্তনবাদ ও ফ্রয়েডের প্রভাবও তাঁর কাব্যে বর্তমান। কিন্তু লেখিকা মনে করেন—"ফ্রয়েডের সমস্ত রচনা হয়তো সুধীন্দ্রনাথ গভীরভাবে অনুশীলন করেননি।" নিশ্চয়ই এ মন্তব্য অবাস্তর।

গ্রন্থকর্ত্রী সুধীন্দ্রনাথের "কাব্যের মুক্তি" থেকে বহুল উদ্ধৃত করেছেন। "কাব্যের মুক্তি" ও সুধীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রবন্ধে বিরল মনস্বিতা প্রোজ্জ্বল।

এ সকল প্রবন্ধ সুধীন্দ্রনাথের কাব্যরসাস্বাদনের সহায়ক। তিনি বলেছেন তিনি প্রেরণাকে বর্জন করে অভিজ্ঞতাকে বরণ করেছেন। অন্যত্র বলেছেন কাব্য হল সমুদ্র, এবং কবি নদীমাত্র। সমুদ্রে আত্মনিমজ্জন চাইলে একটা বিশেষ দিকে সে বইতে বাধ্য। আবার বলেছেন বর্তমান শতকের মূলমন্ত্র কাব্যে অবৈকল্য ও অকপটতা।

যে নিঃসঙ্গতার কথা লেখিকা উল্লেখ করেছেন তার উৎস সম্ভবত উপরোক্ত কথাগুলিতে। সুধীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের নালিশ তার দুরূহতায়। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন যে দুর্বোধ্যতা পাঠকের আলস্যজনিত, তার জন্য কবি দায়ী হতে পারেন না। সুধীন্দ্রনাথের দুরূহতা অংশত অপ্রচলিত তদ্ভব ও আভিধানিক সংস্কৃত শব্দের অত্যধিক ব্যবহার প্রসূত, আর অংশত কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আহরিত প্রতীক ও প্রসঙ্গ-সূত্র ব্যবহার করার। কিন্তু এ-সকল দুরূহতা ভিন্ন আধুনিক কাব্যের গত্যন্তর নেই।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান সম্পদ হল তাঁর অত্যাশ্চর্য জমাটবাঁধা সংহতি। বাংলা কাব্যে এই গাঢ়বদ্ধতা সম্পাদন তাঁর বিশিষ্ট দান। এ সংহতি ছাড়া শব্দযোজনা ও ব্যবহার-রীতির যাদুকর তাঁর কাব্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ। নিজেকে তিনি বলেছেন মালার্মের শিষ্য ও মালার্মের মত তিনি "শব্দের অন্তঃশীল আবেগে" বিশ্বাস রাখেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কি এরই কথা বলেন নি ধ্বনিতত্ত্বে ?

"মূল্যহীন সোনা হয়, তব স্পর্শে হে শব্দঅপ্সরী
............মুক্তি পায় অনির্বচনীয়"

প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাব্যে একত্রিত হয়েছে সংস্কৃত কাব্যের অসামান্য সংহতি, মধুসূদনের ক্ল্যাসিক্যাল গাম্ভীর্য, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ও ধ্বনির চমৎকারিত্ব এবং মালার্মে-ভালেরির প্রতীকীসুন্দর ও নিখিল নাস্তির মর্মবাণী। এ ছাড়া, "ছন্দে সুধীন্দ্রনাথের দখল অসামান্য"—লেখিকার এ মন্তব্য অতি সত্য। যুক্তাক্ষরের ঠাসবাঁধা পয়ারে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছেদ ও যতিপাতে, তেমনি মাত্রাছন্দে, সনেটে তাঁর কলাকৌশল অপরূপভাবে বিকশিত। "অর্কেস্ট্রা" কবিতাগুচ্ছের ছন্দোবৈচিত্র্য এক অভিনব সৃষ্টি ; এই ঐকতানের মানসিক সঙ্কল্প ও কাব্যে তার রূপায়ণ উভয়ই অভিনব। কথ্য-ভাষায় রচিত ছন্দেও তাঁর দক্ষতা অবিসংবাদী। লেখিকা একটা নমুনা দিয়েছেন—

"বেখাপ্পা ঠিক তেমনিতর
যেমন, ধরো, তাপ্পি-দেওয়া ফোতোবাবুর কাঁধে
নিলেম থেকে দাঁওয়ে কেনা ঘরোওয়ানার আসল জমিওয়ার ॥"

এর সঙ্গে তুলনা করা যাক যুক্তাক্ষরের ঠাসবোনা—

"মেঘার্ত পাণ্ডুর শশী।　শঙ্কাকুল শ্রাবণ শর্বরী ;"

লেখিকা বলেছেন "তান প্রধানেই তাঁর প্রতিভা" ; অবশ্যগ্রাহ্য একথা।

গ্রন্থকর্ত্রী বলেছেন সুধীন্দ্রনাথ সম্ভোগের ও উত্তর-সম্ভোগ অবসাদের কবি। মনে পড়ে গেল, পরিহাসছলে একদিন তাঁকে আমি বলেছিলাম যে তাঁর কাব্য—অতৃপ্তির মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ। নিতান্তই সেটা পরিহাস, কিন্তু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে তিনি অতৃপ্তি ও নৈরাশ্যের বায়ুমণ্ডল ত্যাগ করে যেতে পারেননি। নিজের সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথ একস্থানে লিখেছেন যে, রোম্যান্টিক বৃত্তিকে তিনি যেমন প্রত্যাখ্যান করেছেন তেমনি বৈনাশিক বলেই তিনি কর্মে আস্থাবান। লেখিকা তাঁকে অস্তিত্ববাদী (Existentialist)-দেরও অন্তর্গত করেছেন। যাইহোক পূর্বরাগ, সম্ভোগ প্রভৃতি যেমন তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু তেমনি বহিপ্রকৃতি, সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়, সামাজিক গতিপ্রগতির মতবাদ এবং যুদ্ধের নির্মমতা—এ সকলও তাঁর কাব্যে স্বাক্ষর রেখে গেছে। প্রকরণাংশে লেখিকা কবির শব্দচাতুর্য, ছন্দদক্ষতা প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

লেখিকার আলোচনায় একটা জিনিস বাদ পড়েছে, সে হল সুধীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিদেশী কবিদের অনুবাদ। একটি-দুটি নয়, তাঁর কৃত শেক্সপীয়রের ২৩টি সনেটের অনুবাদ আছে ; হাইনেরও বহু কবিতার এবং মালার্মে, লরেন্স প্রভৃতি অন্যান্য কবিদেরও অনুবাদ করেছেন তিনি "প্রতিধ্বনি"তে। শুধু উৎকর্ষের জন্য নয়, এগুলি বিশেষ করে আলোচনার যোগ্য, যে কবির মতে বাংলায় বিদেশী কাব্যের "তর্জমা ও মূল রচনার সমস্যা সমান"। অর্থাৎ re-created poetryতেই বাংলা তর্জমার সাফল্য। হাইনের তর্জমা থেকে চার ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

"ষণ্ড, স্বয়ং শিবের বাহন, জানে না দেবভাষা।
বাচস্পতি শেখেন নি তো বয়েৎ খাসা খাসা।
কোণারকের সুন্দরীদের পাছা বেজায় ভারী।
বাঙালীদের নাকের আবার নাইকো বাড়াবাড়ি।"

'হায় কি হোলো'র (তর্জারও নামকরণ করা যেতে পারে) এই নব্য সংস্করণ

হাইনের নির্জলা অনুবাদ না সুধীন্দ্রনাথের re-created poetry-দক্ষতার চূড়ান্ত নিদর্শন ?

বিষ্ণু দের কাব্য সম্বন্ধে লেখিকা বলেছেন—আধুনিক কাব্যের ক্লান্তি জিজ্ঞাসা সংশয় নির্বেদ প্রভৃতির বাষ্পপুঞ্জের নীহারিকা থেকে উদিত হয়েছে বিষ্ণু দের উদ্দীপ্ত কাব্য-তারকা। তিনি বলেছেন সম্পূর্ণ আধুনিক হলেও তিনিই প্রথম অস্তিবাদী "হাঁ-ধর্মী" কবি। কবিতা লেখার প্রায় শুরু থেকেই তিনি রোম্যান্টিকতাকে ও আতিশয্যকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন ও আধুনিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ নিজস্ব পথ বেছে নিলেন। বিষ্ণু দের শ্লেষ স্ফূর্তি-জারিত শ্লেষ, যেন স্বর্ণ-জারিত মকরধ্বজ, কাব্যের ব্যাধি ও বার্ধক্যনাশক।

বিষ্ণু দের কাব্যের বৈশিষ্ট্য হল পূর্ববর্তী ও সাম্প্রতিক স্বদেশী ও বিদেশী কবিকুলের রচনা থেকে ভেঙে পুনর্গ্রহণের ও ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বুননের কারিগরী। এ বিষয়ে তিনি এলিয়টের কাছে কিছুটা ঋণী ও নিজেই তিনি ঋণ স্বীকার করেছেন। কিন্তু এলিয়টের ঐতিহ্য-সম্পৃক্ত অথচ বিষাদভারাতুর কাব্য থেকে বিষ্ণু দের আনন্দোচ্ছল কাব্যের কত তফাত। বিষ্ণু দের কাব্যে আরাগঁর প্রভাবও লেখিকা সযত্নে আলোচনা করেছেন। বিষ্ণু দের ঐতিহ্য সকল দেশের ও সকল কালের কাব্য-নাটক-উপখ্যানাদির দ্বারস্থ। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, গ্রীস-রোমের ইতিহাস, শেক্সপীয়র, দান্তে, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ—কারও কাছে হাত পাততে দ্বিধা করে না। শুধু সাহিত্য নয়, সঙ্গীত, রাগিণী, চিত্রকলা, ভাস্কর্য—সব কিছু থেকে সংগ্রহ করে আপন কাব্যে নূতন অর্থে, নূতন পরিপ্রেক্ষিতে বুনে দিতে ও মিশ্রণ করতে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। অতি বিচিত্র ও ও বিস্তৃত তাঁর মণিমুক্তাখচিত কাব্য-ভুবন। ইংরাজীর মত বাংলা ভাষা যদি সর্বদেশীয় হত, সন্দেহ নেই বিষ্ণু দে তাহলে জগতের আধুনিক সেরা কবিদের মধ্যে গণ্য হতেন।

উপরোক্ত প্রকরণ, প্রতীক ব্যবহারের বাহুল্য, চূড়ান্ত মননধর্মিতা। কাব্য-দর্শন-ইতিহাস-বিজ্ঞান প্রভৃতি থেকে বহুল আহরণ—ও চিন্তাধারায় পারম্পর্যনাশ, লেখিকা যাকে বলেছেন উল্লম্ফন, এগুলির জন্য তাঁর কাব্যকে আবার দুর্বোধ্যতার ও ক্লান্তিকারক-এর নালিশ শুনতে হয়েছে। তাঁব বিখ্যাত কবিতা 'ঘোড়সওয়ার' -এর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন সুধীন্দ্রনাথ, সয়ীদ আইয়ুব ও অন্যেরা। লেখিকা ব্যাখ্যা করেছেন যে ঘোড়সওয়ার বিপ্লবের প্রতীক, চোরাবালিতে আসা সামাজিক অচল পরিস্থিতি বিদূরিত করে বন্ধ্যাত্বের অবসান ঘটানোর প্রতীক। এ ব্যাখ্যা

মেনে নেওয়া শক্ত : যদিও অবশ্য বিষ্ণু দের অন্য বইয়ে অভাবের নিষ্পেষণ, মার্কসীয় দর্শন, সাম্যবাদ, বিপ্লব প্রভৃতির প্রসঙ্গ ও প্রতীকসমূহ বর্তমান। বিপ্লব ঘোড়ায় চড়েই আসুক আর হাতিতে চড়েই, চোরাবালিতে তার নিশ্চিত চূড়ান্ত সমাধি ; বন্ধ্যাত্ব দূর করার অবসর কোথা ? তাছাড়া, জোয়ারের জল নেমে যাওয়াতে নিমজ্জিত চড়ার প্রকাশ—কবিতায় আছে, "জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার"—কিসের প্রতীক ? আমার মনে হয় সহজ ব্যাখ্যাই রসাস্বাদের পক্ষে যথেষ্ট, তা হল রতির জন্য আহ্বান। বহু প্রতীকের মিশ্রণে রসোপলব্ধি ব্যহত হয়েছে। প্রতীক ব্যবহারে দোষ-ত্রুটির জন্য সুধীন্দ্রনাথও নালিশ করেছেন বিষ্ণু দের 'অপসার' কবিতা সম্পর্কে।

শিল্পপ্রকরণ প্রসঙ্গে লেখিকা বিষ্ণু দের ছন্দনৈপুণ্য, বাক্য ও কাব্যরীতির মিশ্রণদক্ষতা, দেশজরীতিতে শব্দপ্রয়োগ, ক্রিয়ার পূর্ণ রূপ ও অব্যয়ের ব্যবহার প্রভৃতির জন্য স্তুতি জানিয়েছেন। কথ্যরীতি মাত্রাছন্দ প্রয়োগের উপযুক্ত নয় ধরে নেওয়া হত, কিন্তু তাতেও বিষ্ণু দে মাত্রাছন্দ যোজনা করে ছন্দের নবকলেবর দান করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের মতে "মাত্রাছন্দের মত রাবীন্দ্রিক যন্ত্রকে নিজের সুরে বাজিয়েছেন।" বস্তুত বিষ্ণু দে মাত্রাছন্দের সীমা প্রসারিত করেছেন যুক্তাক্ষরের দু-মাত্রা একমাত্রা বিধিকে স্বাধীনতা দিয়ে, এবং মাত্রাছন্দ ও স্বরবৃত্তের মিশ্রণ সাধন করে। সুধীন্দ্রনাথও—হয়তো নিজের অলক্ষ্যে, একই কবিতায় দুমাত্রা ও একমাত্রারূপে যুক্তাক্ষরকে ব্যবহার করেছেন। বিষ্ণু দে ও আধুনিক কবিরা মাত্রা ও ছন্দঘটিত ছান্দসিকের বিধিবদ্ধতা অগ্রাহ্য করে ছন্দের লুক্কায়িত তাগিদ ও সম্ভাব্যতার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত করেছেন।

বিষ্ণু দের শব্দ যোজনার অন্তরালে কাব্যের যাদু সৃজন অতুলনীয়। কে না নীচের পংক্তি কটির যাদুস্পর্শে অভিভূত হবেন ?

নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া।
স্তনচূড়া দিলো ক্ষীণ কটীতটে ছায়া।
স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা ?

*　　*

পাহাড় এখানে হাল্‌কা হাওয়ায় বোনে
হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে।

*　　*

ঘুম ভাঙে প্রতিদিন কৃশবৎসা কৃশতী উষায়

কবির নিজের ভাষায়—

"বাহুতে মেলে না তাকে, চোখের মণিতে
থেকে থেকে পড়ে শুধু ছায়া,
ভাবি তাকে বাঁধি কোন্ শিল্পের গণিতে
অধরাকে দিই নিজ কায়া !"

বিষ্ণু দে কর্তৃক বিদেশী কবিদের অনুবাদ-গ্রন্থ "হে বিদেশী ফুল" সম্বন্ধে লেখিকা কোনও আলোচনা করেন নি। শেক্সপীয়র, এলিয়ট, আরাগঁ, হাইনে, রিল্‌কে, ইয়েট্‌স, ব্লেক প্রভৃতি বহু কবির অনুবাদ তিনি করেছেন। বলা বাহুল্য তাঁর অনুবাদের ধরণ সুধীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হাল্কা হাতের তুলির টান—অনুবাদগুলিকে করেছে অপরূপ সুন্দর।

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনায় গ্রন্থকর্ত্রী বলেছেন যে তাঁর কবিমানস দ্বিধাবিভক্ত—একদিকে তিনি আধ্যাত্মিক—"রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক চেতনার একমাত্র উত্তরাধিকারী", অপরদিকে তাঁর মন বিজ্ঞানচেতন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ তাঁর কাব্যরচনার কেন্দ্র। বস্তুচেতন হলেও তিনি মরমিয়া কবি; বস্তু ও বাহ্যজগৎ, অন্তরীক্ষ, প্রকৃতি, শব্দ-গন্ধ, নদী-পাহাড়—এমনকি মানুষের হাতের তৈরি যা কিছু—রাস্তা ঘরবাড়ি রেল—সব কিছুরই বিকাশ তাঁর কাব্যের মর্মস্থান স্পর্শ করে, কাঁদায় না, ব্যথা দেয় না—সাড়া জাগায়। তাঁর বিজ্ঞান ও যন্ত্রচেতন মন সমুদ্রকে দেখে কারখানা, আকাশকে ঘড়ি, প্রাণকে জাহাজ, দেহকে ইঞ্জিন। দেহকে ইঞ্জিন দেখা, বাউল কবিদের দেহতত্ত্বের গানেও আছে :

"আমার এ-মানব দেহ ইস্টিমার"

আময় চক্রবর্তীর কবিতায় আছে স্পুটনিক বিশ্ব নাগরদোলায় ঘুরছে, আইনস্টাইনী শূন্যে জ্যোতিগুচ্ছ একাকার, লক্ষ ভোল্ট বিদ্যুৎ, জীবাণু, কোটি গ্রহ-সূর্যির ঝলকা, নর্তন-আবর্তন-পরিবর্তন ইত্যাদি। এদিকে আবার তিনি বিজ্ঞান সমস্যারও তাল পাননি, জিজ্ঞাসা করেছেন, "বলো বিজ্ঞানিক এটা বা ওটা হয় তাতে কিসের পরিচয়", "শুধু কেমন করে নয়, কেন ?" এগুলি মনে করিয়ে দেয় কান্তকবির লেখা :

"ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে
দেখি, উপাধি পেল সে ক'টা কেন'র জবাব শিখে।
চিনি কেন মিষ্টি এত, নিমটা কেন এমন তেতো ?
চুম্বক কেন লৌহটানে, টানে না মণিমানিকে ॥"

যা হোক অমিয় চক্রবর্তীর বিজ্ঞানচেতন মানস অপূর্ব কবিতা সৃজন করেছে, যথা :

"চাঁপার কলিতে ধরো অনুবীক্ষণ যন্ত্র
খুলে যাবে কেমন দিগন্তে দিগন্তে
জ্যামিতিক গড়নের অঙ্কন।"

বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসা যতই থাক অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য প্রত্যক্ষ দৃষ্টির কাব্য, যে দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম ও বৃহৎ, অতি নিকট ও দূর, কোমল ও কঠিন, দেশ-বিদেশ, পল্লী, শহর ও প্রবাস, ভূলোক ও দ্যুলোক সবই বিম্বিত হয়। অমিয় চক্রবর্তী দুঃখজয়ী কবি। তিনি নিজে বলেছেন, যা দেখা গেল, তার ·····একটি আক্ষরিক পরিচয় সাক্ষীর বিমুগ্ধ ভাষায় মুদ্রিত। এই পরিচয়ে ক্ষোভ নেই, নৈরাশ্য নেই, দুঃখের রেশ থাকলেও তার আকুলতা নেই ; আছে অনন্ত উপলব্ধি।

"মানুষের প্রাণে তবু অনন্ত ফাল্গুনী
তুমি যেন বলো, আর, আমি যেন শুনি"

এরোপ্লেন, অনন্ত বিশ্ব, আইনস্টাইনের শূন্যতা প্রভৃতি অতি-বৃহৎও যেমন তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে তেমনি অতি ক্ষুদ্র পিঁপড়েও তাঁর কাব্যে বাদ পড়ে নি—

"আহা পিঁপড়ে ছোট পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
আহা পিঁপড়ে ছোট পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক",

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাপাঠে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "যথার্থ যা সহজ তাই দুঃসাধ্য, তোমার এই লেখায় সেই দুরূহ সহজ অনায়াসের প্রতীতি নিয়ে দেখা দিয়েছে।" হয়তো বলা অন্যায় হবে না এই অনায়াস প্রতীতির প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ থেকেই পাওয়া। শুধু এ প্রেরণা কেন অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে, বাক্যভঙ্গিতে ও বহু বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রকৃষ্ট। কিন্তু তাঁর কাব্য সাক্ষ্য দেয় যে তিনি রবীন্দ্রপ্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন। অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে হপকিন্স ও আর দু-একটি বিদেশী কবির প্রভাবের কথাও লেখিকা আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মিস্‌টিসিজম্‌ থেকে অমিয় চক্রবর্তীর মিস্‌টিসিজমের প্রভেদ দেখাবার জন্য লেখিকা নীচের কটি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন :

"বক্র খেজুর শাখে
খড়খড়িয়ে বেঠিক হাওয়া ডাকে
শুষ্ক খোয়াই ডম্বরু তার মরুর সুরে বাজায়
কাঁটালতা রৌদ্রফুলে সাজায়।"

এতে মিস্‌টিসিজম্‌কে ডেকে আনবার প্রয়োজন ছিল না। এ হল objective realityর "সহজ অনায়াস প্রতীতি"। এই অনায়াস প্রতীতিই আছে নীচের উদ্ধৃতিতেও :

"হঠাৎ একী প্রকাণ্ড রোদ ! যবের শীষের আগা
মাটির দাহে শ্যামল তবু, সবুজ বিকাশ জাগা।"

লেখিকা বলেছেন কাব্যে অমিয় চক্রবর্তী চারটি মহাদেশকে একত্রিত করেছেন ; চারটি মহাদেশের এত বিচিত্র প্রত্যক্ষদর্শন ও অভিজ্ঞতা—ছোট ও বড় জড়ো হয়েছে। ছন্দশিল্পেও অমিয় চক্রবর্তীর অভিনবত্ব—পয়ার, মুক্তকছন্দ, গদ্যকবিতা, বাক্যরীতি ও বাক্যরীতির মিশ্রণ প্রভৃতিতে—অবিসংবাদিত। তাঁর ছন্দের স্বকীয়তা ও বাক্যবিন্যাস রচনা করে, "কানের অচেনাপটে ভাষার বুনুনি," জাগায় আধুনিক কাব্যের "রঙিন আগুনি কাঁচে—ঘন মায়া, ঘন মায়া।"

তিব্বতীয় গীতিকাপঞ্চক

॥ ১ ॥ যদিও আমরা নিকটতম
ও তার হৃদয়—তাকে জানা, খুঁজে নেওয়া
যদিও নিকটতম আমরা
যেন এক অঙ্গুলি রেখে, ভূমিতলে
নক্ষত্রের দূরত্ব গণনা ॥

॥ ২ ॥ এমন যে সুবর্ণপালক হংস
এমন যে সুবর্ণপালক হংস, অধিরাজ
আকাশের দিব্যদেবতা
ঊর্মিমালার সাগরে সম্মোহনে, সেও
ঝাঁপ দিয়ে নামছে মৃত্যুতে ॥

॥ ৩ ॥ হ্রদে বিম্বিত চাঁদিনী
হ্রদে বিম্বিত চাঁদিনী
ও-যে ভাসল মরকত-ঢেউয়ে
আমি বাঁধি না দুবাহু ঘিরে
তার মুখপানে চেয়ে রই ॥

॥ ৪ ॥ যদি হতে এমন পুতুল
নিয়ে যেতে পারি না যখন, ভালোবাসা
তবে রেখে যাব কি তোমায় চলে—সখী, না
যদি হতে তুমি এমনি পুতুল, এতটুকু
তবে ভরে যে নিতাম জেবে, আমার কামিজে

॥ ৫ ॥ সৌন্দর্য আকুল স্থলপদ্ম
সৌন্দর্য আকুল স্থলপদ্ম
রজতশিখরে, তুঙ্গ শৈল হাওয়ায়
হিমের করকা ঝরে, ঝড়ে
তবু মুগ্ধ, নয়নাভিরাম

আকুলাকিশোরী উপত্যকায়
কেন ফুটল ফুল নিয়ে বিকীরণ গগনপটে
সরোজিনী জাগে যেন তোমার হৃদয়
ঋতুরাজ, প্রেমের মন্ত্রের কথা রটে ॥

অনুবাদ : **সিদ্ধেশ্বর সেন**

Chinese Literature পত্রিকা থেকে।

চতুর্দিক স্মৃতিরেখা

যুগান্তর চক্রবর্তী

॥ অমল প্রভাতে

অমল প্রভাতে আমি জাগিয়াছি, তুমি তা জান না।
জান না তোমার কবি আজ একা অমল প্রভাতে
যাবে বলে জাগিয়াছে। তুমি তার নীরব দুহাতে
আঙুলে আঙুলে কুটে, ফোটালে যে-ফুলের বিছানা
সেথা তুমি ঘুমে আছ, আছ ঘুমে আপন আদরে,
আপন বিকাশে স্ফুট, হে আমার একাকী জাগার
অমল প্রভাতময় ঘুমে ভোর, হে মুখ আমার,
জান না তোমার ঘুম মেশে আজ আমার জাগরে।

অমল প্রভাতে আমি জাগিয়াছি, তুমি না জানিলে।
ঘুমে, জলস্রোতে, যায় জাগরণে আমার প্রবাস।
যায় ঘুমে অন্তঃপুরে, হে আমার বিরোধ, বিকাশ,
দৃষ্টিদলে জেগে আছ সহজ জলের কোলে, নীলে।

অমল প্রভাতে আমি জাগিয়াছি, তুমি তো জান না
চতুর্দিকে স্মৃতিরেখা—সে তোমারই নিজ হাতে বোনা

॥ সূর্যাস্ত বিরহ

হে ফেরানো মুখরেখা, চতুর্দিকে স্মৃতিরেখা জ্বলে।
মর্মভেদী গোলাপের আর্তনাদ পশে কি শ্রবণে,
কিছু বালিকার ফুল্ল কোলাহল আছিল পিছনে,
দেখ দ্রুত নিভে গেল তারা সব, নিভে গেল বলে

নিভে গেল চতুর্দিকে প্রখর, উজ্জ্বল রেখাগুলি।
দূরে জলরেখা, দূরে তটরেখা অজ্ঞাত অস্তিমে
যায়, মুছে যায় দূরে পদ্মরেখা আনত নীলিমে,
প্রাচীন মালঞ্চ ঘুরে পথরেখা নেভায় গোধূলি।

হে ফেরানো মুখরেখা, আদরে ও মুখ ফেরাবে কি,
ফেরাবে আদরে, ঘুমে, চতুর্দিকে বিরহে আমার।
ক্রুর উদ্‌যাপিত, কর উন্মোচিত, শেষ নগ্নধার।
আড়ালে উৎসব জাগে : কার মুখ, আমার, আমি কি।

হে ফেরানো মুখরেখা চতুর্দিকে স্মৃতিরেখা জ্বলে।
দেখ, তমস্বিনী পোড়ে ক্ষমাহীন তোমার কজ্জলে।

গভীরতম তোমাকেই

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

সুস্মিতা, আমার স্বপ্নগুলো আবার চোখ খুলল
তুমি আমার এ-দগ্ধ দৃষ্টি দেখে ভয় পেয়ো না
আমার এ-দুহাত অনেক কিছুই তছনছ করেছে
ছায়া থেকে গভীরতর ছায়ায় হাত বাড়িয়েছে
স্তব্ধতায় গভীরতম তোমাকেই পাওয়া গেল

আমি ফিরে আসি রাত্রির পদধ্বনির মতো
আমি খুলে যাই হঠাৎ সকালের জানালার মতো
পর্দাটা সরিয়ে দিলে আমাকেই দেখা যায়
দৃষ্টি ঘুরেফিরে আসে আমার পূর্ণতাকে ছোঁওয়ার জন্যে
কিন্তু আলোকের অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হয় না
আমি ফিরে আসি নতমুখ নৈঃশব্দ্যের মতো

তোমাকে স্পর্শ করি তোমার মুখ তোমার হাত
তোমার চোখে লোকালয়ের উত্তাপ উচ্ছ্বাস
তীব্র শিখার মতো আমি কেঁপে কেঁপে তোমাকেই দেখেছি
তোমার চোখে উচ্ছ্বাস উত্তাপ তোমার দেহে
তারপর ছায়া থেকে গভীরতম ছায়ায় হাত বাড়িয়েছি

অবশেষে গভীরতম তোমাকেই পাওয়া গেল
আমার দেহজ ইচ্ছার প্রতি কেন্দ্রে তোমার আবর্তন
আবার দৃষ্টি ঘুরেফিরে আসে তোমার পূর্ণতাকে পাওয়ার জন্যে
কিন্তু রক্তমাংসের অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হয় না

এই বাহির পৃথিবী আকাশ ধূলিধূসরিত পথ
অসংখ্য নারীপুরুষ সন্তানসন্ততি প্রেমিকপ্রেমিকা
জীবনের রহস্যময় হাত কলঙ্কিত ঠোঁট নগ্ন ঝরণা
রক্তাক্ত পদচিহ্ন টুকরো দেহ শোক মৃত্যু মিথুন জন্ম
এই পৃথিবী এই আকাশ এই ধূলিধূসরিত পথ

•

সুস্মিতা, তোমার পূর্ণতাকে পাওয়ার জন্যে
আমার দৃষ্টি আবার ঘুরেফিরে আসে
আমার এ-দগ্ধ দৃষ্টি দেখে ভয় পেও না
আমার এ-দুহাত অনেক কিছুই তছনছ করেছে
তারপর ছায়া থেকে গভীরতম ছায়ায় হাত বাড়িয়েছে
অবশেষে স্তব্ধতায় গভীরতম তোমাকেই পাওয়া গেল।

শতাব্দীর তীরে

গোপাল ভট্টাচার্য

শত শতাব্দীর তীরে বারংবার আমার হৃদয়
ভ্রান্তির কুয়াশা দেখে ভ্রান্তিভরা ঘুমে শ্রান্তি খোঁজে
অন্তিম আমার হাতে সে উৎসের অঙ্গীকার দিয়ে
নীড়ের পাখির কাছে সমুদ্র সংগীতে পূর্ণ হয়।
তারপর মৃত্যুর হিম নির্জনতা পায়, তাকে বোঝে
আর তারই মাঝে দেখে প্রতিবিম্ব নিজেরি কেবল
(হাওয়াহারা ছায়া-ছায়া আলোর নিশীথে নৌকা জল
যেমন দেখায় ছবি রহস্যের গভীরে ডুবিয়ে)

নিঃশব্দে সময় চলে শূন্য সাদা মেঘের মতন,
আজকে রেশমকীট কেটে ফেলে নিজের খোলস,
দর্শনে আমার ছবি আমাকে বিদ্রূপ ছুড়ে ছুড়ে
ক্রান্তিকালের ক্লান্তি ফেলে দিয়ে তুলে ধরল মন ;
তাকে তুলে নিয়ে দেখি খেলা করে আঠারো বয়স
আমার ভিতরে, চলি অনাগত শতাব্দীর তীরে
তাকে পার হতে হতে ঝড়ে আর মলয় সমীরে
অসংখ্য তৃষ্ণাকে মুক্তি দেব এক অনাগত সুরে।

জিজ্ঞাসার শান্তি এই পৃথিবীতে প্রশ্নের তিমিরে
উধাও। এবং তাকে নিয়ে তুমি পৃথিবী নতুন
পাবে না, প্রয়াস তরে থেমে যায় নির্বোধ নির্বাণে
একটু সরিয়ে তাকে অনন্ত এ শতাব্দীর তীরে
দ্যাখো ইউলিসিস তুমি অন্তহীন তোমার ফাল্গুন
পশ্চাতে শীতের কাছে ছুড়ে দেয় তোমার মৃত্যুকে
এবং হাজার প্রশ্ন সম্ভাবনা ঘুম ভেঙে বুকে
সমুদ্রের ঢেউ তোলে জীবনের অন্য এক গানে।

ত্মাখো ও কাদের চোখে তোমার নিশ্চিত সূর্যোদয়
নিষেধের গণ্ডি ভেঙে চলেছে তাদের তরী তাই,
হিসেব রাখি না আজ কত গান জাগে, কত গাই—
নিজের ফুলগুলি গুনতে কৃষ্ণচূড়া শুধু ক্লান্ত হয়।

সূর্যের কনিষ্ঠ গ্রহ

অশোক মুখোপাধ্যায়

সূর্য এবং তার নবগ্রহস্বরূপা নটি কন্যাকে নিয়ে সৌর-সংসার। গ্রহদের জন্মরহস্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানী মহল এখনও কোন ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। তবে বিভিন্ন মতবাদ থেকে তাদের মোটামুটি একটা বয়স আন্দাজ করা যায়। তা হল আনুমানিক তিনশো কোটি বছর। অবশ্য যুক্তিতর্কের পরোক্ষ প্রমাণের ওপরই এই অনুমান প্রতিষ্ঠিত। এর কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের একান্ত অভাব।

কিন্তু সূর্যের সর্বকনিষ্ঠ গ্রহটি সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নয়। তার নাড়িনক্ষত্র থেকে শুরু করে জন্মের খুঁটিনাটি ইতিহাস বিজ্ঞানীদের নখদর্পণে। কারণ তাঁরাই তাকে গড়েছেন। মাত্র কয়েক মাস আগে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের দোসরা জানুয়ারী ভারতীয় সময় রাত্রি ১০টা ৩২ মিনিটে তার সৌরদেহীতে রূপান্তরের ব্রাহ্মমুহূর্ত।

আবৃতিতে ক্ষুদ্রতম এবং বয়সের বিচারে নবীনতম হয়েও এই ক্ষীণকায় গ্রহটি সম্বন্ধে আমাদের গর্ব এবং ঔৎসুক্যের অন্ত নেই। কারণ সে মানুষের মণীষা এবং সৃজন-প্রতিভার চরমোৎকর্ষের এক অপার্থিব সাক্ষ্য হয়ে মহাকাশে বিচরণ করছে।

কৃত্রিম গ্রহের খুঁটিনাটি

সৌরজগতের এই কৃত্রিম দেহীটি বিশেষিত হয়েছে 'ম্যেচ্‌তা' অভিধায়। ম্যেচ্‌তা শব্দের অর্থ স্বপ্ন। তার মোট ওজন ১,৪৭২ কিলোগ্রাম অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ মন। আর পরিমাপক যন্ত্রপাতি, তড়িতোৎস এবং ধারক-আধারের মিলিত ওজন হল ৩৬১·৩ কিলোগ্রাম। এক বিশাল উপবৃত্তাকার পথের অন্যতম নাভিবিন্দুতে রেখে সূর্যকে সে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। প্রদক্ষিণ কাল মোটামুটি পনেরো মাস। উপবৃত্তটির উৎকেন্দ্রিকতা (eccentricity) ·১৪৮। তার কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে একই সমতলে অবস্থিত। কিন্তু দুইয়ের পরাক্ষ (major axis) পরস্পরের সঙ্গে ১৫ ডিগ্রী কোণে তির্যক হয়ে আছে।

ম্যেচ্‌তার গতিপথ নির্দিষ্ট হয়েছে পৃথিবী এবং মঙ্গলের মধ্য দিয়ে। কক্ষের বৃহত্তম ব্যাস প্রায় ২১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৬০ হাজার মাইল। নিকটতম অবস্থানে

মঙ্গল থেকে তার দূরত্ব হবে প্রায় ৯৪ লক্ষ মাইল। গত ১৪ই জানুয়ারী ম্যেচ্‌তা সূর্যের সবচাইতে কাছে অর্থাৎ অনুস্থর অবস্থানে গিয়েছিল। তখন পরস্পরের দূরত্ব ছিল ৯ কোটি পনেরো লক্ষ মাইল। ঐ অবস্থানে তার গতিবেগও ছিল সর্বাধিক—সেকেণ্ডে ১৯.৮৮ মাইল। সূর্য থেকে তার দূরতম অবস্থান হবে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে। তখন তার সৌরদূরত্ব এবং গতিবেগ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২ কোটি ২৫ লক্ষ মাইল এবং সেকেণ্ডে ১৭ মাইলে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কৃত্রিম গ্রহটি পৃথিবীর সমীপবর্তী হবে এবং বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, তখন সে শক্তিশালী দূরবীক্ষণযন্ত্রের প্রত্যক্ষগোচর হতে পারবে। গ্রহটির অন্তিম পরিণাম সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যদ্‌বাণী করা সাধ্যাতীত। হয়তো তার গতিবেগ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে পেতে সে একদিন সূর্যমণ্ডলে ঝাঁপিয়ে পড়বে, অথবা নভোচারী উল্কার সঙ্গে সংঘর্ষে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। আবার এমনও হতে পারে যে, নিজ কক্ষে সূর্যপ্রদক্ষিণ কালে সে কোনও এক সুদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর পরিক্রমণ পথে এসে উপস্থিত হবে এবং তার মাধ্যাকর্ষণের টানে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে উল্কার মত জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মেচ্‌তাকে ঊর্ধ্বাকাশে প্রক্ষেপ

ম্যেচ্‌তা সেকেণ্ডে কিঞ্চিদধিক সাত মাইল বেগে ঊর্ধ্বাকাশে প্রক্ষিপ্ত হয়। ৩৪ ঘণ্টা পর ২ লক্ষ ২০ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে সে চন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম হয়। সেই অবস্থায় তাদের দূরত্ব ছিল মাত্র ৪,৬৬০ মাইল। এই সময় বস্তুটির গতিবেগ কমে কমে সেকেণ্ডে মাত্র ১.৫২ মাইলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এটা আরও কিছু কমে সেকেণ্ডে ১ মাইলের কাছাকাছি এলেই তার আর সূর্য-প্রদক্ষিণ সম্ভব হত না, সে চন্দ্রের উপগ্রহে পরিণত হত। কিন্তু সেকেণ্ডে ১.৫২ মাইল গতিবেগের দরুণ সে চন্দ্রে প্রভাবান্বিত ক্ষেত্রকে সহজেই উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে এবং মানুষের গড়া প্রথম কৃত্রিম গ্রহের মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে। ৫ই জানুয়ারী গ্রীনিচ মিন টাইম সময়ানুসারে সকাল সাতটা পর্যন্ত—অর্থাৎ যখন সে মোট ৩ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেছিল—তখনও তার বেতার-সংকেত বার্তা পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছিল। তারপরই সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। ৭ই জানুয়ারী ৯০ লক্ষ মাইল পথ পরিভ্রমণের পর ম্যেচ্‌তা নিজেকে সূর্যের চারদিকের কক্ষপথে স্থাপিত করে।

চার পাল্লার রকেট

গ্রহটিকে বহিরাকাশে নিক্ষেপ করার জন্য ঠিক কি ধরনের ইন্ধন ব্যবহৃত হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তবে এটুকু জানা গেছে যে, চার পাল্লার রকেটের সাহায্যে প্রয়োজনীয় গতিবেগ দান করা হয়েছে। একটিমাত্র রকেটের পরিবর্তে পিঠে-পিঠে-চাপানো রকেটগোষ্ঠি ব্যবহার একাধিক কারণে সুবিধাজনক। উর্ধ্বারোহণের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি রকেট মূল দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে নেমে আসে বলে তার ওজন ক্রমশই হ্রাস পেতে থাকে। প্রথমে সর্বনিম্ন রকেটে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উর্ধ্ব চাপের সৃষ্টি করা হয়। একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠবার পর তার স্খলন ঘটে। তখন নিচের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রকেটের কাজ শুরু হয়। অতঃপর তারও নেমে আসার পালা। এমনিভাবে সবকয়টি রকেটের কার্যক্রম একে একে সম্পন্ন হয় এবং তারা উর্ধ্বগামী বস্তুকে হাল্কা করে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করে। এই হল প্রথম লাভ। দ্বিতীয় লাভই হচ্ছে আসল। দেড় টন ওজনের কোনও বস্তুকে সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে ছুড়ে দেওয়া এখনও আমাদের যন্ত্রবিদ্যায় অনায়ত্ত। এটা একমাত্র ধাপে ধাপে করাই সম্ভব এবং তারই জন্য বহুপাল্লা রকেটের উদ্ভাবন। বহুপাল্লার রকেটের তাৎপর্য একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে উপলব্ধি করা যেতে পারে। মনে করা যাক, একটি উড়োজাহাজ চলছে ঘণ্টায় ৫০০ মাইল বেগে। এ অবস্থায় তার মধ্য থেকে বন্দুকের নল বার করে গতির দিক করে গুলি ছোড়া হল। ধরা যাক, গুলিটা বন্দুকের নল থেকে ঘণ্টায় ২০০০ মাইল বেগে প্রক্ষিপ্ত হল। কিন্তু এটা তার একান্তই আপেক্ষিক গতিবেগ। যেহেতু উড়োজাহাজের সঙ্গে বন্দুক নিজেও আগে থেকেই ঘণ্টায় ৫০০ লাইল বেগে ধাবিত হচ্ছিল, সেহেতু গুলির প্রকৃত বেগ হবে ঘণ্টায় (২০০০+৫০০) অর্থাৎ ২৫০০ মাইল। বহু পাল্লার রকেটের কার্য-পদ্ধতির মূলনীতিও অনেকটা এই। প্রথম রকেটের বিস্ফোরণে যে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়, দ্বিতীয় রকেট তা বাড়িয়ে তোলে। তৃতীয় রকেটের কার্যারম্ভের পূর্ব পর্যন্ত গতিবেগ থাকে প্রথম ও দ্বিতীয় রকেট প্রদত্ত গতিবেগের মিলিত যোগফল। আর তৃতীয় রকেটের বিস্ফোরণ সমাপ্তির শেষে তা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এমনিভাবে ধাপে ধাপে—পর্যায়ক্রমে বাড়িয়েই রুশ বিজ্ঞানীগণ সেকেণ্ডে সাত মাইলেরও অধিক বেগে গ্রহটিকে মহাকাশে ছুড়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

কিন্তু প্রয়োজনীয় গতিবেগ সৃষ্টিই একমাত্র সমাধানযোগ্য সমস্যা, এমন ধারণা পোষণ করলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। প্রকৃতপক্ষে শেষতম রকেটটিকে পূর্ব-পরিকল্পিত কক্ষে নির্ভুলভাবে স্থাপন করাই হল সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। ধাতুবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, রেডিও-ইলেকট্রনিকস, টেলিমেকানিকস, অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান এবং আরও অনেক শাখার পূর্বলব্ধ এবং সর্বাধুনিক তথ্যাবলীর সুষ্ঠু এবং নিখুঁত সমন্বয়সাধনই কৃত্রিম গ্রহ-সৃষ্টির প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। যে সব সূত্র এবং গণনাপদ্ধতি এতে প্রযুক্ত হয়েছে—এই সঙ্গে তাদের নির্ভুলতাও নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া এই সাফল্যের সঙ্গে জড়িত ছিল যে সকল দূর-নিয়ন্ত্রিত বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, তাদের অকল্পনীয় সূক্ষ্মতা কারিগরিবিদ্যার বিস্ময়কর উৎকর্ষেরই পরিচয় দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক পোস্ট যে উক্তি করেছে তা উদ্ধৃতিযোগ্য :

To build a huge spacecraft, to contrive the mechanics and power for launching it, to fashion intricate ways of firing each of the four stages successively and automatically, to build the 'play-board' of instruments which will gather and communicate information about the universe around us, and to send the whole of this off on its course of hundreds of thousands of miles : even to attempt this is a feat of imagination, and to carry it through is an event of some moment in history। বস্তুতই কৃত্রিম গ্রহটির সৃষ্টি একটি ঐতিহাসিক ঘটনারূপে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। কারণ মহাশূন্যে পাড়ি দেবার পথে এটিই হল প্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। পূর্বতন কৃত্রিম উপগ্রহগুলো পৃথিবীর ঊর্ধ্ববায়ুস্তর এবং উল্কাকণিকা বিষয়ক যে সকল তথ্য সরবরাহ করেছে, এই সাফল্যের পিছনে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। আবার প্রথম গ্রহটি যে সব তথ্য আহরণে বিজ্ঞানীদের সহায়তা করবে, তাদের পরবর্তী প্রচেষ্টাগুলো বহুগুণে উপকৃত হবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অনেকে সঙ্গতভাবেই একে মহাজাগতিক মানমন্দির স্থাপনের উপক্রমনিকা বলে অভিহিত করেছেন।

যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হবে

মেচ্‌তার কার্যকারীতার বহুমুখীনতা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক :

(ক) বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন গ্রহান্তবর্তী মহাশূন্যের (Interplanetory space) আবহমণ্ডল এক ধরনের লঘু বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ। এর ঘনত্ব এবং

সংযুতি (chemical composition) সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ নয়। ভবিষ্যতে গ্রহান্তর যাত্রার স্বপ্ন যখন বাস্তবরূপ লাভ করবে, তখন এ সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী পরম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে। তাই কৃত্রিম গ্রহটির মধ্যে একটি বিশেষ যন্ত্রকৌশল সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছিল। একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠবার পর তার অভ্যন্তর থেকে সোডিয়াম-মেঘ উৎসারিত হয় এবং তা সূর্যরশ্মিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে ৫০০ কিলোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট একটি কৃত্রিম ধূমকেতুর জন্ম দেয়। ঐ কৃত্রিম ধূমকেতুর বর্ণালিচিত্র বিভিন্ন মানমন্দিরের ক্যামেরার পর্দায় বিধৃত করে রাখা হয়েছে। তা বিশ্লেষণ করে আকাঙ্ক্ষিত তথ্য লাভ করা যাবে, যেহেতু ধূমকেতুটির আয়তন এবং ঔজ্জ্বল্য তার পারিপার্শ্বিকের রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

(খ) কৃত্রিম গ্রহটিতে একটি স্বয়ংক্রিয় চৌম্বক পরিমাপক যন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা চন্দ্রের চৌম্বকক্ষেত্র সম্বন্ধে সঠিক ধারণা গড়ে তোলা যাবে। কেবল চন্দ্র নয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর গঠনের উপরও এতে নূতন আলোকপাত হতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত ধারণা এই যে, পৃথিবীর সাধারণ চৌম্বকত্বের জন্য দায়ী তার কেন্দ্রস্থ গলিতপ্রায় লৌহমণ্ডলের মধ্যেকার পরিচলন প্রবাহ (convection current) কিন্তু চন্দ্রের কেন্দ্রমণ্ডল রয়েছে কঠিন অবস্থায়, তাছাড়া লৌহ থেকেও সে বঞ্চিত বলে অনুমান করা হয়েছে। সুতরাং চন্দ্রের কোনও চৌম্বক-ক্ষেত্র থাকা সঙ্গত নয়। কিন্তু যন্ত্রের চোখে যদি এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলে পরিগণিত হয়, তাহলে প্রচলিত ধারণা অসত্য বলে বিবেচিত হবে। তখন হয়তো বিজ্ঞানীরা ভূচৌম্বকত্বের উৎসসন্ধান করবেন তার চক্রাবর্তন Rotatory motionএর মধ্যেই।

(গ) ভূচৌম্বক প্রভাবান্বিত ক্ষেত্রের বাইরে মহাজাগতিক রশ্মির সান্দ্রতা (density) তার গঠনোপাদনে ফোটনকণিকা এবং গুরু কেন্দ্রক (heavy nucleas)-এর বিন্যাস এবং সৌরবিকিরণ ও সৌরকণিকার প্রকৃত স্বরূপ—যা এতকাল আমাদের জানা হয়ে ওঠেনি—তার উদ্‌ঘাটন এবার হয়তো সম্ভবপর হবে। কারণ এই প্রথম মানুষের তৈরি মানযন্ত্র পৃথিবীর প্রভাব-ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হতে পারল। এ ছাড়া চন্দ্রের তেজস্ক্রিয়া এবং উল্কাকণিকার প্রকৃতি অনুশীলনক্ষম যন্ত্রপাতিতেও ম্যেচতাকে সুসজ্জিত করে দেওয়া হয়েছে। সে তার সংগৃহীত অভিজ্ঞতার বিবরণ বেতার-সংকেত-প্রেরক যন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর মাটিতে পাঠিয়েছে। বিজ্ঞানীরা তখন সেগুলো বিশ্লেষণ করে মহাশূন্য সম্বন্ধে অনেক নতুন খবর জানতে পারবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

পৃথিবীর মহাকর্ষ অতিক্রম-প্রয়াস সাফল্য অর্জনের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী জুড়ে অসাধারণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষ অবিমিশ্র আনন্দের সঙ্গেই রুশবিজ্ঞানীদের কীর্তিকে অভিনন্দিত করেছেন। কিন্তু মনোযন্ত্রণা দেখা দিয়েছে কোনও কোনও রাজনৈতিক মহলে। তাঁরা এর মধ্যে বিরোধীদলের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা লক্ষ্য করে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। এরই প্রতিফলন দেখা যাবে মার্কিন প্রভাবাধীন পত্রপত্রিকাগুলোর অদ্ভুত মানসিকতাজাত বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্যে। এমনই একটি তুরস্কদেশীয় সংবাদপত্র রুশ-বিরোধিতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে হাস্যোদ্দীপকভাবে মন্তব্য করেছেন, "From the standpoint of perfection and power", American rockets—which so far have not been able to overcome terrestrial gravitation—were nevertheless superior to the Russian rocket, which have solved the problem.

কিন্তু আমাদের মনে হয় ভীতি বা ঈর্ষাজনিত এ-সকল অনুচিন্তা অহেতুক। কারণ মহাকাশ বিজয়ের এই যে প্রয়াস চলছে, তা আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বর্ষের কার্যক্রমের অঙ্গ; আর ভূ-পদার্থ বর্ষসূচীর মূলাদর্শই হল, ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক সীমারেখা উত্তীর্ণ হয়ে বিজ্ঞানের মহামিলনতীর্থে সমবেতভাবে পদচারণা, যার ফলে দেশকাল নির্বিশেষে প্রতিটি জাতি সমভাবে উপকৃত হতে পারে। দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানীরা যে সব আবিষ্কারে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন, তা কোনও ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের একক সম্পত্তি হয়ে থাকেনি; সারা বিশ্বের মানুষ তার ফলভাগী হয়েছে। সুতরাং নভোচারণ বিদ্যা এবং তৎ-সংক্রান্ত তথ্যাহরণের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা করা হবে না—এমন বিশ্বাস পোষণ করাই সঙ্গত। একটি বিদেশী সংবাদপত্র এ বিষয়ে যে উক্তি করেছেন তা উদ্ধৃত করে প্রবন্ধের উপসংহার করছি :

মহাকাশে সোভিয়েত গ্রহ-উপগ্রহগুলো শান্তির প্রতীক। তাদের দেখে আশঙ্কিত হবার কারণ নেই। তারা রাজনৈতিক জল্পনা-কল্পনার বস্তু নয়।

রোদ্দুরের স্বাদ

স্মরজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শালিখ পাখির মত ঘাড় নাড়ল একবায়, তারপর লম্বা সরু হাতটা মাটির মেঝেয় ঘষল, "না, আর নড়চিনে কিন্তুন। তবে কি পাহারা দিচ্ছি এখানে? কী এমন ধনরত্ন আছে, সামিগ্‌গিরি আছে, যা এই সুবালা বুড়ীর কাছ থেঙে নিয়ে যাবে, যাক না।" একটু মমতা জানিয়ে দুটো চোখ বুজল।

এ কথা অনেকবার শুনেছে বিষ্টু। কখনও শুনে থমকে পড়ে হাজার কথার তর্ক চালিয়েছে, গোরুর গাড়ি এনে ফিরে গেছে কখনও, কখনও কথা দিয়ে 'যাব' বলে যায়নি বুড়ী। তবুও আজ এসেছে। আসবে না জেনেও এসেছে বিষ্টু। প্রথমটা কোনো কথাই কইল না বিষ্টু। এ প্রশ্নের জবাবটা তার জানা আছে।

একবার গিয়ে ঝগড়াঝাটি করে দিনকতক পরে চলে এসেছিল বুড়ী—আর যায়নি তারপর।

বিষ্টুর এরকম আসার কোনো মানে নেই তবুও আসে, সেটা কিসের টান কে জানে। বিশেষ করে এমন একটা মানুষকে রাজী করাতে বেশ সময় যায়। ছেলেবেলাতেও তিন মাইল পথ হেঁটে কখনও একলা, কখনও বাবার সঙ্গে এসে বুড়ীর বাড়ি রসবড়া মুগসামলি খেয়ে গেছে। তারপর থেকে এত বয়সেও সেই যাতায়াত, সেই তিন মাইল রাস্তা হেঁটে আসা খারাপ লাগে না। যদিও মানুষটাকে মত করাতে পারে না বিষ্টু। একগুঁয়ে হয়ে বসে থাকে পুরানো নড়বড়ে বাড়িটাতে। কাঁপে, জ্বর হয়, ভোগে, সেবাশুশ্রূষা করবার কেউ নেই কোথাও—তবুও ওই বুড়ো কাঠকে রাজী করাতে পারে না বিষ্টু। তারপর গতবছর সরস্বতী পুজোর দিন ঘাটের সিঁড়ি থেকে পড়ে গেল। হাড় ভাঙল না, দেহটা গুঁড়িয়ে গেল না। দিনকতক দেখাশুনা টানাপোড়েন চলল, নিয়ে আসবার ষড়যন্ত্র চলতে লাগল, আশে-পাশে এর ওর পরামর্শ চলল, ফুসফাস কানাকানি—জোর করে যেন আজই বুড়ীকে ফুলহাটিতে নিয়ে যাবে বিষ্টু—চার বেহারার পাল্কি চড়িয়ে।

কিন্তু যে-কে সেই। কদিন পরেই খুট খুট করে উঠল, দরজায় তালা লাগাল, একটা একটা করে পইঠে ভেঙে উঠোনে নামল, দোরে উঠল। তার আরও দিনকতক পরে ঝুপঝুপে অন্ধকারে ঠাহর করে কেরোসিন তেল কিনে ফিরল বুড়ী। টানাপোড়েন করল কেবল বিষ্টু। শেষে, বিষ্টুর খবর নেওয়া আসাযাওয়া রইল বেঁচে। বুড়ী আর গেল না।

আরও একবার এই মাটির ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়েছিল বিষ্টু। নক্সাকাটা বাঁশবাখারির চাল আছে, মাচান আছে, আছে তক্তাপোশ রান্নাঘর; বুড়ী নেই শুধু। সারা ঘর শূন্য খাঁ খাঁ করছে। "পিসী কোথায় গো পিসী।'" ডাকল বিষ্টু। খানিকপরে আশ্চর্য হয়ে তাকাল বিষ্টু। "অ, কি গো পিসি, অমন আওল বনে কেন, কোথায় কি সেঁধিয়ে বসে আছে—জন্তু জানোয়ার একটা বেরিয়ে কামড়াবে যে! ঘর ছেড়ে ওখানে কেন গো!" ঠিক্কর রোদ্দুরে উঠোনের একধারে কাঠ, ঘুঁটে, পাতা জড়ো করা রয়েছে সেখানেই ছেঁড়া মাদুরে কোমরের কষি থেকে কাপড় খুলে মরার মত পড়ে রয়েছে। ওটা ওর রোগ। ঠুক ঠুক করে কাঁপে শীতে, গরমেও বুড়ী বলে, "এই রোগেই আমাগে যেতে হবে যে!"

বাঁশের মাচান নড়ে উঠল। তক্তাপোশের নিচে ইঁদুর আরসুলা নড়ে উঠল কিলবিল করে, হাঁড়িকলসি নড়ল। বয়েস কত হল? গণ্ডাগুনে হিসাব করে বলল, "এই আঠার গণ্ডা পেরিয়ে দু বছর।"

অর্থাৎ বিষ্টু বলল, "চুয়াত্তর বছর। অঃ, পরমায়ু বলিহারি পিসী! কত তো দেখলে শুনলে মানুষ!"

"না, না," কিসমিসের মত হাত নাড়তে থাকে সুবালা।

বিষ্টু বলল, "আর কেন পিসী, বয়েসও তো হয়েছে, এবার এখানের মায়া কাটিয়ে আমার বাড়িতে গিয়ে উঠলে হয় না? আমার একদিন এক সন্ধ্যে যদি চলে তবে তোমারও চলবে।" বুড়ী কোনোদিন আসতে চায় না এ বাড়িতে আর বিষ্টুর খোঁজখবর নেওয়াটা বড় দেরি হয়ে যায় সেটা এই দূরত্বের জন্যে। বিষ্টু রাগ করল, "এতখানি রাস্তা হেঁটে এসে পারা যায় পিসী! এই বয়সে হঠাৎ একটা কিছু হয়ে ঘরে মরে পড়ে থাকলেও কেউ খোঁজ পাবে না।" এছাড়া এরকম কথা বিষ্টু অনেক শুনেছে পাড়াপড়শির মুখে, বুড়ো হয়েছে বলে ও জঞ্জালকে কেউ বাড়িতে ঢোকাতে চায় না, ওর কেউ নেই বলে তোরাও ফেলে দিতে পারিস ওকে? মণি গাঙ্গুলি তার মেয়েকে জলে ফেলে দেয়নি তো!

সম্পত্তি নয় অর্থে'ক রাজত্ব। সম্পর্কটা কাছাকাছি না হলেও ওর তিনকূলে কেউ নেই যখন দূর সম্পর্কের পিসী তো বটে।

কর্তাদের আমলে এই গোটা চৌহদ্দিটা কত সরগরম জমজমাট ছিল সে আজ প্রায় কতবছর আগে কে জানে? সেটা জানে শক্তি বুড়ো। বাঁশবনের ধারে কলুদের বাড়ি যে শক্তি বুড়ো বাস করত সেও ঘাড় নেড়ে বলত, "সুবু তো সে সংসারে নাটাই ঘোরা ঘুরত। ঘড়া ঘড়া জল তুলে হেঁসেল যোগান দিত। চাকরবাকর শ্বশুরশাশুড়ি নিয়ে বড় গেরস্তর ঘরসংসার। আরো হৈ হৈ করত মহাপুজোর সময়। হৈ হৈ কাণ্ড! বলি! সে বলি কি আজ আর কেউ ভাবতে পারে? হঠাৎ একবছর পুজোয় কি বিঘ্ন একটা হয়ে গেল, তার জন্যেই সব উজোড় হল একে একে বুঝলে?" ঘাড় নাড়ে শক্তি বুড়ো। "শুধু ওই একটি প্রদীপ জ্বলছে মাটির ঘরে। অমন যে নামজাদা পাকা বাড়ি তাও ধ্বংস হয়ে মাটির বাড়ি একখানা। সুবালা বেঁচে রয়েছে যেন পুরানো চালচিত্তিরের ওপর বিজবিজ করছে উইয়ের দাগ।"

সুবালা বলে, "বুড়ীর সঙ্গে ঘড়ার ঠোকাঠুকি হয়ে যেত, তার শব্দ কি নিজের ছায়া দেখে কখনো কখনো থম্ মেরে দাঁড়িয়েছি, কোনো পুরুষ মানুষ নাকি? তখন কি লজ্জা পেত। পুরুষ মানুষের মুখের দিকে তাকাতেই তো ভরসা হত না।" আর একটা কথা সুবালা বেশ গুছিয়ে বলে, "এক হাঁড়ি ভাত ধরিয়ে ফেলার জন্যে শাশুড়ি বকুনি দিয়েছিল ভয়টা কি সোজা! ভয়ে ভয়ে পেটের ভেতর হাত-পা ঢুকে যেত।" সে বকুনি থেকে রেহাই নেই জেনে বাঁশবনে বসে বসে কেঁদেছিল সুবালা। তারপর সন্ধ্যা হয়ে এল। আর কালো ডোবার জল কনে-দেখা আলোয় রঙ বদলানো। কোথাও কচি কলাপাতা রং, হলুদ রং, নীলবড়ি রং আরো কত রংয়ের সে এক বর্ণালী নিথর জলে অনেকক্ষণ ধরে আঁটা হয়ে রইল। তন্ময় হয়ে সেইদিকে চেয়ে সুবালা মনে মনে কি সুখ যেন পেয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখল, নদীর উঁচু বাঁধ ধরে সানাই-বেকপাইপ-ময়না ঢুড়কুড়ির বাজনা বাজিয়ে একটা বর বিয়ে করতে যাচ্ছে। তাই দেখে নিজের জীবনে একটা ধিক্কারও এসেছিল।

সুবালা আবার কেঁপে কেঁপে উঠে ঘাড় নাড়ল, "সে বয়েস নেই, আর সে চক্ষু নেই ছানি পড়ে যেতে বসেছে। এবার যেতে পারলেই হয় তোমাদের রেহাই। সুখ তোমরা বল, দুঃখু ভোগ বল—সবই হল। গয়না-টাকাকড়ি আজান্‌ [illegible] কিছু। [illegible] পা-অবধি ছিল। [illegible]

পঁইচে, ওপর হাতে বাজু-বাঁক-যশোম, গলায় ছিল সাতনরি চিক, কোমরে বিছে ছিল না বটে—গোট, পরতুন। সে সব চলে যাওয়ার দুঃখ কি ভোলা যায়? মাত্র এইটুকুন যা আগেকার সোনা রয়েছে।" সুবালা একভরির আংটিটা বাড়িয়ে দিলে সামনে।

বিষ্টু দেখল বুড়ীর মাটির ঘর, মাচান তক্তাপোশ ঝাঁটাকাঠি কৌটা-বাওটা ইঁদুর-আরশুলা হাঁড়ি-কলসি। মাঝে মাঝে ইঁদুরের গর্ত থেকে সাপও বেরোয়। চারপাশে বন নিম নোনা-আকড়মাদার জঙ্গল একাকার। চারপাশে বন, মাঝে একখানা বাড়ি একলা, যেন চোদ্দ শাকের মাঝখানে ওল পরামানিক দাঁড়িয়ে। কালো মিশমিশে শিমগাছের ওপর আরো লতানে বন উঠে বসেছে। আরো বন এসেছে, আগুনখাগী-তেলাকুচো-তরুলতা-রাখালফল এসেছে—ঝেঁপে ঝেঁপে এসেছে, খোঁজ পেয়েছে তাই এসেছে। উঠোনের ওপাশে বুড়ো শিবের পোড়ো মন্দির শ্যাওলাধরা জঙ্গল। তার আরো ওপাশে বুড়ীর সীমানা শেষ। বেড়াও নেই, সীমা নেই। ছোট জলাশয়, তিরতিরে পাতা জলশাক কেঁচকো-হাতিশুড -হিজলের কড়া বনের ঝাঁক। উঠোনের ওপর তেঁতুলগাছ চেঁচতলার গা বয়ে উঠে গিয়ে পুব দিকের আকাশে ঝুঁকে পড়েছে। ওর গোড়াটা তেলতেলে করে রাখা। গোলা দিয়ে, ঝাঁটা দিয়ে ওখানটা সুবালা পরিষ্কার করে রাখে। ওর পাশে যে এক চিলতে ফাঁক রয়েছে, তাই দিয়ে যে রোদ ঢোকে—সেটা অনেক ক্ষণ স্থায়ী হয়। সূর্য ঢলে, রশ্মি ঢালে, চিকন সোনা রোদ ঠিকরে পড়ে ওখান দিয়ে। সুবালাই বলে, "রোদ থাকে সব্বক্ষণ। শীতের বেলা একরত্তি বেলা, এই আছে, এই নেই—কপ্পুরের মত উবে যায়। রান্নাও তেমন একটা কিছু নয় চুড়ুকপুড়ুক রান্না। চোখে ভাল ঠাহর নেই—সব কেমন যেন খুজকো লক্ষণ। বেটপকায় কিছু হয়ে যায় র-ঠ করে কাজ সারতে সারতে বেলা একটু হয়ে যায়।" এখন একটা ভাল ব্যবস্থা যুগিয়েছে মাথায়—ভাতের থালাটি নিয়ে রোদ পিঠ হয়ে খেতে বসা ওই ঝরঝরে জায়গাটায়। ওখানের রোদ যায় একটু দেরি করে। পেটে ভাত পড়লে, আরো যেন গা-হাত-পা গুটিয়ে সুটিয়ে আসে, শীত ধরে। ঠুক ঠুক করে কাঁপতে কাঁপতে ওখানেই শেষ বেলা পর্যন্ত গড়িয়ে নেওয়া চলে।

কাঠের উনুনের সাদা ধোঁয়া ধিক ধিক করে উঠল। সুবালার মুখটা ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে উঠল। সুবালা বলল, "আর কেন এই বুড়ো হাড়কটাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া বাবা—এখানেই থাকতে দে। এ ঘর ছেড়ে যাওয়ার একটা মায়া আছে।" মুখে হাসি একটা লেগে থাকে [illegible]। সুবালা বুড়ী হাসে,

আসবার কথা বললেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। হাসির সময় হাসি কি কান্না তা বোঝা মুস্কিল। শীত-শীত ভাবের চেহারায় জড়ো কমা মাংস ঠিক কিসমিসের মত দেখায়। রান্না চাপতেই বেলা হল। সুবালা বলে, আবার খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলেই বেলাও গেল গেল শব্দ। এটুকুন সময় কেমন করে কেটে যায়। উড়ন্ত পাখি চলে গেল। কী সে পাখি—কোথা সে চলে—কী সে বলে। বুড়ী বলল পাখির কথা :

খোকার মাগো
খোকা কাঁদে
কেন কাঁদে
বাপঘর যাবে।

পাখি বলে, গেরস্তর বোয়ের খোকা হোক—খুকী হোক। সুবালা থামল। রান্নাঘরের খড়ের ঝুলপড়া চালার ওপর একটা কাঠবেড়াল হঠাৎ ঢুকে পড়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। এদিক-সেদিক চেয়ে দেখল একটু, তারপর ছোট কঞ্চি দেওয়া জানালার ভিতর দিয়ে ওটা উঠে গিয়ে বাইরের তেঁতুলগাছের ডাল ধরে ওপরে উঠে পড়ল। একটা নির্বিষ সাপ বড় চেহারা নিয়ে কখন রাস্তার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে একটা গর্তের মধ্যে মাথাটা চালিয়ে দিয়েছিল ; এবার সে মুখটা তুলে ঘুরিয়ে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে সন্ধান করতে চলে গেল। সুবালা ঝাপসা চোখ দিয়ে দেখে নিল একবার তারপর বলল, "আর দিনকতক থাকতে দে যতক্ষণ চোখে একটুও দেখতে পাচ্ছি, যখন একদম চোখ বুজে যাবে শেষ পর্যন্ত তো রয়েছেই।" হাসল একটু, চোখ দুটো বুজে গেল।

দুই

বেলা শেষের ছায়া পড়ল উঠোনে, পুকুরে জলের ঘাটে, কোঠা ঘরের ওপর। এলোমেলো গাছপালার ছায়া এসে জড়ো হল কত। কাচপোকারা উড়ছে কানার মত। আজ সকালে লক্ষ্মীপূজো মিটে গেছে। তাই উঠোনে, দরজার কাছে, আলপনা এঁকেছে সুরো। এখন দাঁড়িয়ে থেকে সুরোর নিজেরই মনে অবিশ্বাস লাগছে, তার হাতের এ আলপনা কি? অবেলায় খেয়েদেয়ে ভর্তি-পেট সুরোর। শরীরের রক্তটা যেন গোল হয়ে ঘুরছে। হঠাৎ এমন সময়ে রোয়াকের ওপর এসে বসল সুবালা একটা জন্তুর মত।

সুরো তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল, "ওগো মাগো, আবার সেই বুড়ী এল যে—জ্বালিয়ে মারবে আমাকে। ছড়া কাটবে, গল্প করবে, আমার জিনিস, আমার জিনিস বলে টানাটানি লাগাবে। যন্ত্রণা কে বাড়ালে গো আবার—বাবা গো—গেলাম!" মুখটার দিকে তাকল একবার সুরো। কি বিচ্ছিরি লম্বা মুখ—ঠিক যেন ঝুনো নারকেল। বেটাছেলের মত চেহারার গড়ন। কথায় বশীভূত করতে জানে বটে! আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করে ঘেমে উঠছিল সুরো। ছিঃ ছিঃ, এমন করে আবার মানুষ আসে, পাঁচটা লোক রাস্তায় যাতায়াত করছে। এখানটায় গোরুর গাড়ি ঢোকে না বলে দূরে রাস্তার ধারে গাড়ি রেখেছে সুখন্বা গাড়োয়ান। সেখান থেকে রাস্তাটা বেঁকে পুকুর পাড় হয়ে সতুদের সদরবাড়ি হয়ে এখানে এসেছে। এই রাস্তাটা দিয়ে সুখন্বা আর তার ছেলে দুজনে নিয়ে এল। ধরাধরি করে নয়; "ওমা, একি চতুর্দোলা নাকি গো!" সুরো হেসে গড়িয়ে পড়ল। জ্বরে ভুগে ভুগে সুবালার শরীর কাহিল হয়ে গেছে বলে একটা থলের মধ্যে সুবালাকে বসিয়ে চারটি কোণ বাগিয়ে ধরে সুখন্বা আর তার ছেলে বয়ে এবে রাখল দোরের ওপর। সুবালার মাথায় একগলা ঘোমটা টানা।

সকালে উঠে বসল সুবালা বিছানার ওপর। কাঁথা মাদুর জড়ো করা পাশে। এক জায়গায় কালিপড়া একটা হ্যারিকেন, মিছরির জায়গা, বাক্স তোরঙ্গ, একটা জায়গায় সমুদ্রের সাদা জমাট ফেনা রয়েছে। দেয়ালটা ধরে ধরে এসে বসল বাইরের রোয়াকটায়। তারপর থেকে রোজই ওই জায়গায় বসা চাই বুড়ীর। ওখানে বসে জুলজুল করে কটা চোখ দুটো বাড়িয়ে দেখে গাছপালা, মানুষ। ঠুক ঠুক করে কখন কোথায় চলে গেল সুরোর অন্যমনস্কতায়। এ বাড়িটায় আরো গাছপালা আরো অনেক ছায়া রয়েছে। ভিজে মাটি সন্ধ্যার দিকে বেশ বুঝতে পারা যায়; যখন নরম মাটি থেকে রোদের তাত সরে যায়, বেশ জল বেরোনার একটা স্যাঁৎ-সেঁতে জিনিস আন্দাজ করে নিতে পারে সুবালা। শীতকাল বলে আরো বেশি করে এই জল-জল ভাবটা আন্দাজ হয়। ওর পাশ দিয়ে সরু ছিলছিলে একটা রাস্তা ঘাটের কাছ বরাবর চলে গেছে। ওর পাড়ের কাছে একটা আকন্দ গাছ রয়েছে। ঠিক বুড়ীর মত, আদ্দিকালের। ওর ফুলগুলো কিন্তু আশ্চর্য রকমের গুটানোজুটানো শীতে জড়োসড়ো

—যেন ঠিক ফর্সা বুড়ীর সাদাটে আঙুলের পাশ দিয়ে একটু করে রক্তের আভা বেরোচ্ছে—বেগুনী বেগুনী আভা। গাছগুলোর বাড় নেই তেমন। অল্প বড় হয়েই তারপর ঝাঁকড়া হয়ে বয়সে বাড়তে থাকে, ফুল ফোটে। ওখান দিয়ে গিয়েই পচা জল—একটা জলের ডোবা চোখে পড়ে। মরা পুকুর, প্রতিষ্ঠা করা বলে নাকি কাটাতে নেই ওটাকে। একেবারে বুজে শেষ হয়ে গেলে তারপর কাটাতে আছে। ওর জলটা দেখলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে সুবালার। জলে সাধে সে চান করে না? সুবালার জল বলে যে ভয়টা আছে সেটার মূর্তি ঠিক এই রকম—এই আসল চেহারা তার। কতদিন জল ছোঁয়নি, জলের ধারেকাছে যায়নি—সেটা গা দেখলেই বোঝা যায়। গায়ের আঁশ থেকে সাদা খড়ি উঠছে। চুলকে চুলকে সাদা দাগ বাড়ছে কেবল। সুবালা এই জিনিসটা ভাবতে গিয়ে আকন্দ গাছের কথাটা মনে পড়তেই অসহ্য হয়ে চোখ বুজল। অবিকল একেবারে! সুবালার গায়ে যে খড়ি ফুটছে সেই খড়ি ফোটে আকন্দ গাছের ডালপালা, পাতার উল্টো পিঠ দিয়ে। ডোবাটার দিকে তাকালে বুড়ীর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। হাড়ের ভিতর, বুকের কলজে, শিরা, হাঁটু সব যেন জমে যায়।

পাঁচিলের ওধারে চালতা-আমের গাছ দাঁড়িয়ে। আমগুলোর গড়ন ঠিক চালতার মত। ধরবার উপায় নেই মোটে। সুবালা হাসল। চালতা অথচ আম—আমই তো। ওই আমগাছের পাতা ডালপালার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে-পড়া একটু একটু করে রোদ পড়ছে উঠোনে। একটা হৈ চৈ শব্দ আসছে কোথা থেকে। কান খাড়া করে রইল সুবালা। ঠিক হরিহরপুরের কাছ থেকেই না। এদিকসেদিক থেকে আরো শব্দ, আরো টিন বাজানোর শব্দ, মানুষের চিৎকার ক্রমশ এগিয়ে আসছে। শব্দটা আরো এগিয়ে এসে পড়ল। সামনেই। নন্দীদের বাড়ি রাধিকাদের বাড়ির কাছ থেকেও টিন বাজানোর শব্দটা জেগে উঠছে। এ বাড়িটার পুকুরের ওপাশে সারবন্দী তেঁতুলগাছে হনুমানরা এসে ভীড় জমিয়েছে। আরো অনেক হনুমান এদিকসেদিক থেকে লাফিয়ে ভেঙেচুরে আসছে। টিন বাজানোর শব্দ আর চিৎকারের তাড়ায় হনুমানরা ছুটোছুটি দাপাদাপি করে সারা পাড়াটায় এতটুকু সময়ে ভেঙেচুরে তলা বিছিয়ে কি একটা যেন করে গেল। যেন অলুনি ধরেছিল গাছগুলোর। সুবালা গলা থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ করে চিৎকার করছিল। পুকুরের ওপিঠে সে শব্দ

প্রতিধ্বনিত হয়ে আরো বিকট হয়ে উঠছিল। তারপর আরো একটু বেলা চড়ে যেতেই এদের শব্দটা ঝিমিয়ে পড়ল। দুপুরের দিকে খাওয়াদাওয়ার পর সুবালা তেমনি ঝাঁ ঝাঁ করে ডাকে, কথা হয় সুরোর সামনে, "তুই দেখিস বউ জগন্নাথে গিয়ে আমার নামটা লেখা আছে কিনা? সঙ্গে বড় ভাই ছেলো, পাণ্ডারা এসে বল্লে একশো টাকা দান করলে নাম থাকবে পাথরে খোদাই করা ছেরকাল।"

সন্ধ্যার সময় অন্ধকারে বসে পায়ের আঙুলের ফাঁকে শুকনো বারমেসে হাজা চুলকাল। ওগুলো চুলকাবার পর মাংসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেলে বড আরাম হয়। চমৎকার একটা টাটানি চোখ বুজে উপভোগ করতে থাকে। তারপর রাত বেশি হতেই দুটো খেয়েদেয়ে সুরো ওঘরে শুয়ে পড়ে। এদিকের ঘরে সুবালা একা। সুবালা চেঁচায়, "কিছু ভাবিসনি লো বউ—আমি রয়েছি। চৌকিদার এখানে হাঁক দেবে তো?" তারপর বুড়ী গুজগুজ করে বাড়ি-বন্দনা পাড়া বন্দনা দেয়

"জান্নুকি কোটারিল হাঁকা হাই
হে হনুমন্ত দ্বারী রামকা কোটি কোটি দোহাই
স্বর্গ মর্ত পাতাল তিনপুর নাগে টাট্
শংকরের আজ্ঞে এ বাড়ির বজ্রের কপাট।"

তারপর আলোটা নিবিয়ে বিছানাটা চাবড়াল বুড়ী

"আরশুলা বিছে মাকড়সা কেন্নাই কানকুটুরি
তেল নুন দিয়ে নুন পুঁটুলি
বিছের মা কন্যাদাসী
এ বিছানায় কেউ না আসিস।"

বিছানাটা চাবড়ে বুড়ী পুঁটুলির মত পড়ে থাকে সারারাত ওভাবেই। চোখ দুটো বোজাই থাকে—ঘুম আসে দেরিতে।

ঘুম যেন শেষ হয়ে গেছে চোখ থেকে। সময় নেই, নেই অসময়—দোরে বসলেই কখন ঢুল আসে, কখন এক ফাঁকে এক ঝোঁক ঘুম হয়ে গেল। শয্যাটি পাতা থাকে—অনন্তশয্যা। কতদিন এখানে কাটল হিসাব করে দেখবে নাকি একবার সুবালা। শীত চলে গেল, কাটল বর্ষা হেমন্ত। আম-কড়াইশুটির দিন শেষ হয়ে গেল ঘুরেফিরে, সুবালার চোখের ওপর

দিয়ে এই বিষ্টুর বাড়িতে। সুবালা বলল, "কাজের মধ্যে দুই—খাই আর শুই।" ঘুম থেকে উঠে আবার সন্ধ্যার কোলে বাতি দিতে শুয়ে পড়া, আবার ভোরে উঠতে গিয়ে আরো কত যেন হারিয়ে যাওয়া—সয়ে যাওয়া চোখের কাছ থেকে। চোখদুটো পিঁচুটিতে জুড়ে যায়। আস্তে আস্তে গরম জলে নরম করে চোখ পুঁছিয়ে দিতে চোখ ছাড়ে। কিন্তু চোখের চারপাশে গুড়োগুড়ো কুয়াসা ঘোরে। কলাগাছ, ছোট সুপারিগাছ যেটা পাঁচিলের ধার ঘেঁসে আছে, ওটার লক্ষ্য হয় না। সুরোর মুখটা কাছাকাছি আনলেও লক্ষ্য পড়ে না মোটে। এই অন্ধকার টুকরো হয়ে গলে মনের ঘারে পড়েছে। তাই পৃথিবীর শব্দগুলোও দেরি করে কানে পৌঁছতে পারে। এই ঘরের মেঝে, চৌকাঠ, তারপর দেয়াল, কুলুঙ্গি, দুটো পর পর জানালা পার হয়ে তারপর রোয়াক। পা বাড়িযে আন্দাজ করে রোয়াকের শেষ। ব্যাস্ ওই পর্যন্তই। ওইটুকুতে পা বাড়িয়ে যে দু তিনটে বছর পার হয়ে গেল তাতে এ জায়গায় খুব বিশেষ একট পরিবর্তন চোখে পড়ে না। কেবল উত্তর দিকের আমগাছটা আর কতকগুলো গাছপালা কেটেকুটে জায়গাটা ন্যাড়ান্যাড়া দেখাচ্ছে।

বুড়ী বসে বসে ডাকল, "বউ, আজ বুঝি পুন্নিমে? মানুষ মরে যাবার পর বিষ্টিতে তার শ' যদি ধুয়ে যায় মানুষ সোন্দর দেখতে হয। আমি এবার মরে সুন্দরী হব না কুচ্ছিত হব বলতে পারিস বউ? আমায় লোকে ঘেন্না করে আমার চামড়া ঝুলে পড়া দেখে কিন্তুন ভগমান এ-দশা করেছে আমার। আমি মরবুনি, কুচ্ছিত হযেই বেঁচে থাকব, তোদের দেখবশুনব। তুই কি করছিস বউ! তোর সোন্দর মুখখানা তো দেখতে পাচ্ছিনি আমার চক্ষু দিয়ে।"

তারপর বলল, "বউ তুই আলতা পরেচিস নাকি? আমার চক্ষু থাকলে তোকে আলতা পরাতুন।" এ সময় কাঁঠাল গাছের একটা শুকনো ছোট ডাল বুড়ীর পাযের কাছে পড়ল। ডালটা হাতে তুলে নিয়ে ভাবল কাঁঠাল গাছটা শুকিয়ে গেল নাকি?

বুড়ী একটু থামে কিন্তু সুরোর কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে আবার কথা বলতে শুরু করে। "বুঝলি যমরাজা এসে পান ভিক্ষে চাইবে। যম বলবে, তোমার দেহ নিয়ে রেখে আসব পিলেনপুরে। আর যম যদি সুরোর কাছে রেখে আসে? বউ, তোর কাছে এলে সুন্দরী হয়ে আসব—তোর ভাবনা কিছু নেই।" বলেই বুড়ী ফিকফিক করে হাসে। "যমকে আমার ভয় নেই, জানিস, যম বলে

কেউ নেই। আমি ঝড় দেখে ভয় পাই, আলো দেখে ভয় পাই। ভয় হয় আবার আনন্দও হয়। যম হল ঝড়, যম হল আলো—সে পুড়িয়ে ফেলবে আমাকে, সে উড়িয়ে নিয়ে যাবে আমায় সোন্দর জায়গায়। যম তোর মত সুন্দরী, বউ।"

সুরো এবার বড় বড চোখ নিয়ে উঠোনের ধারে দাঁড়িয়ে হাসে। "আমি তোমার যম হতে পাববুনি পিসি। আমি যম হলে তোমায় এখুনি রেখে আসতুম।"

"নাগো না, যম বলে আমার ভয়ের কিছু নেই। সে রূপ দেখিয়ে আমার চোখ কানা করে দেবে, আমায় কানা করে দেবে, আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে, তাকে দেখে আমি মরে যাব। আমি মরে যাব গো বউ, বউ।" বুড়ী কেঁদে ওঠে। "আমার হাত পা এত কাঁপে কেন গা? কথা ক-না—মরে গেলেই তো সব ফুরিয়ে গেল।"

সুরো উঠোনে দাঁড়িযে কাজ করে; উঠোন ঝাঁটা দেয়। ওখানে যে একজন মানুষ কাঁদে একথা সে ভাবতে পারে না। কটা চোখের তারায় প্রাণপণ জোর দিয়ে সুবালা সুরোর দিকে তাকিযে বলে:

"দেখ, তোর মুখটা তো স্পষ্ট দেকচিনি! আর ওটা কে?" একটু কাছেই বিষ্টু বসে হিসাবনিকাশে ব্যস্ত ছিল। সুবালা পা ঘযে ঘযে বিষ্টুর সামনে গিয়ে বলল, "কে বল তো—বিষ্টু কি"?

ঘরে ওঠবার জন্যে দাঁড়াল সুবালা। দাঁডালে সুবালাকে অন্তরকম দেখায়। খাটো কাপড়, লম্বা চেহারা বেঁকে একটু সামনে ঝুঁকে পড়েছে। হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে গিযে উরুর কাছটায় সোজা না হওয়ার দরুণ স্বাভাবিক দাঁডানোর ধরন আসে না ঠিক যেন ওপরের একটা জিনিস তুলতে গেলে আগে নিচু হযে লাফায় যেমন. সেই নিচু হওযার ভঙ্গিটি সুবালার।

কদিন আগে বিষ্টু শহরে চলে গেছে। ওখানে একটা মনোহারী দোকানে বিষ্টু চাকরি করছে বললে ঠিক বলা হয় না। দোকানের দায়িত্ব সবটুকু ওকে যেন গ্রাস করে ফেলেছে। ছাড়তে চায় না ওরা বিষ্টুকে। আগে প্রতি সপ্তাহে আসত বাড়িতে, আজকাল মাসে একবার, তাও চারপাঁচ দিনের জন্য। এর মধ্যে আর ও বাড়ির কথা মনে হয়নি বুড়ীর। আকন্দ গাছের কথাটা একবার ভাবল। ওটার কি মৃত্যু নেই? একরকম হয়ে রয়েছে। বুড়ীর বাড়ির তেঁতুলগাছের স্বভাবও মন্দ ছিল না। যার তলায় বসে ভাত খেত সুবালা

"বউ, তুই এবারে তেঁতুল গাছটা কাটিয়ে নিয়ে আয়। বিস্তর কাঠ হবে ওতে। ওখানে কি আর আমি বাস করব ভেবেছিস।"

তেঁতুল গাছটায় কাঠের সংখ্যা ভাবতে গিয়ে সুরো একটুও লোভ করল না কেবল বুড়ীর মনের ভিতরটা বোঝবার চেষ্টা করেও বুঝতে পারল না।

বাড়িটা অনেকখানি নীরব হয়ে গেছে। বিষ্টু চলে যাবার পরই এই অবস্থাটা বেশ বুঝতে পারে সুবালা। পোকারা উড়ে এসে গায়ে পড়ে। রাত্রির বুকের মধ্যে ছমছম থমথম করে একটা শব্দ যেখানে কাঁপছে সুবালার মনে হল সে যেন ঠিক তার মধ্যখানে বসে আছে। অনেকগুলো নিঃশ্বাস ঝরে পড়ল তাড়াতাড়ি। বুকখানা থরথর করে উঠছে, চোখের পাতা নাচছে। গলাটা কেঁপে উঠল সুবালার, "আমি মরে যাব গো—হাঁ গো, হাঁ—কাল রাতের বেলা দেখনু যেন যমরাজা এয়েছে—কি কথাগুলো যেন বললে মনে নেই। হাউ মাউ করে আমার সে কি কান্না। বুক ভেসে গেছে কেঁদে কেঁদে। আমি মরে যাব গো। আবার বাচ্চাটি হযে জমমো নিতে হবে গো।" তারপর সবার কাছেই কথাটা একরকম করে বলল। সারাদিন মনটা টনটন করে রইল। এক একবার অনেক ভাবনা এল। মনে হল পায়ের গোড়ায় যেন যমরাজা সাপ হয়ে ঘুরছে। অন্ধকারটা যেন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওর সমস্ত রক্ত শিরা কব্জি হাড়—সব কিছুকে নিয়ে অদ্ভুতভাবে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কাঁপুনি দিয়ে শীত করে আসে। রক্তের তেজ কমে এলে, সমস্ত স্নায়ু শেষকালে একদিন এমনি শীতে জড়িয়ে যাবে, একথা ভাবতে গিয়ে গোটা শরীর হিলিবিলি নেচে উঠল।

গুমরে গুমরে যেমন তুষের আগুন ওঠে—তেমনি করে একদিন এই ভাবনাটা মনের চারদিক দিয়ে উঠে সমস্ত জ্বালা শেষ করে দেবে-সুবালা ভাবল। বেশ সোজা সহজ হয়েছিল চিন্তাটা, আবার ঘুরেফিরে জটিল হযে উঠছে কাছে। বিকেল হয়েছে। লোকজনের চেঁচামেচি, মানুষের ডাক, কথাগুলো শুনেই সময়টা আন্দাজ করে ফেলল সুবালা। যতটুকু আকাশ উঠোনের থেকে দেখা যায়, তাতে যে মেঘ ছড়িয়ে অন্ধকার করে দিয়েছে, সে মেঘে জল নামবে কি নামবে না হয়তো। কোথায় যেন একটা শব্দ হতে থাকে। একটু টানা বাতাস বইল—হয়তো ও মেঘটা উড়িয়ে দেবে। রোয়াকে উবু হয়ে হাঁটু মুড়ে বসেছিল সুবালা। একটা শোঁ শোঁ শব্দ এগিয়ে আসছে।

"তোল তোল, ধান তোল।" বিছানা মাদুর কাঠ ঘুঁটে ওঠে। শব্দ হয়। ছুটোছুটি চলে। বৃষ্টি আসছে; বৃষ্টি নামছে গাছে পাতায়। সামনের আম গাছের পাতার ওপর সহস্র ধারায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। কলাগাছ ভিজছে নুয়েপড়া কলাবউ-এর মত। উঠোনে জল, ঘাটে জল, বুড়ীর মাথার ওপর ফাঁকা—তাই সেখানেও জল পড়ছে, শুকনো বাঁশ পাতার মতন লম্বাকৃতি হয়ে।

"সুরো—সুরো—নে যানা আমাগে।" সুবালা দোরে বসে ভিজে সারা হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ওঠবার চেষ্টা করল। এদিক সামলাতে গিযে ওদিক ভেজে, ওদিক দেখতে গিয়ে অন্যদিক ঝাপটায় ঝাপটায় সারা হয়ে উঠছে। আকাশ ঘন কালো করে এসেছে। আবার চেচাল সুবালা, "কি গো ভিজে গেনু যে! ওগো সুরো সুরো!" সুবালা আন্দাজ করে দেয়াল ধরে উঠতে গেল। বুকের কাপড়টা খুলে পড়ে শেষকালে গোটা কাপড়টা খুলে নিচে পড়ে গেল। নিচু হয়ে কাপড়টা নিযে দরজাটা ধরে ফেলল সে।

বৃষ্টি নেমেছে তাল ঠুকে ঠুকে, তুফান চলেছে সব জায়গায়, গোঙানী ফোঁস-ফোঁসানী চলেছে। উঠোনের ওপর জল জমেছে। সুবালা অনেকক্ষণ ধরে ভিজেছে, পাকা শনের মত চুল ভিজে শুঁটিশুঁটি, কাপড়চোপড় জলে চবচবে হয়ে গায়ের চামড়া আরো কুঁচকে গেছে। অমন বোশেখ-জ্যোষ্টি মাস বৃষ্টির নামগন্ধ কেউ পায় নি, আজ শ্রাবণের শেষে সে বৃষ্টি যেন রোশনাই করে নামল গাছে পাতায়। ভিজে কাপড় ছেড়ে অন্য একটা কাপড় পড়ল সুবালা। বেশ শীত ধরে যাচ্ছে, হাড়-পাঁজর রক্ত-শিরা সবাই যেন শীতটা অনুভব করতে পারছে তার। টুপির মত করে কম্বলটা মাথায় জড়িয়ে ফেলে শামুকের মত জুলজুল করে কটা চোখ বাড়িয়ে সুবালার মনে পড়ল একবার আকন্দ গাছটার কথা। আকন্দ গাছটা বোধহয় ভিজে ঢোল হয়ে গেছে। বেশ জায়গায় গাছটা হয়েছে। পুবদিকে সূর্য উঠলেই বুড়ী-গাছটা গুটানো হাত পায়ের মত ডালপালাগুলো যেন বাড়িযে ধরে থাকে, আলো নেবার জন্যে। আর তেঁতুল গাছটা, হ্যাঁ তেঁতুল-গাছটার গুঁড়িগুঁড়ি পাতা, সূর্যের আলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর শক্ত শক্ত ডালপালা, গুঁড়ি, কঠিন বাহু—কঠিন শরীর পুরুষ মানুষের মত, পুরুষ গাছই ওটা! এখানের গাছগুলো থেকে সেটার ধরন যেন আরো অন্য রকমের। গুঁড়ির খানিকটা জায়গা ওপরে উঠে গিয়ে সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে পুরুষের চওড়া শক্ত বুকের মত। সাদা রংয়ের ছোট ছোট ফুল ফোটে, চোখে পড়ে না মোটে। তা থেকে ফলটা যেন কেমন কেমন। কচি বেলায়

যেমন থাকে—পাকলে আলাদা রকমের। সুবালার মনে পড়ল, ছেলেবেলায় ঝড়ে পড়ে-যাওয়া তেঁতুল কুড়াত সে। লম্বা লম্বা ফল, ওপরে একটা কঠিন শক্ত খোলাস জড়ানো। সুবালার হাত-পাগুলো, তেঁতুল-খাওয়া দাঁতগুলো যেমন সড়্সড়্ করে তেমনি করে উঠল।

উঠোনে নদীর জলের জোয়ার লেগেছে যেন। কাদাজল, ঘোলাজল, ঘরের ছাঁচের লাল লাল জল—জলে জলে জলতরঙ্গ—ছলবল ছলবল। একটা তালপাতার টোকার ওপর সারাদিন একরকম—কখনও একটু বেড়ে গিয়ে টপ্টপ্ জল পড়ার শব্দে কান খাড়া করে ছিল সুবালা। পুরানো জানালা ফাঁক হয়ে আছে বেশ। হাওয়া রোদ ঢোকে জানালাটা বন্ধ করলেও। সুবালার পাশ দিয়ে পায়ের কাছ দিয়ে জলের দাগটা গড়িয়ে যাচ্ছে—আরো জল এসে পড়ছে। বেঁকেচুরে এদিকসেদিকে চলে গেছে। সুরো দরজা গোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে অবাক হয়ে গেল, "ওমা ঘরে যে নদী বইছে—খেয়াল নেই গা! চোখে দেখতে না পাক—গায়ে জল লাগলেই তো বুঝতে পারে মানুষ!" ন্যাতা এনে মুছল সুরো ঝটপট। সুবালার বিছানাটা জল উঠে ডব ডব করছে। ও-ঘরে একবার বেরিয়ে গেল সুরো। আবার এ-ঘরের জানালাগুলো ভাল করে ন্যাকড়া দিয়ে বন্ধ করতে গিয়ে সুরোর নজরটা গেল। বুড়ীর কাছটায় এগিয়ে আসতে লক্ষ্য পড়ল সুরোর। ঠিক দেখছে তো সুরো? হঠাৎ নজরে পড়ল বুড়ীর গায়ের কম্বলের রংয়ে রং মিশিয়ে বসে আছে কি একটা জিনিস। কাছে এসে সন্তর্পণে হাত দিল সুরো। ইস্ দুটো ব্যাঙ, কোলাব্যাঙ—"এ রাম গো পিসি! একি মানুষ নাকি গো? টের পাও নি? ওঠ ওঠ!" সুরো তাড়া দিল, "হুস হুস"। অনেক তাড়া খেয়ে সরে গেল দুটিতে কম্বলের ভঁজের ভিতর। এই বর্ষায় নর্দমার ভিতর দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে। সুবালা বলল, "আহা! বড় মায়াতি ব্যাঙটা! এই জলে তাড়ালে মহাপাতক হবে।"

পুরো চারদিন ধরে অনর্গল দুপদুপ টপটপ সরসর বৃষ্টি ঝরছে। কলাগাছটা ঘাড় নুয়ে পড়েছে। উঠোনের গাছপালাগুলো নীরব দাঁড়িয়ে। পাঁচিলটা ভিজছে ওর গা দিয়ে কলাগাছের পাতার জল পড়ে এক জায়গায় শ্যাওলা পড়েছে কালচে বর্ণ। সুরো খবর দিল, পরশুদিন ছোট পুকুরের ইঁটের দুটো পইঠে ডুবে গেছে, গতকাল আরো আড়াইটে পইঠে, আজকে আর একটা পইঠে মাত্র বাকি আছে। ঝেঁকে যাওয়া তালগাছটার গোড়ায় জল থৈ থৈ। উঁচু পাড়ের কাছে হাত-পা গুটানো আকন্দ গাছটার কাছে জল এসে জমেছে। সুরো খিলখিল

করে বলে উঠল, "পিসি, তোমার সাধের সেই আকন্দগাছ, সেটা ডুবরে এর পরে। একবার গাছটা ডুবলেই ওর পাতাগুলো পচে যাবে, তারপর জল চলে গেলেও ডালগুলো পিঁপড়েতে কুরে কুরে খাবে—বেশ তো হবে আনাড়ের গাছ ওর মরাই ভাল।"

সুবালা একটু কথা কইবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না কেন কে জানে। শিরা-উপশিরা, হাড, কব্জি সব যেন খিল ধরে যাচ্ছে। হাসছে না, কাঁদছেও না—কাঁপতে শুরু করেছে সুবালা। শরীরের ভিতর ইঞ্জিনটা যেন বেদম চেঁচিয়ে উঠেছে। বুকের ভিতরটা গুরু গুরু করছে ঢাকের কাঠির মত। এত শীত, ওমা একি হল! অবেলায় ভিজে শেষে জ্বর হবে না তো! একটা কথা মুখের কাছে আসতে ঠকঠক করে কেঁপে উঠল সুবালা। সুরো সেবা-শুশ্রূষা করতে জানে। তারিযেতুরিয়ে রান্নাও যেমন করে, তেমনি রোগের সেবা। লেপ কম্বল দিযে সাপটে চাপা দিল। আঁকড়ে ধরে রাখলো চাপ দিযে। তবুও কাঁপিয়ে তুলছে থরথর করে। ঠাণ্ডা মেঝে ঠাণ্ডা বালিস বিছানা, হাতের তালু পায়ের তালু ঠাণ্ডা রক্তহীন দেখাচ্ছে। কাপছে ভাল্লুকের জ্বর আসার মত।

আকাশ পরিষ্কার আর হয় না। সকাল দুপুর এক রকম। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যেন এ বৃষ্টি নেমেছে।

একটু কাঁপুনি কমল সুবালার। "বিষ্টি, তুমি. ঘরকে যাও, আগাশ ধরণ কর। মানুষ বাঁচুক, কাকপক্ষী বাঁচুক, বিষ্টি ঘরকে যাও।" কাঁথা মুড়ি দিযে সুবালা বিড়বিড় করে বকে। "সুরো-ও! সুরো-ও!"

সুরো বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বলল, "কি বলছ পিসি?"

সুবালা বলল, "বলি আগাশের একি জল, একি আর থামবে না?" বলেই কিসমিসের মত দেহটা নাডল একবার।

সুরো মুখের ওপর পড়া রুক্ষ চুলগুলো সরিযে বলল, "জানি না, বিছানা মাদুর সব ভিজে নৈরেকার হয়েছে। একে শুকোয় না, তার ওপর আবার ভিজছে।" একটু থেমে বলল, "এর তো কোনো খবর এল না, জানি না সব কেমন আছে। চারদিকের ভাবনা নিয়ে আর পারিনি পিসি!"

সুবালা বলল, "কিছু ভাবিসনি সুরো, ছোঁড়া এসে পড়ে আরকি দেক্ না।"

আবার একটু চুপচাপ। বাইরে বৃষ্টি ঝরছে ছপছপ সরসর; একটু আস্তে, কখনও আবার বড় বড় ফোঁটা। উঠোনের কলাবউ ভিজছে ঘোমটা মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। যেন একঘড়া জল নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর ভিজে

সারা হচ্ছে। আকন্দ বুড়ী ভিজছে ঘাটের ধারে। পুকুরের জল বেড়ে এসেছে তার গোড়ায়। খিল্ খিল্ করে উঠল সুবালা, এ বাড়িতেও সুরো বউ, সোমত্ত লাজুক বউ ভিজছে, এ ঘরেও সুবালা বুড়ী উনআশি বছরের মরাকাঠ ভিজছে একটা। একটা বাড়ি থেকে কাপড় পুড়ে যাওয়ার হৈ চৈ শব্দ উঠল আরো গম্ভীর হয়ে উঠল ভিতরে ভিতরে। সুবালা বলল "সুরো আছিস সুরো !"

সুরো অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল বলল, "অ হ্যাঁ, কি বল পিসি !"

সুবালা ঘাড় নেড়ে বলল, "এক কাজ কর না—ঈশান কোনে তুলসী তলায় একলা মায়ের বেটীকে দিয়ে একটা পেত্‌লা বাটি পুঁতে দে দিকিন—জল থেমে যাবে। সেবারে আমি, রাখালি, পিরো তারকেশ্বর যাব ঠিক—এমন সময় জল নাবল মঙ্গলবার থেকে নাগাড়ে চারদিন। শেষে ননীর জাড়তুতো বোনকে দিয়ে বাটি পুঁততে পরের দিনে রোদ্দুর বেরল। তা না হলে আর এক কাজ করতে হয়"—সুবালা একটু থেমে বলল।

"কি !"—সুরো বলল, "বল না, শিখব বলতেই হবে।" চেপে ধরল।

"তবে শুনেই রাখ, খবরদার সেকামনি কাকেও। জিনিসটা হল গিয়ে চুরি করে নিয়ে আসতে হবে একটা লোহার জিনিস—মাটিতে পুঁততে হবে।…"

বাইরে বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে। সন্ধ্যা কখন এসে পড়েছে। কালো ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের রংয়ে সন্ধ্যার রং মিশে গিয়ে আরো ঘন কৃষ্ণ হয়েছে সন্ধ্যার রূপ।…নেলোর ধারে নাকি সব ভেসে গেল। পুকুর থেকে মাছ উঠছে আর মাঠের পাশ দিয়ে তাল ঠুকে ঠুকে চলতে শুরু করেছে জলের স্রোত ধরে। ঘরের ভিতরের কোলাব্যাঙ ছুটো সরে গেছে—পুবদিকের দেয়ালে একটা ইঁটের খাঁজে মুখ লুকিয়ে নেতিয়ে পড়ে রয়েছে। জ্বরটা আরো বাড়ছে মনে হয় সুবালার। জ্বরটা বাড়বার আগে শীত ধরে। হাত-পা খিল ধরে আসে, টাটিয়ে ওঠে সর্বাঙ্গ। পাকা কই মাছের বুকের হলুদ রঙের মত সুবালার চোখে পাখি মানুষ গাছপালা সব মুছে যাচ্ছে। ভুল হয়ে যাচ্ছে অনেক। মনে হচ্ছে যেন গাছপালা ঘুরছে, আকাশ বাতাস টানছে ঘুর্ণি বায়ুর মত। টানা হাওয়া বাইরে বইছে, তার সঙ্গে বৃষ্টি। আঙুল পা হাঁটু পায়ের পেটি টিপে টিপে দেখতে লাগল সুবালা—কোন সাড় আছে কিনা। চুপসে যাওয়া দেহে রক্তের চাপ না থাকার দরুণ সব জায়গা অসাড়। ঠাণ্ডাটা জেঁকে বসেছে বুকে পিঠে, হাঁটুতে, কানের কাছে, আরো অনেক জায়গায়, সেটা ঠিক বুঝতে পারে না। একটা কিশমিশ টিপলে যেমন কোন যন্ত্রণা হয় না, তেমনি সুবালার পায়ের খানিকটা মাংস

টিপলেও কোন কিছু হয় না। কম্বল জড়িয়ে চেপে ধরে শামুকের মত বসে আছে। সুবালার মনে হল, কম্বল লেপের ভিতর ছ'দিন একটানা একজায়গায় বসে আছে বলে এরকম মনে হচ্ছে। এখন হঠাৎ যদি কেউ কম্বল লেপ খুলে বাইরের হাওয়ায় চুপ করে খানিকটা বসিয়ে রাখে তো জমে শেষ হয়ে যাবে।

সুবালার পেটের ভিতর একটা ডাক থলথল, কোঁ কোঁ করে উঠল। সুবালা ভাবল ওর বাড়িতে দুপুরের দিকে যে ঘেয়ো কুকুরটা আসত, গায়ের লোম কামড়ে কামড়ে চামড়া বের করত কেবল তারও পেটে ঠিক অমনি কোঁ কো শব্দ উঠত একটা।

বাইরে থেকে হঠাৎ একটা গলা ঘরের ভিতর খন খন করে উঠল, "পিসির কথাটা জিগ্‌গেস করিনি গো—খাওয়ায় মেতেছিনু।" একটু পরেই বলল, "ও পিসি কেমন আছ?"

অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে জন্তুর মত বসেছিল অনেক ভাবনা নিয়ে। একটু পরেই বিষ্টু পাযের ধুলো নেবার জন্যে হাতটা কম্বলের ওপর রাখতে চমকে উঠল। "কে রা বিষ্টু! আঃ হঠাৎ এসে পড়েছিস তা ভাবনা ঘুচল!"

বিষ্টু জিজ্ঞেস করল, "কি ভাবনা গো পিসি, ভাবনা কিসের?"

"ভাবনা আবার হয় না, বিদেশে মানুষ রইল পড়ে, কোনো খবর নেই। তার ওপর আমার আবার যত রাজ্যের আবোলতাবোল।" একটু কাশল শুকনো—ঘেস ঘেস শব্দ করে। বলল. "বিষ্টু, বড্ড জর হয, রোজই বুক পিঠ টাটিয়ে—ঠাণ্ডায় জমে সাড নেই। বউ একা, ওকে বলতে ভরসা হয় না। মুখটা বিস্বাদ. একটু ঝালঝাল তরকারি ভালো নাগছে।" আবার চুপ করল খানিকটা। তারপর বলল. "কোথায় দাঁড়িয়ে আছিস বিষ্টু! আচ্ছা, বেলা চারটে বেজেছে কি বিষ্টু, আমার আফিন খাবার সময় হয়েছে কি?"

এঘরে এসে শুধু ঘন ঘন পায়চারি করতে লাগল বিষ্টু। সুয়ো এক পেট খেয়ে ঘরে এল ভিজে পায়ে। সুয়োর মনটা এখন চমৎকার। কোনো ভাবনাকে সে গায়ে মাখে না। বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে। বিষ্টু ভারী হয়ে উঠেছে মনে মনে। "পিসির কথাগুলো কি রকম শুনেছ—একেবারে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। জর হয়েছে তা দেখোনি একটু? ওকে এনেছি সেবা করবার জন্যে—ওর কেউ নেই। তোমার কাজ ফেলেও ওকে একবার করে দেখা উচিত। আমি বাইরে পড়ে থাকি তুমি অন্তত ওকে দেখবে তো!"

সুরোর কানদুটো লাল হয়ে উঠল, "ভালরে ভাল, ওর জ্বর হয়েছে তা আমাকে জানিয়েছে কি? মুখ টিপে বসে ঝিমুবে কেবল, আমি কি নাড়ী টিপে রোগ ধরব ওর! কতদিন চান করেনি জান? রোগ আপনি জড়িয়ে ধরবে ওকে।"

বিষ্টু চুপ করে রইল একথার কোনো যুক্তি নেই বলে। গম্ভীর স্বভাবে রাগ প্রকাশ পেল বিষ্টুর। চোখ দুটো বুজে শুয়েছিল। ঠাণ্ডা কনকনে বিছানায় সুরো শুযে পড়েছে।

একটু পরে খিলখিল করে হেসে উঠল সুরো। "যেমন পিসি তার তেমনি খবর। এই এক কথা বলছে, আবার সব ভুলে অন্যকথা। আবার বলে কি জান? বুঝলি, আমার আবার বাচ্চা ছেলের মত দুধেদাঁতে হবে গো! বউ দেখিস, আবার কত অরুচি হবে, খেলে বমি হবে, জ্বর হবে। আর একটা কথা শুনবে গো—! সেদিন চাঁদনি রাতে, দশটার সময় বুড়ী দালানে এক শিশি তেল নিয়ে বসে মাখছে। জিগ্‌গেস করতে বললে—যাই, চানটা সেরেই আসি বেলা তো হল—ভীমরতি গো, বুড়ীকে ভীমবতি পেযেছে!"

বাইরে বৃষ্টি আবার নেমেছে। সুরো কখন যে ঘুমিযে কাদা হল! ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। বিষ্টুর চোখে ঘুম আসছে না। কতকগুলো এলোমেলো চিন্তা ছবি রং পাক খেতে খেতে ঘুরছে চোখের সামনে। এই বর্ষায় ট্রেন যাওয়া, ভিজে পাতা গায়ে লেগে সর্‌সর্‌ শব্দ ···। সুবালার কথাগুলো মনে পড়ছে—"আর নড়চিনে কিষ্টন এখান থেঙে। এ আমি বেশ আছি, খাচ্ছি দাচ্ছি এ আমার রাজপুরী! পিলেনপুরে নিজের ঘরটির মধ্যে মুখ বুজে থেকে থেকে ভাবনা হযেছিল এখানে কি করে থাকব! আমার উদঘট্টি স্বভাব কখন কি রকম হয, তোমাদের তো জালিয়ে মারব শুধু! টাগাপয়সা মেয়েমানুষেব হাতে তো থাকে না, এখন নিসম্বুলে হয়ে বসে আছি—যেতে পারলেই হয। ঘরটা ফেলে দিস—ওতে আর বাস করবুনি কিষ্টন।"

বাইরে উনপঞ্চাশ বায়ু মাতাল হয়ে দরজায় টোকা মারছে। ভিজে ভিজে এসে বিষ্টুর মনটা বেশ চমৎকার হয়ে উঠছিল। দালানে একটা ঘটি কে পায়ে করে ফেললে। উট্‌কো বেড়ালগুলো মাঝে মাঝে একাজ করে। বেড়ালের কেলা নয়—কোনো মানুষের শক্ত পায়ে ফেলার শব্দ। ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠল বিষ্টু।

"কে, কে গো পিসি? কোথায় যাবে, কি করবে? বাইরে যাবে নাকি?"
সুবালাকে কাঁথা জড়িয়ে ওঘর থেকে উঠে আসতে দেখে আশ্চর্য লাগল বিষ্টুর।

সুবালা বলল, "কেরা বিষ্টু ?"—কোথায় যেন চেয়ে রয়েছে।

"কি পিসি ভয় পেয়েছ, কোথাও উঠবে নাকি ?" বিষ্টু বলল।

সুবালা যেন কোনো দিকে চোখ রেখে বললে, "আমার বড্ড জাড় পেয়েছেরে, বড্ড কম্প দিচ্ছে মরে গেনু—একটু রোদ পোয়াব নিয়ে চল।"

একটা জন্তুর মত মুখ নেড়ে বলল কথাটা। পিপাসার মুখখানা আন্দাজ করে দেখতে পেল না বিষ্টু, ভিতরের জিনিস ওটা। তোবড়ানো মুখটা অন্ধকারে আরো করুণ আরো থমথমে হয়ে উঠেছে। কথাগুলো যেন কাঁসার বাসনে ঘা দিয়ে বললে। এই রাত্রির মায়াকান্নায় সুবালার কথাগুলো মরা মনে হল, অনেক মরা কথা। বিষ্টুর শরীরের রক্ত একটু চঞ্চল হয়ে উঠছিল। অন্ধকার কান্নার রাত্রির পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সুবালাকে একটা ভিজে জন্তুর মত মনে হল। কী যেন ভাবল। একবার ওর দিকে চেয়ে, তারপর বাক্স থেকে বাসি করা থান কাপড় এক থানার ভাঁজ খুলে টাঙিয়ে দিল দালানের উত্তরদিক থেকে দক্ষিণদিকে। ছটো হ্যারিকেন জেলে জোর দিয়ে বসিয়ে দিল তার পিছনে। একটুখানি সাদা আকাশ, আর তার সঙ্গে একটুখানি উত্তাপকে অনুকরণ করে তোলবার চেষ্টা করল বিষ্টু। বুড়ীকে ধরে ধরে এনে বসাল সেখানে।

"আঃ বাঁচালি বাবা !" কম্বল খুলে বুড়ী পাশে রাখল।

সকালবেলা বৃষ্টি থামলেও কেমন আশ্চর্য চোখে চেয়ে রইল সুরো—খুটির কাছে ঠেস দিয়ে, কাদা জলের ওপর পা দিয়ে অন্যমনস্কর দাগ কাটতে লাগল। রাত্রির ঘটনাটাকে মন দিয়ে, চোখ দিয়ে, কল্পনা দিয়ে, নিজের কাছে বিশ্বাস করাতে পারছিল না। রোজ সকালে গোবর-জল ছড়া দেয়—আজও দিতে দিতে নারকেল গাছটার কাছ পর্যন্ত গিয়েছিল; তবে আজকের গোবর-জল ছড়া দেওয়াটা আরো করুণ। তখন রাত শেষ হয়নি—পাখিরা ডাকছে একটা-আধটা। কোঁচার খুঁট গায়ে দিল বিষ্টু। হরিনামের ছোট দলটা এবাড়ি থেকে মনসাপুকুর হয়ে চলে গেল। শুকনো কাঠ কিছু খুঁজে বার করে নিয়ে জনকতক ওদের সঙ্গে চলে গেল মন্ত্রপুতের মত। আবার একটু বৃষ্টি নামল গাছের পাতায়, ফেরবার সময়। শ্মশানে যারা গিয়েছিল, তারা এসে নিমপাতা চিবোল, গুড় মুখে দিল একটু, দক্ষিণ-মুখো আমরুলের প্রদীপটার উত্তাপ ছুঁলো সবাই। সেদিন রোদ বেরুলো না মোটে। সমস্ত দিনটা অন্ধকার শাদির মুখের মত হয়ে রইল।

খোঁজ পড়ল কদিন পরে—খুঁজতে গিয়ে ফিরে এল ; ভাঙা হ্যারিকেনটায় তেল দিয়ে ঠিক করে বিষ্টুর সামনে বসিয়ে দিল সুরো। বলল, "হ্যারিকেন ছুটো পিসির ওপর কি দরদটাই না দেখালে। ছিঃ, একি মতিভ্রম !"

বিষ্টু চেয়ে ছিল অন্যদিকে। পশ্চিম আকাশে একটা আসমানি রং ধরেছে। আলোখেলা চলছে। মনে হচ্ছে যেন রং খেলা, পাশা খেলা, দাবা-খেলা,—আরো কত কি খেলা হচ্ছে। মিনিটে মিনিটে সে রং পাল্টে যাচ্ছে, ঘুঁটি পাল্টাচ্ছে, বন্দী হচ্ছে, মুক্তি পাচ্ছে। গাছের পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল একবার বিষ্টু। সারাদিনের গরম নিয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলছে একটু একটু করে, মুখ-চোখের ফুলো ভাবটা কেটে গেছে ওদের।

আর মাটির ওপরের খানিকটা অংশ রোদ পেয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে !

ইংরাজী ভাষা প্রসঙ্গে

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বারবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এবং অত্যন্ত সাবধানে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে সংসদের কমিউনিস্ট সদস্যেরা স্থির করেছি যে আমরা শ্রীযুক্ত অ্যান্টনীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করব।

আমাদের এই মনোভাবের প্রধান কারণ হল দ্বিবিধ। প্রথমত, কল্পনার রাশ যতই ছেড়ে দিই না কেন, যুক্তিতর্ক নিয়ে যতই বৈদগ্ধ্য ও মায়াজাল বিস্তার করি না কেন, ইংরাজীকে কিছুতেই ভারতবর্ষে একটি ভাষা বলে বর্ণনা বা চিন্তা করা চলে না। দ্বিতীয়ত, সংবিধানের সংশ্লিষ্ট তপশীলে ইংরাজীকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য মাত্র দুটো হতে পারে ; হয় বর্তমানে এদেশে ইংরাজীর যে পরিস্থিতি, তাকেই কায়েম রাখা, নয়তো দেশের কল্যাণের কথা ভুলে গিয়ে, যতদিন সম্ভব ইংরাজী থেকে হিন্দী এবং ভারতের অন্যান্য জাতীয় ভাষায় সংক্রমণকে বিলম্বিত করে দেওয়া। আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে যাঁরা এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে, তাঁরা যে সচেতনভাবে এই উদ্দেশ্য পোষণ করেন, তা নয় কিন্তু আমি জানি যে দুর্ভাগ্যক্রমে যাকে শুধু হিন্দীওয়ালাদের বেপরোয়া বিকার বলে বর্ণনা করা যায় তারই ফলে তাঁদের মনোভাবে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। যাই হোক, প্রস্তাবটির লক্ষ্যের কথা বাদ দিয়েও বলা যায় যে এর দেশের জনস্বার্থের দিক থেকে খুবই ক্ষতিকর হবে।

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারির মতো দেশের বিশিষ্ট নেতা এমন কথাও বলেছেন যে ভারতের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরাজী অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্বীকৃত থাকুক এবং ইতিমধ্যে ইংরাজীর পরিবর্তে আমাদেরই নিজস্ব ভাষা ব্যবহারের অনুকূলে সমস্ত প্রচেষ্টা মুলতুবী রাখা হোক। যাঁরা এমন কথা বলছেন তাঁদের সদ্‌বুদ্ধি সম্বন্ধে কটাক্ষ না করে আমরা সশ্রদ্ধভাবেই বলব যে তাঁদের উপদেশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

আমার বন্ধু শ্রীদ্বিবেদী যে কথা বলেছেন, অনেকটা সেই ধরনের উদ্যোগ যদি শ্রীঅ্যান্টনী দেখাতেন, যদি তিনি বলতেন যে অষ্টম তপশীলকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করা প্রয়োজন। যদি আমার বন্ধু শ্রীজয়পাল সিংহের

মতো তিনি চাইতেন যে সিন্ধী, মুণ্ডারি, ওঁরাও প্রভৃতি ভাষার যেখানে স্থান হওয়া উচিত, যদি সেই দিক থেকে ইংরাজীকে অন্তর্ভূত করা বা না-করার প্রশ্নের অবতারণা তিনি করতেন, তাহলে আমি তাঁর কথার তারিফ করতে পারতাম। আমি নিজে মনে করি অষ্টম তপশীলে মুণ্ডারি বা সিন্ধীর জায়গা থাকা দরকার, কিন্তু ইংরাজীর নেই। কিন্তু শ্রীযুক্ত অ্যান্টনী যদি একটা সুসঙ্গত পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভাষাসমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন, যদি দেশের অধিকাংশ লোকের গভীরতম প্রয়োজনের কথা মনে রেখে বাস্তব চিন্তার পরিচয় তিনি দিতেন, তো আমি তাঁকে বাহবা জানাতে পারতাম। দুর্ভাগ্য এই যে তিনি তা করেন নি, আর আমার পক্ষে তাই তাঁকে সুখ্যাতি করতে যাওয়া সম্ভব নয়।

ইংরাজী ভাষা বা ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে আমার কোন আক্রোশ নেই ; আমি জানি আমার একথা সভার সকলে বিশ্বাস করবেন। গতবার যখন শ্রীঅ্যান্টনী বক্তৃতা করেন তখন হয়তো আমাদের মধ্যে এরকম একটা আক্রোশের ধারণা তাঁর ছিল। কমিউনিস্টদের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে হয়তো তাদের মনে ইংরাজী ভাষা সম্পর্কে একটা আক্রোশের ভাব আছে। ব্যক্তিগত কথা বলার অনুমতি পেলে জানাতে চাই যে আমি নিজে আমার জীবনের কয়েকটা বৎসর অত্যন্ত সুখেই ইংলণ্ডে কাটিয়েছি ; ইংলণ্ড এবং সে দেশের বহু দৃশ্য ও ধ্বনির স্মৃতি আমার মনে যে স্থান নিয়ে আছে তা বিশদ করে প্রকাশ করতে আমি সংকুচিত বোধ করি ; ঘনিষ্ট বন্ধুদের কথা ভাবতে গেলে ইংরাজ নরনারীর কথা ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি জানি এবং জোর করে একথা বলতে চাই যে আমাদের এই দুই দেশের মানুষের শিকড় যেন গিয়ে ভিন্ন ভূমিকে স্পর্শ করে রয়েছে—মানসিক আবেগবশে কিংবা ভারতবর্ষীয়ের আহত আত্মাভিমান নিয়ে একথা আমি বলছি না. একথা মর্মে মর্মে বুঝি এবং জানি বলেই বলছি। এটা আমাদের মনঃপূত কিনা তা হল স্বতন্ত্র কথা ; অবাস্তবভাবে সর্বমানবের ঐক্যে বিশ্বাসী হলে এতে আমরা অবশ্যই দুঃখ বোধ করব। কিন্তু আমাদের মূল যে ভিন্ন ভূমিতে প্রোথিত, তা হল অনস্বীকার্য। এর অর্থ এই নয় যে আমরা রুদ্ধ ঘরে একেবারে আলাদা হয়ে থাকব, এবং অর্থ এই নয় যে আমরা পরস্পরকে দূরে পরিহার করে বেঁচে থাকব। কিন্তু নিশ্চয়ই এর অর্থ এই যে তাদের ভাষা কিছুতেই আমাদের নিজস্ব ভাষাগুলির স্থান নিতে পারে না, আর তাই অনিবার্যভাবে ভারতে ইংরাজী ভাষার বর্তমান পরিস্থিতি

বদলাতে বাধ্য এবং হিন্দী ও দেশের অন্যান্য জাতীয় ভাষার সামনে থেকে ইংরাজীকে পিছু হটে যেতেই হবে।

শ্রীযুক্ত জয়পাল সিংহ নিজের জীবনের কয়েকটা কথা বলেছেন। আমিও বলব যে আমার মায়ের কোলে বসে আমি বাংলা শিখেছি। মাতৃদুগ্ধের মতোই তা আমার আত্মস্থ হয়েছে। আমি জানি এবং বুঝি যে শ্রীযুক্ত অ্যান্টনী কিংবা শ্রীযুক্ত ব্যারো-র মতো যাঁদের মাতৃভাষা হল ইংরাজী, তাঁদেরও ইংরাজী সম্বন্ধে ঐ একই অনুভূতি। এই সভার অপর কোন কোন সদস্য আছেন—তাঁদের সংখ্যা অবশ্য একেবারে আনুবীক্ষণিক—যাঁরা ভাবেন যে তাঁরা শিশুকাল থেকে ইংরাজী শুনে এবং বলে আসছেন আর তাই ইংরাজী তাঁদেরও মাতৃভাষা। এঁদের সম্পর্কে আমার মনে বড় দুঃখ হয়। আমি মনে করি যে বাস্তবিকই ইংরাজী তাঁদের মাতৃভাষা নয় আর ইংরাজী সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা হল মায়ারই সামিল। শুধু কোন কোন ব্যক্তির মনে এই মায়াজাল থেকে গেলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু সমাজের কোন স্তরে ব্যাপকভাবে এর অস্তিত্ব দেখা যাওয়া অমঙ্গলেরই সূচনা করে। 'না-ঘরকা না-ঘাটকা' অবস্থায় যারা থাকতে বাধ্য, তারা সমাজের প্রত্যন্তবাসী হয়ে থাকে, জীবনে ব্যর্থতাও অনিবার্য হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে আমরা "ইঙ্গবঙ্গ" সমাজের কিছু খোঁজ রাখি, ত্রিশঙ্কুর মতো অভিশপ্ত হয়ে এই সংকীর্ণ সমাজের বহু গুণান্বিত ব্যক্তিদেরও প্রতিভা পথ খুঁজে পায়নি। নিজেকে কথা এবং কাজের মধ্যে প্রকৃতই প্রকাশ করতে হলে সংস্কৃতিগত যে অখণ্ডতা একান্ত প্রয়োজন, তারই অভাব সেখানে লক্ষ্য করা গেছে। কারও প্রতি উপহাসের ভাব দেখাবার জন্য একথা আমি বলছি না, বিভিন্ন সংস্কৃতির কৃত্রিম সংমিশ্রণে যে কুফল অপরিহার্য, তারই কথা শুধু স্মরণ করছি।

হয়তো দাবি করতে পারি যে আমি নিজে ইংরাজী ভাষা কতটা জানি, কিন্তু একথা আমি ভালো করেই জানি যে যথেষ্ট ভালো করে ইংরাজী জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের সকলের অভিজ্ঞতা কি বলে না যে ইংরাজী শিক্ষার জন্য আমরা যে সময় ও পরিশ্রম নিয়োগ করে এসেছি, সেই অনুপাতে তার ফল একান্ত মর্মন্তুদভাবে ব্যর্থ? সর্বত্র, আমাদের জীবনে প্রতিদিন এই ঘটনা কি লক্ষ্য করি না? আমরা হয়তো মনে করি যে একটা বিদেশী ভাষাকে বেশ আয়ত্ত করে এনেছি, কিন্তু সাধনা আর সিদ্ধির মধ্যে যে ব্যবধান রয়ে গেছে, তা কি

অগ্রাহ্য করা যায়? ইংরাজী শিক্ষায় যে পরিমাণ মানসিক শক্তি আমরা ব্যয় করে থাকি, তার অনুপাতে ফল যে বাস্তবিকই নৈরাশ্যজনক, তা কি আমরা জানি না? আমি মানতে রাজী আছি যে হয়তো একটা সময়ে বহু আয়াসে ইংরাজী ভাষাকে আয়ত্ত করার একটা সাময়িক সার্থকতা ছিল, কিন্তু আজকের বাস্তব পরিস্থিতিতে পূর্বের ঐ ধারাকে বর্জন করতে হবে।

আমি জানি আমাকে বলা হবে যে একটা বিদেশী ভাষার এই গুরুভার সত্ত্বেও ভারতবর্ষে বহু গুণধর ব্যক্তির প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে এতে শুধু প্রমাণ হয়েছে যে ভারতবর্ষ প্রকৃতই প্রতিভার অফুরন্ত আকর—ভারতবর্ষের দীর্ঘায়ু সভ্যতা পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায় কখনও খণ্ডিত ও নির্বাপিত হয় নি, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের চাপ সত্ত্বেও এদেশের সংস্কৃতি মরে নি, তার সৃষ্টিপ্রবণতা নষ্ট হয় নি, আর তাই রামমোহন রায় প্রমুখ মহৎ ব্যক্তির সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। কিন্তু মোটের উপর একথা সত্য যে ব্রিটিশ রাজত্বে আমরা মনের দিক থেকে মরে থেকেছি, আমাদের আত্মা নির্বীর্য হয়ে পড়েছে। আমি হঠাৎ এ-কথা বলে ফেলি নি, বাঁকা কথা বলার ঝোঁকে কিছু বলছি না। লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশনের পর ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দেশ গ্রহণ করে, তাতেই একথা বলা হয়েছে। মনের এই বন্ধ্যাত্ব আর আত্মার এই পেষণের একটা প্রধান কারণ যে হল ইংরাজী ভাষার চাপ, তা আমরা কখনও ভুলতে পারব না।

অবশ্যই স্বীকার করব যে আমাদের আধুনিক ইতিহাসের কোন কোন পর্যায়ে ইংরাজী ভাষা এদেশে পরিবর্তন সাধনের প্রকরণ রূপে দেখা দিয়েছে, মনের এক প্রকার জাড্য থেকে আমাদের জাগিয়েছে। কিন্তু বাইবেলের কাহিনীর নায়ক ডেভিড যেমন সল্‌-এর কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে রেখে নিজেরই চেনা নদী থেকে শিলাখণ্ড কুড়িয়ে লড়াইয়ের সরঞ্জাম যোগাড় করেছিলেন, আমাদেরও তেমনই পাশ্চাত্ত্যের বর্ম ছেড়ে নিজেদের হাতিয়ার খুঁজে বার করতে হবে। আমাদের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঠিক এই কাজই করেছিলেন; সবাই জানি যে চৌত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরাজীতে কবিতা লেখার চেষ্টার পর তিনি নিজের ভুল আবিষ্কার করেছিলেন। এই আবিষ্কারের মূল্য তাঁকে বড় অল্প দিতে হয় নি; সারা জীবন তাঁকে যেন দুটো আলাদা জগতের মধ্যে বাস করতে হয়েছিল। তার অনেকদিন পরে আমরা দেখলাম যে ইংরাজীতে অসামান্য ব্যুৎপত্তি সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী হিন্দুস্থানী, গুজরাতী ইত্যাদি ভাষাকে তুলে ধরার

জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন ; নিজের ভাষায় ডাক না দিলে স্বাধীনতা ও প্রগতির নামে যে দেশের মর্মস্থল থেকে সাড়া আসবে না, তা তিনি বুঝেছিলেন। আমার কাছে এটাই হল সব চেয়ে বড় কথা—দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে ভারতবর্ষের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করতে হবে, আর তা করতে গেলে আমরা কিছুতেই ইংরাজীকে তার বর্তমান মর্যাদায় একেবারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য রেখে দিতে পারি না।

আমাদের মধ্যে এখানে অনেকেই হলাম শিক্ষিত ভারতবাসী ; কিন্তু ইংরাজী ভাষার কাছে বশ্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার মতো কাম্য বস্তু আমাদের অতি অল্পই আছে। আমি অবশ্য চাই যে ইংরাজী যেন আমরা ভালো করে শিখি ; আমি নিজে সে-চেষ্টা করেছি। কতটা সাফল্য মিলেছে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু বিপদ এই যে আমরা প্রায় সবাই ইংরাজী-জ্ঞানকে এত বেশি সমীহ করে আসছি যে তাতে দেশের অমঙ্গল ঘটেছে। আমি শ্রীঅ্যান্টনীকে একথাটা ভালো করে বোঝাতে চাইছি। মুহূর্তের জন্যও ভাবার দরকার নেই যে আমরা ইংরাজী বর্জন করছি ; ভাবার গৌরব ও সাহিত্যের মহিমায় ইংরাজী একটা বিরাট মর্যাদার অধিকারী, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে ফরাসী ভাষার চেয়েও ইংরাজীর প্রচলন বেশি। ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, চীনা, স্প্যানিশ প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী বিদেশী ভাষা আমরা শিখতে চাই, কিন্তু কতকগুলো বাস্তব ঐতিহাসিক কারণে ইংরাজীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশি বলে এটাও স্বতঃসিদ্ধ যে প্রধান বিদেশী ভাষা হিসাবে ইংরাজীই আমাদের কাছে গণ্য হতে থাকবে। ঠিক সেই জন্য আমরা এতদূর আগ্রহ দেখিয়েছি যে মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরাজী বাধ্যতামূলক বিষয় হয়ে রয়েছে। যাঁরা উচ্চশিক্ষার পথে যাবেন কিংবা বিজ্ঞান ও শিল্পকৌশল আয়ত্ত করবেন, তাঁদের কাছে এখনও বহুদিন ইংরাজী জানা একেবারে অপরিহার্য থাকবে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত এগিয়ে আমরা পূর্ণচ্ছেদ টানব। প্রধান বিদেশী ভাষা হিসাবে ইংরাজীকে আমরা কাজে লাগাব নিশ্চয়, কি স্বভাবতই প্রয়োজনীয় সীমারেখার মধ্যে আমরা ইংরাজী ভাষা শিক্ষাও ব্যবহার করব।

শ্রীঅ্যান্টনী ঠিকই বলেছেন যে ভারতে প্রায় দেড়লক্ষ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের মাতৃভাষা হল ইংরাজী। এদের সংখ্যা যদি আরও বেশি হত এবং মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে যদি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বসবাস থাকত, তো অন্তত ভৌগোলিক কারণে সংবিধানের তপশীলে ইংরাজীর অন্তর্ভুক্তির অনুকূলে কিছু যুক্তি চলত। কিন্তু সেরূপ কোন যুক্তির ভিত্তি নেই। আরও বলা হয়েছে যে

হিন্দীর শব্দসম্ভারকে সমৃদ্ধ করতে হলে ইংরাজী থেকে বহু শব্দ ধার করতে হবে বলে তপশীলে ইংরাজীর উল্লেখ থাকুক। দুর্ভাগ্যক্রমে এ যুক্তিও অচল। বিদেশী ভাষার ভাণ্ডার থেকে কথা ধার করে আনা সম্বন্ধে কোন বাধা কখনও ছিল না, আজও নেই। আমরা ফারসী থেকে বহু শব্দ নিয়েছি। কিন্তু ফারসী হল বিদেশী ভাষা, তাকে তপশীলভুক্ত করার কোন কথাই ওঠে না। অপরপক্ষে উর্দু হল ভারতীয় ভাষা, ভারতভূমিতেই তার উদ্ভব, এবং উর্দুকে তাই তপশীলে স্থান দেওয়া হয়েছে।

উর্দুর কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে যে বহু স্থানে, আর বিশেষত দিল্লীর মতো জায়গায় প্রচণ্ড হিন্দীওয়ালাদের উৎপাতে উর্দু প্রায় উৎখাত হতে চলেছে, যদিও এখানকার পরম্পরা হল এই যে উর্দুতেই এখানে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে। এই হিন্দীওয়ালাদের নাম আমি করতে চাই না, কিন্তু সবাই জানে যে উর্দুকে একেবারে দলেপিষে মারতেই এদের আগ্রহ। আমার মনে পড়ছে যে উপাধ্যক্ষ সর্দার হুকুম সিং যখন সংবিধান-সভায় ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন, তখন এই বলে আরম্ভ করেন যে রাষ্ট্র-ভাষারূপে হিন্দীকে গ্রহণ করা ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ সত্ত্বেও এক বিশেষ ধরনের হিন্দী ব্যবহার করা এবং জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ঝোঁক লক্ষ্য করে তাঁর মনে সন্দেহ জাগছিল। এই সন্দেহজনক পরিস্থিতির অবসান আজও ঘটেনি। আমার বন্ধু শেঠ গোবিন্দ দাসজীকে আমি শ্রদ্ধা করি—সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়ে তিনি অক্লান্ত কাজ করে এসেছেন, তা সকলেরই শ্রদ্ধা উদ্রেক করবে; সাহিত্যিক গুণাগুণের কথা ছেড়ে দিলেও তাঁর প্রগাঢ় সাহিত্যানুরাগ অন্তত আমাকে তাঁর অনুরাগী করেছে। কিন্তু তাঁকে এবং আমার অন্যান্য কোন কোন বন্ধুকে উর্দুর মর্যাদা সম্বন্ধে ভাবতে বলব। অবশ্য তিনি বলেন যে উর্দুকে কেউ নিপীড়ন করছে না, যে সমস্ত অভিযোগ আসে তা হল অতিরঞ্জিত। হয়তো অভিযোগের মধ্যে কিছু অতিরঞ্জন একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে প্রকৃতই উর্দুভাষীদের মন আজ একান্ত আহত হয়ে রয়েছে।

কলকাতার কথা তো আমি জোর করে বলতে পারি। সেখানে উর্দুভাষীর সংখ্যা অল্প নয়। 'কল্‌কতিয়া' নামে যাদের পরিচয়, ছোটখাট কাজকর্ম করে যারা জীবনযাপন করে, তারা উর্দুতে কথা বলে, তারা উর্দু কবিতা পড়ে, কোথাও "মুশায়রা" হলে উল্লাসে ছুটে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু কলকাতা,

বোম্বাই, দিল্লী, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানে উর্দুকে অল্পাধিক পরিমাণে সরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে। এই অন্যায়কে রোধ করতে হবে। আমাদের আলোচ্য বিষয় আজ আলাদা, কিন্তু হিন্দীপ্রেমীদের আমি সতর্ক করে দিতে চাই যে হিন্দী ছাড়া অন্য ভাষায় যারা কথা কয়, তাদের চিত্ত জয় করতে না পারলেও অন্তত সন্দেহ নিরসন না করলে বাস্তবিকই দেশকে হিন্দী গ্রহণ করানো সম্ভব হবে না।

আমাদের মধ্যে অনেকে স্বচ্ছন্দে ইংরাজী বলে যেতে পারি; হয়তো কারও কারও মনে এই নিয়ে একটু অহঙ্কারও আছে। কিন্তু সভার কাছে আমি অনুনয় করে বলব: ভুলবেন না যে ইংরাজী নিয়ে মেতে থেকে আমাদের প্রচণ্ড মূল্য দিতে হয়েছে। এমন কোন সংখ্যাবিদ হয়তো নেই যিনি হিসাব করে বলতে পারেন যে নিছক বিদেশী একটা ভাষা শিখতে গিয়ে বহুদিনের ধস্তাধস্তিতে আমাদের মস্তিষ্কের অপব্যয় কি পরিমাণ ঘটেছে। ইংরাজী শেখা যে সহজ বস্তু নয় তা আমরা জানি। আর শেখার এতদিনকার ফলাফল দেখে সন্দেহ হয় যে এত বেশি কাঠখড় পোড়ানো কি সার্থক হয়েছে?

আত্মপ্রবঞ্চনার কোন প্রয়োজন নেই। তরু দত্ত, মনোমোহন ঘোষ কিংবা সরোজিনী নাইডু ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণী কেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হিসাবেও কখনও স্থান পাবেন না। কয়েকজন ভারতবাসীর ইংরাজী গদ্য উল্লেখ-যোগ্য—মহাত্মা গান্ধীর নাম এখনে সর্বাগ্রে করা উচিত। কিন্তু ইংরাজী রচনা ধারার বিকাশ ও বিবর্তনে আমাদের কোন অবদান নেই। শ্রীযুক্ত অ্যান্টনী বলেছেন যে ভারতে কিংবা আফ্রিকার ঘানাতে আমরা এক বিশেষ ধরনের ইংরাজী সৃষ্টি করছি; আমি ঘানা সম্বন্ধে কিছু জানি না, কিন্তু ভারত সম্বন্ধে বেশ জানি যে শ্রীযুক্ত অ্যান্টনীর বুদ্বুদ তখনই মিলিয়ে গিয়েছে। অ্যান্টনী সাহেবের মতো লোকেরা যে-পরিবেশে বাস করেন, তাই যেন ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে; ডিরোজিও থেকে আরম্ভ করে জন্ মাস্টর্স পর্যন্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রচনার ধারাতেই এই বাধা পরিস্ফুট। আমি শ্রীযুক্ত অ্যান্টনীকে বিদ্রূপ করছি না; অবস্থাটা বুঝতে এবং বোঝাতে চেষ্টা করছি। এদেশের সমগ্র পরিবেশ, এখানকার পশ্চাৎপট ও পরিপ্রেক্ষিত, এখানকার আলোহাওয়া পর্যন্ত যেন ইংরাজী ভাষার সাহিত্যিক উৎকর্ষ অনুশীলনে সহায় হতে পারছে না। এজন্যই আমাদের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বন্ধুদের অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মতো অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে হয়েছে। এজন্যই আমরা চাই যে

তাঁরা এদেশের আরও কাছে এসে এদেশেরই মানুষ হওয়ার চেষ্টা করুন। নতুবা সংস্কৃতি ও অখণ্ড জীবনবোধের দিক থেকে তাঁদেরই ক্ষতি। এই চেষ্টা অবশ্য সহজ নয়, সাফল্য ও সুনিশ্চিত নয়, কিন্তু ভয় হয় যে অন্য কোন পথ নেই।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী আপাতত অনুপস্থিত, কিন্তু তাঁর কথা একটু আমি বলতে চাই। আমার মনে পড়ছে তাঁর সবচেয়ে সরেশ রচনা 'আত্মজীবনী'র কথা ; সেখানে তিনি বলেছেন যে প্রায় তাঁর 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' অনুভূতি আসে—'কোথাও আমি স্বচ্ছন্দ নই, সর্বত্র যেন আমি বাইরের মানুষ।' প্রখর ইংরাজীয়ানার আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন বলে এ-ধরনের চিন্তা তাঁর মনে এসেছে, শিল্পীর সততা নিয়ে তাকে প্রকাশও তিনি করেছেন। ইংরাজীতে মোহনীয় গদ্য রচনার শক্তি সত্ত্বেও তিনি হিন্দুস্থানীতে অবিরাম বক্তৃতা করে যেতে সংকুচিত হননি ; তাঁর অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে লিখিতরূপে যা হিন্দী গদ্যের আদর্শস্থানীয়। শেঠ গোবিন্দ দাশজী এবং সুকঠিন সংস্কৃত-বহুল রচনার পক্ষপাতীদের মত যা-ই হোক না কেন, জওয়াহরলাল নেহরু দেশকে অনেক কিছু যে দিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক অর্থে ত্রিশঙ্কুর ভূমিকায় থেকে যে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার অখণ্ড স্ফূরণ হয় নি তা সুনিশ্চিত। এটা কারও একার কথা নয় ; নেহরুর মতো আমাদের আরও বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি, ইংরাজ শাসনের কল্যাণে দ্বিখণ্ডিত আত্মা নিয়ে বাস করতে বাধ্য হয়েছেন। কারও কারও ক্ষেত্রে মনের এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মনোজ্ঞ রূপ পরিগ্রহ করে থাকতে পারে। কিন্তু দেশ ও জাতি এতে ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে নূতন জীবন ও সভ্যতা যদি আমরা গড়তে চাই তো সংস্কৃতিক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষার সার্বভৌম আধিপত্যের অবসান ঘটাতেই হবে।

ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা এদেশে ইংরাজী থেকে শুধু হিন্দীতে সংক্রমণের প্রয়াসে লিপ্ত নই। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ; এক্ষেত্রে অপর কোন ভাষার দাবি তুলনীয় নয়। কিন্তু ইংরাজী থেকে হিন্দী এবং আমাদের *অন্যান্য জাতীয় ভাষায় সংক্রমণ হল কাম্য।* অত্যুৎসাহী হিন্দীওয়ালারা অন্যায় করে ক্রোধ ও সন্দেহের সঞ্চার ঘটাচ্ছে বলে অ-হিন্দী এলাকার লোক যদি প্রতিশোধ নেয়, নিরপেক্ষ ভাষা হিসাবে অনির্দিষ্ট কাল ধরে ইংরাজী চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করে, তো সেটা হল প্রায় যেন নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করার মতো কাণ্ড। আমি

জানি যে হিন্দীওয়ালাদের বাড়াবাড়ি মাঝে মাঝে সহ্য করা দায় হয়ে ওঠে, কিন্তু তার জবাবে ইংরাজীওয়ালাদের ফাঁদে আশ্রয় নেওয়ার কোন অর্থ হয় না। শ্রীযুক্ত অ্যান্টনী মিষ্ট ভাষায় বলতে পারেন যে তিনি কোন ফাঁদ পাতেননি। শুধু তিনি চান যে ইংরাজীকে সংবিধানের তপশীলে ঢুকিয়ে নেওয়া হোক। দুঃখের বিষয়, আমি তাঁর বক্তৃতা ছাড়া আমাদের পার্লামেণ্টারী কমিটির ভাষা সংক্রান্ত রিপোর্টে তাঁর আপত্তিমূলক বিবৃতিও পড়েছি। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে এ প্রস্তাব হল মাত্র প্রথম পর্ব ; ইংরাজী থেকে শুধু হিন্দী নয়, তামিল, বাংলা, গুজরাতী প্রভৃতি অন্যান্য ভাষায় সংক্রমণ ব্যবস্থাকে বিলম্বিত এবং সম্ভব হলে একেবারে রোধ করার অভিযানে এ হল প্রাথমিক পদক্ষেপ।

অবিবেচকের মতো অতিরিক্ত দ্রুতবেগে ইংরাজীকে পরিহার করা যে অনুচিত, তা আমরা বলছি। একটা চমৎকার বিদেশী ভাষা হিসাবে ইংরাজীর চর্চা আমরা ছাড়ব না আশা করি, আর একেবারে কোন দিকে না তাকিয়ে হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা সর্ব ব্যাপারে ব্যবহার করার দিকে ছুটে যাওয়াও ভুল হবে। অনেক ব্যাপারেই তো আমরা গতিবেগ স্তিমিত করে রেখেছি। সংবিধানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৬৫ সালের মধ্যেই ছয় থেকে চৌদ্দ বৎসরের সকলের বিনাব্যয়ে ও বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থার কথা, কিন্তু তার কোন আশা আজ নেই। তেমনই ১৯৬৫ সালের মধ্যেই ইংরাজীকে একেবারে হটিয়ে হিন্দীকে সেখানে বসানোর কথা সংবিধানে প্রস্তাবিত হলেও তা সম্ভব নয়। হিন্দীকে পুরাপুরি রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করতে হলে ১৯৬৫ সালের কথা ছাড়তে হবে, তারিখ স্থগিদ রাখতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করতে হবে যে চিরকালের জন্য তো নয়ই, খুব বেশি বৎসর ধরে এ মুলতুবী ব্যবস্থা চলতে পারে না।

এ ক্ষেত্রেও কায়েমী স্বার্থ স্তব্ধ হয়ে নেই, বিলম্ব ঘটাবার কাজে তারা লেগেছে। বাংলা কিংবা তামিল ভাষা হিসাবে অগ্রসর বলে পরিচিত, কিন্তু পশ্চিম বাংলা কিংবা মাদ্রাজে আজও সরকারী কাজে কিংবা শিক্ষার সর্বস্তরে বাহন রূপে ঐ দুই ভাষাকে যথাযোগ্য সাহায্য দেওয়া হয় নি। হিন্দীভাষী রাজ্য-গুলিতেও দেখা যায় যে প্রধানত উপরতলার আমলাদের আপত্তির ফলে হিন্দী ব্যবহার আশানুরূপ অগ্রসর হচ্ছে না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বিপদ টেনে আনা ঠিক হবে না, কিন্তু কিছু পরিমাণে সৎ চেষ্টা তো প্রয়োজন। আবার

প্রায়ই শোনা যায় যে আমাদের আদালতের বিচারক ও ব্যবহারজীবীরা 'ইংরাজীতে অভ্যস্ত', আর আমাদের ভারতীয় ভাষায় নাকি আইনের যুক্তিকে প্রখর, স্পষ্ট, অবিকল ও প্রাকাশক্ষম রূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, এ-ধরনের বাক্‌বিস্তারের প্রকৃত অর্থ কি ?

আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু এখানে কোনও বিপ্লব ঘটেছে বলে আমি মনে করি না। কংগ্রেসপক্ষের বন্ধুরা অবশ্য বিশ্বাস করেন যে বিপ্লব ঘটেছে। এই 'ভারতীয় বিপ্লবের' তাৎপর্য কি, প্রকৃতি কি, যদি আমরা প্রত্যাশা করে থাকি যে ধীরেসুস্থে সবকিছু পরিবর্তন সাধিত হবে, কোথাও কোনও কায়েমী স্বার্থের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগবে না ? আমি বলি যে সমাজের সোশালিস্ট রূপায়নের অর্থ শুধু এই, এবং হওয়া উচিত, যে বর্তমানে সম্পত্তি বিষয়ে মানুষে মানুষে যে পরস্পর-সম্পর্ক রয়েছে তা বদলে যাবে, আর ঠিক তেমনই একটা বিদেশী ভাষা থেকে আমাদের নিজেদের ভাষায় চলে আসার অর্থ হল ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া প্রতিষ্ঠার অবসান। আমি আবার বলছি যে কাণ্ডজ্ঞানহীন তাড়াহুড়ো চাই না। আর আমি বলছি যে বিভিন্ন ভাবাভাষীদের মধ্যে হিন্দীভাষীদের যেন একটা বিশেষ অধিকারসম্পন্ন শ্রেণীতে পরিণত করা না হয়। কিন্তু আইন বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাষাগত পরিবর্তন ব্যাপারে যতই বহুরূপী আপত্তি আসুক না কেন, ইংরাজীর বশ্যতা থেকে নিস্তার আমাদের পেতেই হবে ; যত শীঘ্র এটা ঘটে, ততই সকলের মঙ্গল।

ইংরাজী অত্যন্ত সুসহজ ভাষা এবং এজন্যই তাকে হাতিয়ার হিসাবে আমরা রেখে দেব বলে যে যুক্তি শোনা যায়, তাকে আমরা মানতে পারি না। আমাদের ভাষাগুলি যে ইংরাজীর তুলনায় অনেক পশ্চাৎপদ, তা আমরা খুবই জানি। কিন্তু আমাদের কাজ আমাদের নিজস্ব ভাষার মারফতেই করতে হবে। নইলে সে-কাজেই গলদ চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আমাদের সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক স্তরকে যদি উন্নত করতে চাই, মুষ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিতের স্বার্থের কথা না ভেবে ইংরাজীর চাপ থেকে যদি আমাদের পিঠ-নুয়ে-যাওয়া ভাষাগুলিকে বাঁচাতে চাই, জনগণ এবং শাসনব্যবস্থার মধ্যে প্রকৃত, জীবন্ত সংযোগ যদি দেখতে চাই, তো দীন হলেও আমাদের ভাষার মাধ্যমেই কাজ করে যেতে হবে। গণতন্ত্রের যদি কোন অর্থ থাকে তো দেশের জনতা ও সরকারের মধ্যে ব্যবধান দূর করে দেশেরই ভাষায় দেশ পরিচালনা ও সংগঠনের দায়িত্ব নিতে হবে।

আজকের আলোচনা মুলতুবী হয়ে যাচ্ছে ; এটা আমি চাই না, কিন্তু হয়তো এতে সুফল ঘটতে পারে। আমি সভার সদস্যদের কাছে কিছু চিন্তার খোরাক দিতে চেষ্টা করেছি। কারণ আমি জানি যে সবদিক ভেবে দেখলে সদস্যেরা বিপুল ভোটাধিক্যে শ্রীঅ্যান্টনীর প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করবেন।*

---

* ৮ই মে, ১৯৫৯, তারিখে, লোকসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা। সংবিধানের অষ্টম তপশীলে ইংরাজী ভাষার অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনীর প্রস্তাব সেদিন আলোচিত হয়। বিতর্ক অসমাপ্ত ছিল ; আগস্টে আবার আলোচনা চলবে।

আচার্য রায়ের কাছে মেঘনাদের চিঠি

মনোরঞ্জন গুপ্ত

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কিছু কাগজপত্র বেঙ্গল কেমিক্যালের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগারে আছে। তাঁহার জীবনচরিত (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত) লেখার সময় এই কাগজপত্র হইতে কিছু তথ্য ব্যবহার করিয়াছি। অনেক ব্যবহার করা হয় নাই। ডাক্তার মেঘনাদ সাহার এই পত্রটি ঐ কাগজপত্রের মধ্যেই পাইয়াছিলাম। নিম্নে সম্পূর্ণ পত্রখানি উদ্ধৃত করা হইতেছে। পত্রটি বিলাত হইতে লেখা, যদিও মেঘনাদ তাঁহার এদেশের চিঠির কাগজেই উহা লিখিয়াছিলেন।

From
M. N. Saha

Department of Physics
Allahabad University
Allahabad, India
15 June, 27.

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমার মনে হয় আপনি যদি এখন একখানা সংস্কৃত Text-বর্জ্জিত, সোজা History of Hindu Chemistry লেখেন, তাহা হইলে খুব ভাল হয়। এখন আমাদের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। এখন আর Sylvian Leviর মত পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন না যে চরক কনিষ্কের সভায় ছিলেন। ডাঃ কালিদাস নাগ কোথায় লিখেছেন যে নাগার্জুন কনিষ্কের সভায় ছিলেন। তাহা হইলে তো নাগার্জুনের তারিখ ঠিক হয়ে যায়। এখানে লাইব্রেরীতে না গেলে পুস্তকাদি পাওয়া মুস্কিল, সুতরাং Natureএর প্রত্যুত্তর লিখতে দেরি হবে।[১]

আমি আর এক সপ্তাহ এখানে আছি পরে Norway যাচ্ছি। দু-চার জায়গা থেকে lecture দেওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। কিন্তু lecture দেওয়াটাকে আমি একটা অনাবশ্যক botheration বলে মনে করি। আমি এখানে শিক্ষার্থী-ভাবে এসেছি, শিক্ষার্থীভাবেই কাটাচ্ছি।

পুলিনের D. Sc. (State এবং Tres Honorable) শীঘ্রই হয়ে যাবে। পুলিনের কাজ সম্বন্ধে তাঁহার অধ্যাপকের খুব উঁচু ধারণা। তাহার পেপারটিও বেশ হয়েছে (He has proved that Scandium is not a rare earth)। পুলিন তাহার বৃত্তি হইতে জমাইয়া দেশে কাজ করার জন্য প্রায় পাঁচ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি কিনেছে। সে আমাকে বলিয়াছে, যে এই টাকাটা যেন তাহাকে দেওয়া হয়। এখানে যে দামে যন্ত্র কিনেছে দেশে থেকে Order দিলে তাহার ঠিক ডবল দাম পড়ে। তাহার কাজের জন্য এই যন্ত্রগুলি খুব অবশ্যকীয় হইবে। [২]

Franceএর educational system সম্বন্ধে আমি খবর নিয়েছি। নীচে লিখিয়া দিলাম। [৩]

আমি Franceএ প্রায় সাতদিন ছিলাম। নানা জায়গায় ঘুরে এই সমস্ত খবর নিয়েছি।

এদের organisation অনেকটা আমাদের Dacca Universityর মত। Chef de Cours আমাদের Readerর স্থানীয়। যখন কোনও Lecturer বড় নাম করে, কিন্তু তাহার জন্য কোনও Professorship খালি না থাকে তখনই তাহাকে Chef de Cours করা হয়।

Preparateurদের lecture দেওয়ার কোনও ক্ষমতা নাই। তাহারা professor যখন lecture দেয় তখন সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং professor বক্তৃতা দিয়া চলে গেলে ছেলেদিগকে পুনরায় সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দেয়।

এখানে different cadres of Govt. Service যেমন Ex. Service Judicial, P. W. D., Education—ইহাতে বেতন মাত্রার খুব ইতরবিশেষ নাই। সম্প্রতি legislation হচ্ছে, তাহাতে যাহা কিছু পার্থক্য ছিল তাহাও abolish করা হবে। বয়স ও পদবী অনুসারে সকল serviceর লোকই সমান বেতন পাবে। যেমন যে-লোক Ecolo Polytechnique থেকে পাশ করে military lineএ যে General হইল তাহার যত বেতন হবে, যে লোক Universityতে ঢুকে Professor হবে তাহারও প্রায় একই রকম বেতন হবে। Civil serviceএর listএ দুইয়েরই একসঙ্গে নাম থাকবে। Educational serviceএর different gradeএর লোকদের বেতনে তেমন পার্থক্য নেই। আমাদের দেশে demonstratorরা পান ১৫০৲ Professorরা পান ১২৫০৲। [৪] Ratio 1 : ৪। এখানে minimum ও maximumএর

মধ্যে Ratio 17000-54000 i.e. 1 : 3। এখানকার Garcon অর্থাৎ Laboratory Boyরাও প্রায় Demonstratorদের সমান বেতন পায়। এবং সকলেই খুব ওস্তাদ Mechanic। আমি Sarbonaeএর laboratory দেখেছিলাম। এখানে একজন বাঙ্গালী ছেলে কাজ করিতেছে—Science Collegeএরই পূর্বতন ছাত্র (অনিলকুমার দাস)। একজন বুড়ো Garcon আমাকে একটি Curie Balance দেখাইয়া বলিল যে আমি ইহা Pierreর জন্য ৩৫ বৎসর পূর্বে তৈয়ার করি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম Pierre কে? বললে Pierreকে জান না? যিনি Radium আবিষ্কার করেন। তখন বুঝিলাম Pierre Curieর কথা বলিতেছে। এদের উচ্চতর ও নিম্নতরের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। আমাদের Science Collegeএ এইরূপ করা উচিত। সমস্ত অকেজো পশ্চিমা bearerগুলিকে আস্তে আস্তে বিদায় করে ক্ষিতীশ ও সোমেশ্বরের মত সাধারণ ইংরেজী লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের ছেলেদের Laboratoryর কাজ শেখানো উচিত। তাহাদের বেতন Maximum অন্তত Demonstratorদের মত হওয়া উচিত। ইউরোপের অনেক Industrial achievement এই শ্রেণীর লোক হইতে হয়েছে। যেমন James Watt ছিলেন—Prof. Black (discoverer of latent Heat)র mechanic. এখানকার Adam Hilgar, Cambridge Scientific Inst. Co. ইত্যাদি অনেক বড় বড় কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন Professorদের mechanic। বড় বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণত তাহাদের আবিষ্কারকে কাজে লাগাতে পারে না—তাহা করে যাহারা ছাত্র বা অধস্তনভাবে তাহাদের সংস্পর্শে আসে।

আজ আর সময় নাই। আমি বেশ ভাল আছি; আশা করি আপনি কুশলে আছেন।

প্রণত—শ্রীমেঘনাদ

Name of Institution [প্রতিষ্ঠানের নাম]	Age of Boys Degree [ছেলেদের বয়স ডিগ্রী]	125 Franc=£ 1 [প্রায় বার টাকা] Pay of Teachers [অধ্যাপকদের বেতন]
Lycée (Cor. to Intermediate College [ইন্টারমিডিয়েড কলেজের সমান]	Baccalanoiat (16-18) [১৬-১৮]	Professor of Lycée [Lycéeর অধ্যাপক] Pay 12000 Fr—24000Fr [১১৫০৲—২৩০০৲)
Mathematique Speciale (Competitive Exam. in mathematics for admission to Engineering Course) [ইঞ্জিনিয়ারিং বিভার প্রবেশের জন্য প্রতিযোগিতা পরীক্ষা]	Ecolo de Medicine Prepares medical Men [চিকিৎসক তৈরি করে]	Faculte-Licence (University course, cor. to our B.A. or B.Sc if that course extended over three years) [আমাদের বি. এ. বি-এস সি যদি তিন বৎসরের পড়া হয় তবে তার মত]

Ecolo Normal
(Prepares for Lycée to our training Colleges)
[ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের জন্য অধ্যাপক তৈরি করে ; আমাদের ট্রেনিং কলেজের মত]

Ecolo polytechnique
(Prepares Military officers, marine officers, military Engineers
[সৈন্য, নৌ-বিভাগের উর্ধ্বকর্মচারী ও সৈন্য-বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার—তৈরি করে]

Ecolo centrale
(Civil Engineer)
[সিভিল ইঞ্জিনিয়ার]

Agregation final teacher's diploma
[অধ্যাপকের শেষ পরীক্ষার ডিপ্লোমা]

Doctorate
(These Engineers can appear for doctorate of the University)
[এই ইঞ্জিনিয়ারগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পরীক্ষা দিতে পারেন]

Doctorate

Pay of Teachers in the Faculte

Preparateur 17000-20000
Demonstrator (Franc)
[ডিমনষ্ট্রেটর, প্রদর্শনকারী ; ১৬৩০৲—১৯২০৲]

Chef de Tracaux 20000-24000
[১৯২০৲—২৩০০৲]

Head Laboratory Assistant, Generally an Engineer whose duty is to supervise all apparatus, Workshop & Practical work
[পরীক্ষাগারের প্রধান সহকারী, সাধারণত একজন ইঞ্জিনিয়ার যিনি সব যন্ত্র, কারখানা ও পরীক্ষাগারের কাজ দেখবেন]

Maitres de Conference 2200-3000 (Cor. to Lecturers)
[লেকচারারের সমতুল্য; ২১০০৲—২৮৮০৲]

Charge de Course (Readers) 30000—36000
[রিডার ; ২৮৮০৲—৩৪৫০৲]

Professor 36000—54000
[অধ্যাপক ; ৩৪৫০৲—৫১৭৫৲]

১। ১৯২৭ সনের ১৬শে মার্চের নেচার পত্রিকায় একটি জার্মান পুস্তকের সমালোচনা বাহির হয়। ফ্রান্সের বিখ্যাত রসায়নবিদ বার্থেলো রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহেই আচার্য রায় হিন্দু রসায়নের ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হন। জার্মানীর রসায়নবিদ লিপম্যান রসায়নশাস্ত্রের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়াছেন—বিশেষত গ্রীক ও ইসলামীয় রসায়নের ক্রমপরিণতির বিবরণ তাঁহার লেখায় পাওয়া যায়। উপরোক্ত সমালোচিত পুস্তক-খানি হইল লিপম্যানের ৭০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাঁহার অনুরক্তদের দ্বারা প্রচারিত স্মারক-গ্রন্থ। এই সমালোচনায় আচার্য রায়ের 'হিন্দুরসায়নের ইতিহাসের' উল্লেখ নাই—সম্ভবত এই কথাই পত্রের বিষয়।

২। পুলিনবিহারী সরকার। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের রসায়নের পালিত-অধ্যাপক।

৩। মনে হয়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এইরূপ বিবরণ চাহিয়াছিলেন। ভারতের আধুনিক রসায়নচর্চার জনকরূপে তিনি তখন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিজ্ঞান-শিক্ষার সিলেবাস, অধ্যাপকদের বেতনাদির মান ইত্যাদি বিষয় কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে কর্ম ও আবশ্যক মত দ্বন্দ্বে নিযুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন বিত্তবান প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সভ্যরূপে মেঘনাদও আচার্যের অনুবর্তী ছিলেন। রাজ্যের শাসন, বিচার, নগর, স্বাস্থ্য ও শিল্প বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারীরা যাহাতে একই বেতন ও সম্মান পায় তার জন্য তাঁহারা উদ্‌গ্রীব ও চিন্তিত ছিলেন। [ ] বন্ধনীর মধ্যে বাংলা পরে যুক্ত করা হইল।

৪। উপরের কর্মচারীরা নীচের তুলনায় খুব বেশী বেতন পান, এই প্রসঙ্গ আজকাল খুব শুনা যায়। উপরের কর্মচারীরা এত বেশী পান যে অবহেলে খরচ করিয়াও বিপুল অর্থ সম্পদ রাখিয়া যান। পরে তা উত্তরাধিকারীরা অনেক সময় বৃথা ব্যয় করেন। অপরপক্ষে নিম্নস্তরেরা এত কম পান যে গ্রাসাচ্ছাদন চলে না, সন্তানদের শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয় দেওয়া যায় না এবং এদের কোনও সঞ্চয়ও মৃত্যুর পর দেখা যায় না।

এখন হইতে প্রায় ৩২ বৎসর আগে বিদেশের অবস্থা দেখিয়া মেঘনাদ এই বিষয়ের প্রতি আচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে যখন মেঘনাদ সমাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজনীতিক জীবনে তাহা ক্রমশ পরিস্ফুট হইতেছিল তখন এই বৈষম্য তাঁহাকে পীড়িত করিত।

৫। মেঘনাদ নামের আগে শ্রী লিখিয়াছিলেন। চিঠিতে দেখা যায় দুইটি মোটা মোটা টান দিয়া শ্রীটি কাটা আছে। এইরূপ কাটা আচার্যের অভ্যাস ছিল। আচার্য রায় জীবনের শেষ দিকে নামের আগে শ্রী পছন্দ করিতেন না। তাই তাঁর বাঙলা আত্মস্মৃতিতে উল্লিখিত কোনও নামের আগেই শ্রী নাই।

বই

নক্ষত্রের রাত ॥ মতি নন্দী ॥ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটড পাবলিশিং কোং ॥ দাম সাড়ে তিন টাকা ॥

সৃজনী সাহিত্যের সমস্ত শাখাগুলির মধ্যে উপন্যাস সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক। সর্বাপেক্ষা বহুতোষিনী। একান্নবর্তী পরিবারের বর্ষিয়সী গৃহিণীর মতো সে সুবৃহৎ পরিবারের সকলেরই পরিচর্যা পরিতোষণ ও প্রেরণার ভার গ্রহণ করেছে। সুবিস্তৃত পাঠকমণ্ডলীর ওপর ভরসা রেখে দিকে দিকে যে সাধারণ পাঠাগার গড়ে উঠছে, বলা যেতে পারে প্রধানত উপন্যাস-অধ্যায়ী জনতাই তার মূলে। সে কারণেই উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে fiction reading public বা পাঠক জনতার স্বরূপ নির্ণয়ও একটা প্রধান কাজ। পাঠকের রুচি নির্মাণে লেখকের অসামান্য ভূমিকার কথা স্মরণে রেখেই বলা চলে যে পাঠকের পরোক্ষ এবং সময় সময় অপরিহার্য প্রভাবের কথা উপন্যাস সাহিত্যের আলোচনায় সহজেই উত্থাপিত হতে পারে। এবং সেইজন্যই দায়িত্বটা শেষ পর্যন্ত লেখকের হলেও পাঠকের সদর্থক প্রভাবের কথাটাও আলোচ্য।

সাহিত্যের ইতিহাসে যে কোনো যুগেই বিশেষ যে সমস্ত সাহিত্যিক যুগে স্বাস্থ্যের একটা ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ধারাও বহমান—দেখা যায় যে ঔপন্যাসিক যেমন তাঁর পাঠককুল সম্বন্ধে সচেতন থাকেন, পাঠক-জনতাও তেমনি নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখতে চায় উপন্যাসে। ইতিবাচকতায় সমৃদ্ধ প্রতিটি সাহিত্যিক যুগেরই এটা বৈশিষ্ট্য। ঔপন্যাসিক এবং তাঁর পাঠক-জনতার মধ্যে সহজ সম্পর্কের জন্যই এটা ঘটে থাকে এ প্রসঙ্গে এ উত্তরটা অবশ্যই প্রাথমিক উত্তর।

আসল ব্যাপারটা একটি অতি সাধারণ সূত্রে। বস্তুত সাহিত্যে রুচি বা সাহিত্যে স্পৃহা মূলতঃ জীবনে রুচি বা স্পৃহা থেকেই উৎসারিত। যে যুগে মানুষ জীবনের রূপ-রূপান্তর সম্বন্ধে বাস্তব কারণেই অধিক কৌতূহলী, সে যুগের মানুষের শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহও সেই সুস্থতা ও স্বচ্ছতার দ্বারা চিহ্নিত। সমাজে যখন নতুন মানুষ দেখা যায়, জীবনের নানা ক্ষেত্রে মানুষ যখন

নিজেকে নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তখন উপন্যাসের শিল্পরূপে, নাটকে মানুষ নিজের সেই নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা বেদনা-বাসনাকেই আস্বাদন করতে আশা করে। উপন্যাসের শিল্পরূপের ভূমিকায় নিঃসন্দেহে থাকেন লেখক—কিন্তু শিল্প হিসাবে উপন্যাসের সঙ্গে এই কারণে সমাজে আবির্ভূত নতুন মানুষের সম্পর্ক নিবিড়। এইখানেই ঔপন্যাসিককে তাঁর সমকালীন পাঠক-জনতার সর্বাঙ্গীন রূপ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়।

লেখকদের ওপর পাঠকদের এই সদর্থক প্রভাবের কথা বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে যুদ্ধোত্তর বাঙালী পাঠকসমাজের সঙ্গে যুদ্ধপূর্ব বাঙালী পাঠকসমাজের একটা প্রতি তুলনা স্বভাবতই না এসে যায় না। তিরিশ সালের পরবর্তী দশ বছরের যুদ্ধপূর্বকালে দেখা যায় যে তৎকালীন বাঙালী ঔপন্যাসিক তখনকার বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবন-জিজ্ঞাসাকে তার প্রশ্নময় রূপকে বুঝতে চেয়েছিলেন। নানা আংশিকতা সত্ত্বেও 'কালিন্দী', 'পথের পাঁচালী', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'অন্তঃশীলা', 'একদা' তার প্রমাণ। আসল কথা এখন বাঙালী মধ্যবিত্তের নানা দুর্দশা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার মনের মধ্যে একটা আশা ছিল। দেশের লৌকিক জীবনের সর্বত্র নিজেকে ব্যাপ্ত করার বাসনা, দেশজ ঐতিহ্যে নিজেকে যুক্ত করার আকাঙ্ক্ষাও ছিল সে যুগের বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনতৃষ্ণারই অন্তর্গত। লেখকদের উপন্যাস রচনায় জীবন সম্বন্ধে স্থায়ী মূল্যবোধ এবং পাঠক-জনতার উপন্যাসের মুকুরে আত্মদর্শনের সদর্থক বাসনার প্রভাবে উনিশশো তিরিশের পরবর্তী দশকে অন্তত গুটি সাতেক বাংলা উপন্যাসের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে যুদ্ধের প্রভাবে, অথবা দেশবিভাগের প্রভাবে বাঙালী মধ্যবিত্তের অভিজ্ঞতায় এমন কী আহৃত হল যা যুদ্ধপূর্ব জীবনে ছিল না। বেকার সমস্যার রূপ আটাশ সালের মন্দায় আমরা যে দেখিনি তা নয়। মেয়েদের শরীর কেনাবেচার কথা—নানান দুর্নীতির কথা মন্বন্তরের দৌলতে আমাদের একেবারেই অজ্ঞাত ছিল যে তাও নয়। আন্দোলনের হতাশাও বত্রিশের আন্দোলনের পরে আমরা অনুভব করেছি। দেশবিভাগ, যুদ্ধ এ অভিজ্ঞতার সঙ্গে আর নতুন করে কিছু যুক্ত করতে পারেনি। শুধু বলা যায় দেশবিভাগের ফলে আমরা সাধারণ মানুষের দুর্ভাগ্য ও মানুষের পাপ সম্বন্ধে বেশি সচেতন হয়েছি। জীবনের দুর্দশা সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতাকে দেশবিভাগ ব্যাপক করে তুলেছে মাত্র। কিন্তু দেশবিভাগ রাষ্ট্রীক ঘটনার সঙ্গে গ্রথিত বলেই এটা

একটা বৃহত্তর বেদনার জন্মদাতা হয়ে দাঁড়াল। এই বেদনা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে বাঙালী মধ্যবিত্তের আশাভঙ্গের বেদনা। যুদ্ধপূর্ব দশকে বাঙালী মধ্যবিত্ত শত দুর্দশাতেও যে আশা, জীবন সম্বন্ধে যে মূল্যবোধের দ্বারা চিহ্নিত ছিল—সেই আশা করবার ক্ষমতা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বাঙালী মধ্যবিত্ত হারিয়ে ফেলেছে। দেশবিভাগের আঘাত এই আশাভঙ্গের বেদনা সৃষ্টিতে প্রধান আঘাত। এই প্রচণ্ড আঘাতকে সামলে কোনো বাঁধবন্ধন, কারখানা-নগরী স্থাপন বা সেতু নির্মাণ বাঙালী মধ্যবিত্তকে আশাবাদী করে তুলতে পারেনি। আমলা-তান্ত্রিক কৃত্রিমতায় এগুলো আবদ্ধ থেকে গেছে—জাতীয় উচ্ছ্বাসে পরিণত হতে পারে নি। এই আশাহত উদ্দেশ্যহীন বাঙালী মধ্যবিত্তই এ যুগের প্রধানত পাঠক-সমাজ নিজের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় যার কোনো আগ্রহ নেই।

স্বভাবতই উদ্দেশ্যহীন জীবন, কেরিয়ারমুখিনতা, বেকার সমস্যা, অবিবাহিত মেয়ের যন্ত্রণা, ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যার সংখ্যা সমস্ত মিলিয়ে যে জীবনের রোজ-নামচা—যে জীবনের সুস্থতার স্পৃহাও ছিল ক্ষীয়মান, সেখানে সুস্থ সাহিত্যপিপাসা প্রধানত দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। রোগগ্রস্ত কুরূপব্যক্তি যেমন নিজ অবয়ব মুকুরে প্রতিফলিত দেখতে চায় না এই আশাহত মধ্যবিত্তও তেমন নিজ বিকারদগ্ধ জীবনের ছবি উপন্যাসের মুকুরে দেখতে স্বীকৃত হয়নি। এই হতাশ এবং ভাঙনদশাগ্রস্ত মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে তবু দু-একখানি উপন্যাস লিখিত হয়েছে। বারোঘর এক উঠান, চেনামহল, অথবা মোমের পুতুল তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। কিন্তু অবক্ষয়ের অভিজ্ঞতা থেকে কোনো নৈতিক তাৎপর্য নিষ্কাশিত করতে না পারায় এরা খুব বেশি বৃহত্তর পাঠক-সমাজকে নাড়া দিতে পারল না। তার বদলে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সংখ্যায় বর্ধিত পাঠকমণ্ডলী যে বই পড়ে খুশি হতে চেয়েছেন অথবা বিস্মৃত হতে চেয়েছেন রূঢ়তাকে তা হল, রম্যরচনা অথবা ইতিহাসবোধ বিরহিত উনিশ শতকীয় কাহিনী অথবা অপরিজ্ঞাত জীবনের নাম করে রচিত আপাত অভিজ্ঞতা-আশ্রয়ী অবাক করে দেওয়া রচনা। আলোচ্য কালের এই চরিত্র অনেক বেশী সুস্পষ্ট হয় যখন দেখা যায় যে তারাশঙ্করের মতো মহৎ প্রতিভাকেও এই যুগে লিখতে হয় 'রাধা'।

এইভাবে পাঠকসমাজের সদর্থক প্রভাবের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে আমাদের ঔপন্যাসিকেরা নৈতিক দীপ্তিবিশিষ্ট শিল্পসৃষ্টির কথা ভুলে গিয়ে এক ধরনের লঘুপাচ্য রচনায় ব্যাপৃত হয়ে রইলেন। মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী যে সমস্ত কথাসাহিত্য একালে রচিত হয়েছে তার বিষয়বস্তু সাধারণত মিষ্টি দিদি, তেতো

বৌদি প্রমুখ একই নমুনার, বিভিন্ন লেবেলের নারীকুল। পড়ে মরুকগে চারু বৌঠান, কুমু কিংবা ললিতাও। শরৎচন্দ্রের হৃদয়সর্বস্ব নায়িকাদের বিকৃত উত্তরাধিকার বহন করে অর্ধশিক্ষিত কিশোরকিশোরী পাঠিকাদের মুখ তাকিয়ে এরাই রাজত্ব করল এবং করছে গত বারো বছর ধরে। এবং এইভাবে অবস্থা যখন ঘোরালো এবং গ্রন্থিল উপন্যাস লেখকেরা তখন সে গ্রন্থিমোচনের দায়িত্ব গ্রহণ না করে আত্মসমর্পণ করলেন তার গোলকধাঁধায়।

অথচ আমরা জানি—তারাশঙ্করের উপন্যাস থেকেই জানি যে উপন্যাস সকল সময়েই জীবনের প্রধান সূত্রগুলির সন্ধান করে। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের ওপর বিভিন্ন দিক থেকে আলোকসম্পাত করেন ঔপন্যাসিক। এবং যদিচ ঔপন্যাসিকের সামগ্রিক বাস্তবতার সিদ্ধান্ত বহন করে সৃজিত চরিত্রাবলী—তথাপি সমস্ত মানবিক এবং সামাজিক সম্পর্কগুলির মূল্য নিরূপণই ঔপন্যাসিকের শেষ কাজ। এইখানেই তাঁকে সৎ অগ্রণী পাঠকের ওপর বিশ্বাসী হতে হয়। সুতরাং পাঠকের লেখকের পারস্পরিক সম্পর্কের অচ্ছেদ্যতার কথা মেনেও বলা চলে যে বাস্তবের স্বরূপ নির্ণয়ের দায়িত্বটা শেষ পর্যন্ত লেখকের।

এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে অতি সম্প্রতি কিছু কিছু তরুণ লেখক শস্তা বাজার-সাফল্যকে পরিহার করে নতুনভাবে শিল্পচিন্তায় অগ্রসর হয়েছেন। অসীম রায়ের দ্বিতীয় জন্ম, দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় ভুবন, জ্যোতির্ময়ের অন্তর্মনা এবং আমাদের বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থ মতি নন্দীর নক্ষত্রের রাত এই পর্যায়ে পড়ে। আমরা পর্যায় কথাটা সচেতনভাবেই ব্যবহার করছি। শ্রেণী কথাটা এক্ষেত্রে অচল এই জন্যে যে সত্যিই এঁরা এক শ্রেণীভুক্ত উপন্যাস নয়। তথাপি এঁদের পরস্পরের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি সাধারণ ঐক্য এদের মধ্যে উপস্থিত।

(ক) চমকপ্রদ ঘটনার রংদার বিবরণ (যেমন বলা যায় লালবাঈ) এঁরা পরিহার করে চলেছেন। এঁদের রচনায় ঘটনার চমকে লেখাকে ইন্টারেস্টিং করার প্রয়াস নেই।

(খ) যে ধরনের নারীচরিত্রের ছায়া-ছায়া রহস্যঘনতায় বাংলা উপন্যাস-জগৎ ন্যাকামিতে সমাকীর্ণ (এবং এইখানেই শরৎচন্দ্রের ভূত) সেই বিকৃত উত্তরাধিকারকে এঁরা বর্জন করেছেন।

(গ) কৃপণের মত অজস্র খুচরো সঞ্চয় করে পরিশেষে অভিজ্ঞতার বিস্তৃত প্রদর্শনী (exhibition) এঁরা খোলেন না।

সে জায়গায় এঁদের রচনার লক্ষণ হল :—

(ক) বাস্তবের চেহারা অপেক্ষা বাস্তবের চরিত্র অনুধাবন।

(খ) যে Reality বা বাস্তবতা ঔপন্যাসিকের অবলম্বন তাঁকে কেবলমাত্র বিবরণে সীমিত না করে রেখে সৃজিত চরিত্রাবলীর উপর বাস্তবের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে রূপায়ণ।

(গ) সুতরাং অনুভূতি এবং চিন্তাসূত্রের সাহায্য গ্রহণ এঁদের সাধারণ ধর্ম। সে কারণেই দেখা যায় যে সকল চরিত্রই আত্মসমীক্ষায় রত।

(ঘ) লেখক নিজে কখনোই কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেন না। বাস্তবের প্রতিবিম্বিত চেহারাটাই আসল কথা। চরিত্রগুলি—তথা সমস্ত উপন্যাসটিই সেই মুকুর।

মতি নন্দীর নক্ষত্রের রাতের বিষয়বস্তু সে হিসাবে এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়—সমকালীন বন্ধ্যা মধ্যবিত্ত জীবনের ক্লান্তি। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদের বিপরীত উপস্থাপনা সত্ত্বেও এই উপন্যাসের সমস্ত টুকরো ঘটনা, চরিত্র, ব্যবহৃত ইমেজ সমকালীন জীবনের ক্লান্তিবোধকেই বহন করছে। দীনেশ, মাধবী, তাদের বয়স্থ ছেলেমেয়ে চিনু, রমা, মানু এবং যে বাড়িতে তারা ভাড়া থাকে তার অন্য ভাড়াটেরা—তার মধ্যে বিশ্ব-রা প্রধান, রমার সঙ্গে যার একটা হৃদয়ের সম্পর্ক আছে—এরাই হল উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রী। এরা ছাড়া আছে—যমুনা, শৈল, চিনুর বান্ধবী কাবেরী প্রভৃতি। চিনু বেকার। বিশ্ব চাকরি পাব-পাব করছে। রমা বিবাহযোগ্যা—কিন্তু রমার অবস্থাও বেকার যুবকের চেয়ে কিছুমাত্র ভাল নয়। দীনেশ এবং মাধবী প্রৌঢ়—জীবনের ভগ্নদশা উপান্তে উপনীত। কাবেরী নার্সেস্ ট্রেনিং নিচ্ছে। যমুনা ছেলেপেলে হয়নি তাই সুখী। শৈলর বরের চাকরি গেছে। উপন্যাসের প্রথমাংশ—রমাকে দেখতে আসা এবং পছন্দ না হওয়া। উপন্যাসের দ্বিতীয়াংশে—চিনুর বাড়িতে ইলিশমাছ নিয়ে আসা। তৃতীয়াংশ সর্বাপেক্ষা বিলম্বিত—এখানে প্রধান ঘটনা কিছু নেই, প্রধান বিষয় বলা যেতে পারে জীবনের ক্লান্তিকর জটিলতা। শেষাংশ হল উৎসবাকুল কলকাতায় সকলেরই উৎসব-স্নান।

আগেই বলেছি একরঙা মধ্যবিত্ত জীবনের ক্লান্তিই এ উপন্যাসের প্রধান সুর। সেইজন্য আধা-রোমান্টিক, আধা-নির্বোধ রহস্যময়ী নায়িকা অথবা

নায়িকাদের কাছে গল্প আহরণকারী নায়ককুল এ উপন্যাসে কোথাও নেই। এখানে যারা আছে তারা সকলেই জীবনের এই ক্লান্তিকে স্ব স্ব চিন্তানুসারে জানে। উদ্দেশ্যহীনভাবে এই ক্লান্তির সঙ্গে তারা যুদ্ধ করে, হারে এবং অবশেষে আবারও যুদ্ধ করে।

বিশ্ব এবং রমার প্রেমের ঘটনা থেকে—যেখানে বিশ্ব ভাবছে চাকরি পেলে এবং বিয়ে হলেই সুখী হওয়া যাবে কিনা, একটুখানি তুলে দিচ্ছি : বিশ্ব বলছে "আমরা বড্ড একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছি ; এই একঘেয়েমিটা কাটানো উচিত। কথা বলল না রমা। ক্লান্তি তারও এসেছে। এটা কাটিয়ে ওঠা দরকার। নয়তো এই ঘিঞ্জি বাড়িতে এক মুহূর্ত তিষ্ঠনো যাবে না। কিন্তু এ ক্লান্তি কাটবে কেমন করে ? কি এমন যাদু জানে বিশ্ব যে একঘেয়েমি কাটিয়ে দিতে পারবে ? এই ছোট বাড়িটাকে কি ও বড় করে দিতে পারবে ? এ বাড়ির মানুষগুলোর স্বভাব কি ও বদলিয়ে দিতে পারবে ? বাইরে থেকে চেষ্টা করে কি বদল করা সম্ভব যতক্ষণ না ভেতর থেকে বদলাবার তাগিদ আসে ? এ বাড়িটাই তো ধুঁকছে।.........

—কি করে কাটাবে ?

—আমাদের সাধ্যে কুলোয় এমনভাবে।

রমার গলায় হাত রাখল বিশ্ব। হাতটা গলা বেয়ে আস্তে আস্তে নামছিল, সরিয়ে দিল রমা।

—কলে জল এসে গেছে বোধ হয়। আমি যাই নয়তো কল পাব না। আর কিছু শোনার জন্য রমা দাঁড়াল না। ট্যাঙ্কের ভাঙা কোনায় আঁচলটা আটকে গেছল। সাবধানে ছাড়িয়ে নিল। তবু ছিঁড়ল একটুখানি। বিরক্ত হল রমা। পরবার মতো কাপড় তো মোটে দুখানা। সিঁড়িটা অন্ধকার। চড়া আলো থেকে এসেই হোঁচট খেল। জ্বালা করছে। বোধহয় নখটা চোট খেয়েছে। বিরক্তি তো পদে পদে। শাড়িটা ছিঁড়ল মন খিঁচড়ে গেল। পায়ে লাগল, মন বিগড়ে গেল। এই মনটাকে বিশ্ব মেরামত করবে কতক্ষণের জন্য ? আবার তো কোথা থেকে ঘা পড়বে, অমনি মুড়মুড় করে ভেঙে যাবে। এই ভাঙা আর গড়ে তোলা তো সারাজীবন চালাতে হবে তাতে কি একঘেয়েমি বাড়ে না ?"

আবার একটু পরেই রমা ভাবছে :

"তাহলে চলে এলুম কেন ? একতলায় পৌঁছে রমা ভাবল। আবার ফিরে

গেলেই তো হয়। কলের জল তো আর সত্যি সত্যি আসেনি। এখনকার মতো একঘেয়েমিটা কাটত। সেইটাই আপাতত বড় কথা।”

এই ক্লান্তি—জীবন বহনে ক্লান্তি, ক্লান্তির সঙ্গে সংগ্রামে; ক্লান্তির কথাই উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই আত্মসমীক্ষার ছলে প্রায়ই বলেছে। এবং যেটাকে লেখকের চিন্তার দায় সকলে বহন করছে বলে ভ্রম করা হচ্ছে সেটা আসলে সকলেরই চরিত্রানুগ ক্লান্তি। প্রত্যেকেরই ক্লান্তির স্বরূপে পার্থক্য আছে। সকলেরই সমস্যা সময়ের জল ঠেলে এগিয়ে চলা। একমাত্র মাধবী ছাড়া সকলেরই সমস্যা এই ক্লান্তি—যার মূল জীবনের অর্থনৈতিক বিন্যাসে, সামাজিক হতাশায়।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ক্লান্তির ব্যবহারে লেখককে কী কী বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছে। এই সব বিপদ তিনি সমভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন কি না। বাস্তবিকই এ বিষয়বস্তু খুবই বিপজ্জনক। লেখকের অসতর্কতায় এ ক্লান্তিবোধ শূণ্যতা-বোধের গহ্বরে গিয়ে পড়তে পারে। আমরা অবশ্যই এত বোকা নই যে দিনেশের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে যে শ্মশান পালানো সদ্য মাতৃবিয়োগ-বিধুর ছেলেটা কথা বলছিল, কাঁদছিল আবার লিচুর বিচি ছুড়ে ছুড়ে কুকুরের সঙ্গে খেলা করছিল তাকে out-sider-এর নায়ক ভাবব। বরঞ্চ দিনেশের সাংসারিক বিড়ম্বনার পটভূমিকায় শিশুর এই প্রাণিনতা যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর। কিন্তু রমা এবং বিশ্বর প্রেমের ঘটনার উপন্যাসে ব্যবহার এই শূন্যতার দ্বারা প্রভাবিত এ সন্দেহ আসে। যে ক্লান্তিবোধে এই উপন্যাসের মানুষগুলো স্বতন্ত্র, রমার প্রেমও সেই ক্লান্তিবোধ থেকে পৃথক কিছু নয়। বিশ্বের প্রেম রমার কাছে সময় কাটাবার একঘেয়েমি এড়ানোর ছুতোমাত্র। রমাকে বুলার মা কনে-দেখার পর সে বুলার বৌদি হবার স্বপ্নে বিভোর হয়—তখন আর বিশ্বর কথা তার মনে থাকে না—তারপর হঠাৎ তার বিশ্বর কথা মনে পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসে হুড়মুড় করে। বিশ্বের কথা তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে রাখে না। বিশ্বর অবস্থাও এই। সে জানে যে চাকরি হয়তো পাবে। কিন্তু শৈলর বরের মতো চাকরি যে যাবে না তার ঠিক নেই। তবু তারা প্রেম করে—হয়তো আর কিছু করার নেই বলে। বাংলা উপন্যাসে এবম্বিধ প্রেমের ব্যবহার একেবারে নতুন না হলেও, অঙ্কনের বলিষ্ঠতায় এবং নায়কনায়িকার আত্মসমীক্ষার নিষ্ঠুরতার এ এক নতুন স্বাদ এনেছে। কিন্তু আমার আপত্তি এইখানে যে সে আত্মসমীক্ষা—যা আর একটু হলেই আমরা চেতনা-প্রবাহ বলতে পারি—কোনো নৈতিক দীপ্তিতে সমৃদ্ধ নয়। বরঞ্চ শূন্যতায় পর্যবসিত। পূর্বে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ তার প্রমাণ।

বস্তুত বইটির প্রধান চরিত্রই এই যে এখানে কিছুই শুরু হয় না এবং কিছুই শেষ হয় না। চিনু বাড়িতে ইলিশমাছ নিয়ে আসে। ইলিশের রূপালি আলোয় মুখগুলো সব ঝলসে ওঠে, এমন কি দু টুকরো মাছের উল্লাসে রমা-বিশ্বর প্রেমও কিন্তু সানুর চিড়িয়াখানায় যাবার জন্য পয়সার বায়না ধরাতেই মাধবীর কাছে তা ভেঙে যায়। দিনেশ আর মাধবী কাছাকাছি হয়, হয়তো মনে হয় কিছু একটা হতে পারে, কিন্তু মাধবীর তীব্র রূঢ়তায় তা খানখান হয়ে যায়। আঘাতের রেশ অথবা খুশির হাওয়া সবই মুহূর্তচারী—যেমন আমাদের জীবন। এই মুহূর্তগুলি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে মানুষগুলি চলেছে। চিনু কাবেরীর প্রেম বা বন্ধুত্ব যেখানে শুরুতে ছিল শেষও সেখানেই—কিন্তু রমারও প্রেম ঘটনার তীব্রতাকে বাদ দিলে তাই থেকে গেল। এই নিরাবেগ অতি মন্থর জীবনের বর্ণবিরলতার ছবি এঁকেছেন মতি নন্দী নিপুণ হাতে এই উপন্যাসে। ইলিশমাছ আসার ঘটনাংশটুকু এই নৈপুণ্যের একটি নিদর্শন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখকের সমস্ত অভিজ্ঞতারই চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে নিংড়ে কোন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মূল্যবোধকে তিনি আহরণ করতে পারলেন। মতিবাবুর দিক থেকেও এ প্রচেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে সেটাই শেষ পর্যন্ত বিচার্য। এ বিষয়ে লেখকের হাতে একটা বড় উপাদান ছিল সানু—রমার ছোট ভাই। চিনু নিজে যখন স্বগত চিন্তায় রত তখন একথা সে ভাবছে যে সানু আছে বলেই সংসারটা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সানু ইলিশমাছ আসার দিনটিতে ছাড়া উপন্যাসে আর কোথাও তেমন করে ফুটে উঠল না। কাজেই সমস্ত উপন্যাসে বিন্যস্ত জীবনে সানু যে রূপসৃষ্টি করতে পারে তা মাত্র চিনুর চিন্তাতেই সীমিত হয়ে রইল। উপন্যাসের বর্ণিত নিরাবেগ মন্থর জীবনের ক্লান্তিতে অন্য যে ঘটনা একটা ইতিবাচক তাৎপর্য আনতে পারত তা হল চিনু-কাবেরীর বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও লেখক চিনুর নিরুদ্দেশ্য জীবনের খসড়াটাকে বাঁচাতে গিয়ে কাবেরীর স্বাস্থ্যটাকে চেপে দিয়েছেন। ফলে কখনো কখনো এমন প্রশ্ন না উঠে যায় না যে লেখক নিজেও এই ক্লান্তিকর মন্থরতায় দিশাহারা কিনা। এই সংকট থেকে লেখককে বাঁচিয়েছে মাধবী আর দিনেশ। এই প্রৌঢ় দম্পতির চাওয়ায় পাওয়ায়, বেদনায় ক্রোধে শান্তি বাসনায় একটা সহজ স্বাস্থ্য আছে। এইখানেই লেখকের তাই বারেবারে প্রত্যাগমন ঘটেছে। চারিদিকের উদাসীন জটিলতার পরিশেষে অষ্টমী পূজার

উৎসবাকুল কলিকাতা নগরীতে নিজেদের ছোট পারিবারিক শোভাযাত্রাটিকে দিনেশ আর মাধবী যে মমতায় পরিচালনা করছেন সেই মমতাই হয়তো শেষ আশ্রয়। এইখানে যথার্থ শিল্পসৃষ্টির সঙ্গেই বইটি শেষ হয়েছে।

মতি নন্দী বাজার-সাফল্যের দিকে চেয়ে বই লেখেননি। নক্ষত্রের রাতও 'দুপুর বেলায় গপ্পো পড়ার বই' নয়। বাস্তবতা নিয়ে যখন বাজার-সফল লেখকেরা নানাভাবে বিব্রত, এবং তাকে আবৃত করার জন্য তাঁরা নানা রঙিন ছদ্মবেশের আশ্রয় নিচ্ছেন, সে সময় অনাবরণ আঙ্গিকে আমাদের প্রতিদিনের ওপর, জীবনের চেনা চিন্তার ওপর, চেতনার ওপর আলোক সম্পাতেই মতিবাবুর কৃতিত্ব। শুধু এই বৈশিষ্ট্যটুকুরও দাম কম নয়।

এই কারণেই এই বইয়ের লেখকের শুভ ভবিষ্যৎ আমরা কামনা করি।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

চীনা কবিতা ॥ দিলীপ দত্ত ॥ কৃত্তিবাস প্রকাশনী ॥ মূল্য দেড় টাকা ॥

চীনা কবিতার ঐতিহ্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির থেকে স্বতন্ত্র। কারণ চীনাদের মধ্যে কাব্যচর্চা এমন প্রবল ও ব্যাপক ছিল যে এদেরকে কবি জাতি হিসেবেই চিহ্নিত করা যায় কিংবা বলা চলে যে চীনা সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে কবিতারই সংস্কৃতি। উচ্চ রাজকর্মচারী-পদের জন্যে প্রার্থীদের কবিতা রচনার প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের প্রয়োজন হত। কোনও বন্দী উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করলে মুক্তি পেত। কনের কাছে একজন ভালো কবি ছিল একজন আদর্শ বর; পত্নীরা গর্ব বোধ করত পতিদের কবিত্বে। অর্থাৎ এই মর্ত ও মূর্ত জগতের সঙ্গে চীনা কবিদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ; এবং সত্যি বলতে কি, এই বাস্তবতাই হল চীনা কবিতার বৈশিষ্ট্য।

আমরা আধ্যাত্মিক কাব্যপরিমণ্ডলে লালিত, তাই চীনা কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে পারি। একটি নমুনা দিই :

> পূর্ব দিকের উইলো গাছ
> ঘন পাতায় ভরা
> সন্ধেবেলায় তোমায় আমায় মিলন হবার কথা।
> শুকতারাটি ওই যে দূরে উঠেছে ফুটে।

পূর্ব দিকের উইলো গাছ
ঘন পাতায় ভরা
সন্ধেবেলায় তোমায় আমায় মিলন হবার কথা।
শুকতারাটি মিলিয়ে গেছে কোথা।

এ-কবিতাতে কোনও বড়ো ভাবনা নেই, জীবনের গভীর অর্থ অন্বেষণের কোনও দুঃসাহসিক, অভিযানের আকাঙ্ক্ষা নেই, কোনও দুর্জয় রোদন বা বুকভাঙা যন্ত্রণা নেই, কোনও দার্শনিকতা নেই। বস্তুত মহৎ কবিতা বলতে আমরা যা বুঝে থাকি তার কোনও গুণই এ-কবিতাতে নেই। কিন্তু এ হল কিছু না বলে অনেক কিছু বলা। চার পংক্তির দুটি স্তবকেই এক একটি পুরো কবিতা এবং তিনটি পংক্তি দুটি স্তবকেই এক। শুধু একটি পংক্তির ভেদে নিহিত আছে এই কবিতাটির সম্পূর্ণ তাৎপর্য।

সন্ধ্যাবেলায় প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হবার কথা ছিল। কিন্তু তাদের মিলন হয়নি, সন্ধ্যা বয়ে গেছে। এজন্যে কোনও শোকোচ্ছ্বাস না-করে বলা হয়েছে: 'শুকতারাটি মিলিয়ে গেছে কোথায়'; এ শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস, আবার একই সঙ্গে একটি নৈব্যক্তিক উক্তি এবং এটুকুতেই মিলনের লগ্ন অতিক্রান্ত হবার বেদনাকে অভিব্যক্ত করা হয়েছে, সেই বেদনার প্রতি সরাসরি কোনও উল্লেখ না-করে, কেবল একটুখানি ইঙ্গিতে আর এই ইঙ্গিতটুকুও আহরিত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে। ছোট একটি চিত্র, কিন্তু তা প্রকাশ করছে এক গভীর বিষাদকে। এই চিত্রময়তা চীনা কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চীনা ভাষার হরফ এক রকমের ছবি, তাদের গৃহস্থালীর জিনিসপত্রেও চিত্র আঁকা থাকা চাই এবং এমন চীনা চিত্রও প্রচুর যেগুলি আঁকা হয়েছে পুরুষানুক্রমে। সুতরাং চীনা কবিতাও যে চিত্রময় হবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

চীনা চিত্রের অঙ্কন-পদ্ধতির সঙ্গে চীনা কবিতার রচনা-পদ্ধতির কোনও মৌল পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রেই সংযম হল প্রথম কথা। অবশ্য একে ঠিক সংযম বলা চলে না, এ সংযমেরও বাড়া। চীনা চিত্রে রং বা রেখার বাহুল্য তো নেই-ই, যা আছে তাকে অনায়াসে 'অভাব' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। চিত্রী ইচ্ছে করেই ছবির অনেকখানি জমি ফাঁকা রেখে দেন যাতে সেই শূন্য স্থান পূরণ করে নেয় দর্শকের অনুভূতি। তেমনই

চীনা কবিতা হল উনভাষণের চূড়ান্ত উদাহরণ। অনুক্ত কথাগুলিতে রইল পাঠকের কল্পনা বিকাশ করবার অবকাশ। অর্থাৎ কবিতার পাঠককেও সৃষ্টিতে অংশ নিতে হচ্ছে ; পাঠকেরও দায়িত্ব কবির সমান।

চীনা চিত্রকরেরও প্রবল বিমুখতা বিমর্ত বা বিমূর্ত কল্পনার প্রতি। একটা গাছ বা পাখিকে যখন তিনি ছবিতে ফুটিয়ে তোলেন তখন সেটা নিছক একটা গাছ বা পাখি হিসেবেই আসে, তার অতীত বা উর্ধ্বে কোনও কল্পনা হিসেবে আসে না, অর্থাৎ তা চীনা শিল্পে অন্য কোনও বস্তুর রূপের প্রতীক নয়। চীনা শিল্পে ও কবিতায় একটি বস্তু তার আপন গুণেই মহিমান্বিত। একটা বিপরীত উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে :

Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water
If there were water we should stop and drink
Amongst the rock one cannot stop or think
Sweat is dry and feet are in the sand
If there were only water amongst the rock
Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit
Here one can neither stand nor lie nor sit
There is not even silence in the mountains
But dry sterile thunder without rain
There is not even solitude in the mountains
But red sullen faces sneer and snarl
From doors of mudcracked houses......

(What the Thunder said by Eliot)

উদ্ধৃতি খুব বড়ো হয়ে গেল বটে, কিন্তু এতে ভালো করে বোঝা যাবে যে উপস্থিত বস্তুর অতীত অর্থ বলতে আমি কী বোঝাতে চেয়েছি। এখানে পাথর, জল, বালি, পাহাড়, বজ্র প্রভৃতি প্রতিটি বস্তুই একটা শুষ্ক প্রাণহীন বিভীষিকাময় পৃথিবীকে ব্যঞ্জিত করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ বস্তু হিসেবে তাদের যেসব গুণ রয়েছে সেসবের উর্ধ্বেও আরও কিছু গুণ ঐগুলির উপরে আরোপ করা হয়েছে। এখানে 'পাথর' কোনও গুরুভারসম্পন্ন শুষ্ক বস্তুপিণ্ডকে বোঝাচ্ছে না, তা আসলে বোঝাচ্ছে আধুনিক

সভ্যতার বন্ধ্যাত্বকে এবং এইটে বোঝাচ্ছে বলেই এই কবিতাতে 'পাথর' শব্দটির মূল্য।

এখানেই চীনা কবিদের স্বাতন্ত্র্য। তাঁরা বস্তুর উপরে বাড়তি কোনও গুণ চাপিয়ে দেন না, ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারে তার মূল্য না-বাড়িয়ে না-কমিয়ে, না-পালটিয়ে বস্তুকে কাব্যে স্থান দেন তার স্বগুণে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে: "আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তাহলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্ত-ভাবে না-দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা।......আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত-চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত-চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।" (আধুনিক কাব্য) এই বৈশিষ্ট্য যে কেবল প্রাচীন চীনা কবিতার তা নয়। একটি আধুনিক চীনা কবিতা:

নীল পাহাড় নিস্তব্ধ
আমিও চুপ করে বসে আছি
সময় বয়ে যায়
দুজনে মুখোমুখি চেয়ে আছি
একান্ত নির্জনে।
আমি নীচে ঝরণার জলের দিকে তাকাই
সেও যেন আমার দিকে মুখ তুলে চাইছে।

ওগো অস্তগামী সূর্য
তোমার ঐ রাঙা চোখ দিয়ে
এই অপরূপ নিস্তব্ধতার মাধুর্যের রহস্যকে
ভেদ করতে যেও না।

পুরো কবিতাটিই তুললাম। পাহাড়, ঝরণা, সূর্য—কোনটাই নিজের বাইরে অন্য কোনও কিছুকে ব্যক্ত করছে না, এমন-কি ইঙ্গিতও করছে না, অথচ লক্ষণীয় যে, প্রতিটি বস্তুই জীবন্ত: চৈতন্যময়।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীদিলীপ দত্ত মাত্র আটত্রিশটি চীনা কবিতার অনুবাদ করেছেন; সংকলনে খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকের অজ্ঞাতনামা কবি হতে আধুনিক টিয়েন চিয়েন পর্যন্ত স্থান পেয়েছেন। অনুবাদক চীনা কবিতার বিষয়-

বৈচিত্র্যের উপর তেমন জোর দেননি যেমন দিয়েছেন নিসর্গ ও প্রেম-বিষয়ক কবিতার উপর। তবুও চীনা কবিতার প্রকৃতি ও মাধুর্য বুঝতে অসুবিধা হয় না এ-বইটি থেকে। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে শ্রীদত্তর অবদান সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃত হবে, কেননা যে-অভিনবত্ব আধুনিক কবিদের অন্বিষ্ট তা এই ছোট পুস্তকটিতে প্রচুর মিলবে। প্রায় প্রতিটি কবিতার অনুবাদই এমন স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও স্বাভাবিক যে এগুলিকে বিদেশী কাব্যের অনুবাদ বলে মনে হয় না।

আধুনিক বাংলা কবিতার সম্বন্ধে আমার মনে একটা আশঙ্কা জন্মাচ্ছে। আগুন নিয়ে খেলা অতি বিপজ্জনক। আধুনিক বাঙালী কবিরা বস্তুকে তার নিজস্ব সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার প্রয়াসে সেই বিপজ্জনক খেলায় মেতেছেন। একটা জিনিসের উপর ক্রমাগত আপন ব্যক্তিত্বের—কখনও বা খামখেয়ালের—রং চড়াতে থাকলে সেটা অকৃত্রিম থাকতে পারে না। এই কৃত্রিমতার শেষ কোথায় হবে তা আমরা কেউই জানিনে। সুতরাং এখনই মোড় ফেরা প্রয়োজন। কোন্ পথে মোড় নেওয়া উচিত তা বিচার করবেন স্বয়ং কবি। দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থে একটি পথের সন্ধান দিয়েছেন। অনুমান কবি তাঁর নির্দেশিত পথের যাথার্থ্য যাচাই করবার জন্যে উৎসাহের অভাব তরুণ পথসন্ধানী কবিদের হবে না।

সবশেষে বলি যে 'সঙ্গে'-র বানান 'সংগে' দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম ওটি মুদ্রণপ্রমাদ, কিন্তু ওই বানানের পুনঃপুনঃ ব্যবহারে মনে হল এ-প্রমাদ বোধ হয় কবিরই। আশাকরি তিনি এই ধরনের ভুলগুলি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেবেন।

বইটির কাগজ, বাঁধাই, মলাট রুচিকর। দামও শস্তা।

সুরজিৎ দাসগুপ্ত

বিয়োগ-পঞ্জী

তুলসীদাস লাহিড়ী মহাশয়ের সমাসন্ন বিদায়ের সংবাদ আসতে না আসতেই এল শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের আকস্মিক বিয়োগের সংবাদ। বাঙলা দেশের নাট্যমঞ্চের দুইটি প্রকাণ্ড প্রদীপ-শিখা নিবে গেল। শোকের ছায়া শুধু বাঙলার নাট্যলোকেই ঘনিয়ে আসেনি, অসংখ্য বাঙালী জনসাধারণের হৃদয়ও এই পরম-প্রিয় শিল্পীদের বিয়োগে শোকের দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছে। তার সঙ্গে আমাদের অনেকের ব্যক্তিগত শোক ও গোষ্ঠীগত শ্রদ্ধাও মিলিত হয়েছে। কারণ তুলসীবাবু ছিলেন আমাদের অনেকের অকৃত্রিম সুহৃদ, প্রগতি-নাট্য আন্দোলনের অকুণ্ঠ নায়ক। আর শিশিরকুমার কারও বা সম্মানিত অধ্যাপক, কারও বা নাট্যাচার্য; আলাপ-কুশলতায় সকলের আনন্দ দোষ-ত্রুটিশুদ্ধ তাঁর সমকালের এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর শিল্পী।

তুলসী লাহিড়ী

বহুমুখী শক্তি নিয়ে তুলসীদাস লাহিড়ী জন্মেছিলেন। উচ্চশিক্ষার অভাব ছিল না এবং যেসব সুযোগ থাকলে সে শিক্ষায় বৈষয়িক সফলতা অর্জন করা যায়, তাও কম ছিল না। রঙ্গমঞ্চের প্রতি আবাল্যের আকর্ষণ তাঁকে সে সব কোনো কর্মে তিষ্ঠোতে দেয়নি। ওকালতিতে না, উন্নত কৃষি-উদ্যোগেও না—হয়তো দেশ-বিভাগই সেই উদ্যোগের অবসান ও তার বৈষয়িক ক্ষতির প্রধান কারণ। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি রঙ্গলোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছিলেন। অভিনয়-কুশলতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন নাট্যরচনার দায়িত্ব—তাঁর সরস চিত্ত দুই ক্ষেত্রেই সমভাবে আত্মপ্রকাশের পথ করে নেয়। আর তাঁর গভীর দেশপ্রীতি ও লোক-প্রীতি কোনো সময়েই চতুর বৈষয়িকতায় বা স্থূল সফলতায় আত্ম-বিলুপ্তি চায়নি। যাঁরা তাঁর সম্পর্কে এসেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর এই চারিত্রিক গভীরতায় আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি।

রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে বহুবার তাঁর স্বচ্ছন্দ অভিনয় আমরা উপভোগ করেছি। 'দুঃখীর ইমান' বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটা নূতন পর্বের আভাস-

রূপে এসেছিল—তখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চের নাটক ছিল অন্য সুরে বাঁধা। তুলসীবাবুর কৃতিত্ব শুধু নাট্যরচনায় নয়, শিশিরকুমারের মতো প্রগতিতে সন্দীহান প্রযোজককেও সে নাটক মঞ্চস্থ করতে রাজী করানো—আর তাতে শিল্প ও অর্থগত সফলতা অর্জন করা। পরে অবশ্য 'পথিক' ও 'ছেঁড়া-তারে'র সার্থক প্রয়োগের জন্য তিনি পেয়েছিলেন 'বহুরূপী'র অনুজ বন্ধুদের। 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসারে'র অভিনয় সাফল্য তিনি বোধহয় দেখে যেতে পারেননি। তুলসীবাবু, স্বর্গীয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রধানতঃ এই তিন প্রধান নাট্যশিল্পীর উৎসাহে ও সহকারিতায় বাঙলা দেশের নব নাট্যান্দোলন প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, যুবক শিল্পীরা সাহসলাভ করেছেন। আজ তাঁরা নিজের শক্তিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত। তুলসীবাবুকে হারাবার মতো অবস্থা তবু প্রগতি নাট্য-আন্দোলনের হয়নি—সাধারণভাবে প্রগতিবাদীদের হয় নি। তাই ক্ষতি তাদের সমধিক। অবশ্য বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের ক্ষতি অপূরণীয়।

শিশিরকুমার

শিশিরকুমার ভাদুড়ী বাঙলা দেশের স্বল্প-সংখ্যক প্রতিভাবান পুরুষদের মধ্যে একজন—আর স্বল্পতরসংখ্যক সেই প্রতিভাবানদের একজন যাঁদের মধ্যে ছিলেন মাইকেল, নজরুল, কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—সকল সাফল্য সত্ত্বেও যাদের প্রতিভা ট্রাজেডিতে হয় পরিসমাপ্তি। মাইকেলকে শিশিরকুমার রূপদান করেছেন, কোনো সার্থক চরিত্রকার শিশিরকুমারের রূপদান করতে পারবেন কিনা জানি না। কিন্তু বাঙালী জীবনের এক কোঠায় শিশিরকুমারের স্থান হবে নিঃসন্দেহে, মাইকেলের পার্শ্বে না হোক, তাঁর প্রিয় অভিনয়াচার্য গিরিশচন্দ্রের পার্শ্বে। কিন্তু ততক্ষণে হাসি-গল্প, আলাপ আলোচনা রসিক এই জটিল-চরিত্র পুরুষের জীবনের ও দানের কথা তাঁর সার্থকতা-বিফলতার কাহিনীও লিখিত হবে, আশা করি। 'পরিচয়'এ বাঙলা রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের দানের কথা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে পারলে আমরা আনন্দিত হতাম।

কারণ, প্রায় ৪০ বৎসরের অভিনয়-জীবনে শিশিরকুমার যা দিয়েছেন তা সামান্য নয়। অভিনয় অবশ্য এমন শিল্প নয় যা একার সৃষ্টিতেই সার্থক। শিল্প হিসাবে নাটক জটিল-জীবনের জটিলতারই প্রায় প্রতিলিপি। নাট্যাভিনয় শিল্প-রচনায় যৌথ-প্রকাশ—নাট্যকার থেকে মঞ্চকারুবিদ পর্যন্ত বহু শিল্পীর দানে তা পুষ্ট। অভিনয়ের সার্থকতার জন্য মহাভিনেতা থেকে সহৃদয় দর্শক পর্যন্ত

সকলের তা মুখাপেক্ষী। তাই যা শিশিরকুমারের দান তার পিছনেও আছে আরও অনেকের অন্নাধিক কীর্তি। বাঙলা অভিনয়ের ইতিহাসে নিশ্চয়ই ১৯০৮-এর স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রদের 'জুলিয়াস সিজারে' অভিনয় একটা স্মরণীয় ঘটনা—সাজসজ্জা পরিচ্ছদে সেদিন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ যুবক নাট্য-রসিকদেরই কৃতিত্বের পরীক্ষা হয়েছিল, কিন্তু শিশিরকুমারই ছিলেন সেই অভিনয়ে শিল্পীহিসাবে প্রধান। তারপর এল ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয়—১৯১২ হয়তো তাই একটা যুগারম্ভরূপে গণ্য। কারণ, গ্রীক ও ভারতীয় পরিচ্ছদের ঐতিহাসিকতায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ যে দান যোগান, তাও সার্থকতালাভ করে সেদিনের অভিনয়ে—একই সঙ্গে শিশিরকুমার, স্বর্গীয় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও নরেশ মিত্র এই তিন ছাত্র-শিল্পীর অভিনয় কুশলতায়। 'ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট' বা এই 'ইউনিভার্সিটি-অভিনেতারা' বাঙলা দেশে নাট্যান্দোলনের একটা নতুন আলোর সন্ধান দান করেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ তখন তার খোঁজও রাখেনি—যেমন সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ত্রিশ বৎসর পরে খোঁজ রাখেনি যখন 'গণনাট্য সঙ্ঘ' কলকাতায় 'নবান্নে'র অভিনয়ে আর এক নতুন পর্বের সূচনা করে। 'ইউনিভার্সিটি-অভিনেতাদের' মধ্যে প্রধান ছিলেন সেদিন শিশিরকুমার। তাই পরিচ্ছদে বলি, অভিনয়ে বলি, সুশিক্ষিত নাট্যচেতনায় বলি, যে নতুন দান বাঙলার নাট্যমঞ্চেও এল, তা এল এই অভিনেতাদের আশ্রয় করে শিশিরকুমারের নেতৃত্বে। শৌখীন অভিনয় ছাড়িয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই পর্ব উদ্‌ঘাটিত হতে আরও প্রায় ১০ বৎসর লাগে। ১৯২১এ শিশিরকুমার 'ম্যাডান থিয়েটার্সে'র' মাইনে-করা অভিনেতারূপে 'আলমগীরের' অভিনয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ইডেন গার্ডেনে (দ্বিজেন্দ্রলালের) 'সীতার' অভিনয়ের (১৯১৯) কয় রাত্রিতে তারই ভূমিকা রচিত হয়েছিল। এরপরে এল নাট্যান্দোলনের জোয়ার—একদিকে শিশিরকুমারের নেতৃত্বে চলেছে নাট্যমন্দিরে (যোগেশ চৌধুরীর) 'সীতার' অভিনয়, আর অন্যদিকে রঙ্গমঞ্চে অহীন্দ্রকুমার, নরেশ মিত্র প্রভৃতির সম্মিলিত 'কর্ণার্জুন' অভিনয়। পৌরাণিক রোমান্টিক ধারায় সে অভিনয় বাঙলা রঙ্গমঞ্চকে বিপ্লবী রূপদান করতে পারত কিনা সন্দেহ। কিন্তু আশার অন্ত ছিল—গুণী অভিনেতার অভাব ছিল না। বাঙলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে একটা বিরাট সম্ভাবনার দিন এসেছিল। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে শিশিরকুমার 'জাতীয় রঙ্গমঞ্চ' গঠনের সুযোগ হারালেন ঠিক, কিন্তু তার সহৃদয় বন্ধুবান্ধবের ও বাঙালী জনসাধারণের যে অপরিমিত সহায়তা-লাভ করেছিলেন

তা অবিস্মরণীয়। এমন উজ্জ্বল পর্বের নেতা হিসাবে শিশিরকুমার যে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না, সে জন্ম দায়ী অবশ্য শিশিরকুমারই, আর দুর্ভাগ্য বাঙলা নাট্যমঞ্চের ও বাঙালীর। জোয়ারের পরে তাই ভাটা হল—শিশিরকুমারের আমেরিকার অভিজ্ঞতা তাঁকে বিক্ষুব্ধ করেছে, নাট্যাচার্যরূপে পরিপুষ্ট করেনি। তিনি নবনাট্য আন্দোলনের এমন কি, বাস্তব নাটকের অভিনয়েও বিশেষ উৎসাহ বোধ করেননি—নব-নাট্য আন্দোলনে আর দান যোগাতে পারেননি। তথাপি আপন প্রতিভার মাহাত্ম্যে তিনি (নানা নামে) নিজের অধিকৃত রঙ্গমঞ্চকে আরও প্রায় বিশ বৎসর পর্যন্ত আলোকিত করে রেখেছিলেন। না ছিল তাঁর প্রেক্ষাগৃহে আরাম, না ছিল তার দৃশ্যের শ্রী। তবু 'মাইকেল', 'আলমগীর', যাই হোক যে দিন—তাই ছিল যথেষ্ট। রুশ অভিনেতা চেরকাসভ্ এই শ্রীহীন গৃহেই অভিনয় দেখতে এসে, শিশিরকুমারকে না চিনেও, শিশিবকুমারের মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রশ্ন করেছিলেন, 'এই—এই—নিশ্চয়ই ইনি নটশ্রেষ্ঠ ?'

জীবনে এরূপ অসামান্য অভিজ্ঞতা আরও অনেকের হয়েছে এক এক দিন যখন শিশিরকুমারকে দেখেছেন জীবানন্দরূপে, মাইকেলরূপে, আলমগীররূপে—এমন কি, এই শেষের দিকে নিমচাদরূপেও।

এত ভঙ্গ রঙ্গালয়

নাট্য আন্দোলন যে বাংলা দেশে নূতন প্রাণ ও নূতন দেহ ধারণ করবার জন্ম উদ্‌গ্রীব তার প্রমাণ পুরাতন মিনার্ভা থিয়েটরকে আমাদের সুপরিচিত 'লিট্‌ল থিয়েটর গ্রুপের' পুনর্জীবন দানের চেষ্টা।

এককালে মিনার্ভাই ছিল থিয়েটর পাড়ার কেন্দ্রস্থল—স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের প্রধান কর্মকেন্দ্র। বাংলা থিয়েটরের প্রাথমিক যুগে এর আশেপাশেই নানা নাটকের অভিনয় হয়েছে। তারপর এই থিয়েটর নির্মিত ও পুনর্নির্মিত হয়। কলকাতার এই উত্তর পাড়াতেই দীর্ঘকাল ধরে চারটি থিয়েটরে বাঙলা নাটকের অভিনয় চলত। সেদিনের ক্রাউন (পরেকার মনোমোহন) চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর বিস্তারে লুপ্ত হল, মিনার্ভা এ পাড়ায় একা নিস্তব্ধ হয়ে এল। থিয়েটরের পাড়াও সরে গিয়ে বসেছে সামান্য পূর্বে—স্টারের সন্নিকটে গতায়াতের সুবিধা থাকলে কেন যে তা সেখানেই কেন্দ্রিভূত থাকবে, দক্ষিণে বা পূর্বে-পশ্চিমে কোনো থিয়েটার চলতে পারবে

না, এ-তত্ত্বের মীমাংসা করবেন দর্শক মনের গবেষকরা। আমরা শুধু দেখছিলাম—কলকতার চারটি থিয়েটরের স্থলে তিনটি থিয়েটর সচল যখন কলকাতায় লোকসংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ ত্রিগুণ, বাংলা দেশে সৌখীন নাট্যসমাজ সংখ্যায় বাড়ছে সেই হারে, আর কলা নৈপুণ্যে সেই বাঙালী নাট্যশিল্পীরা অগ্রগামী, নিত্যউদ্ভাবনায় আগ্রহশীল। একশত বৎসরের নাট্য ঐতিহ্য সত্ত্বেও নাট্য আয়োজনে এমন দুর্বিপাক আমাদের কেন, সহৃদয় বিদেশীয় বন্ধুদের তা বুঝিয়ে উঠতে পারিনি। থিয়েটর কিংবা আধুনিক নাট্যশিল্পী কি সত্যই আমাদের সমাজ জীবনের অঙ্গ নয়? অঙ্গ হয়নি, অঙ্গ হবে না? যাত্রা বা 'ওপেন থিয়েটর' জাতীয় 'দেশী' নিঃশুল্ক জিনিসেই কি ফিরে যেতে হবে? তা হলে 'যাত্রাই' বা বিলুপ্তপ্রায় কেন? যারা তা প্রতিপালন করতেন সেই জমিদারবাবু বা বারোয়ারী চালক ব্যবসায়ীরা নেই। শহরে নতুন 'দর্শক সাধারণ'ও (ডিমোক্রাটিক পেট্রন) যথেষ্ট পরিমাণে নেই, এই কি কারণ? না, শহরে সেই বাঙালী দর্শক সাধারণের' আর্থিক সঙ্গতি আশানুরূপ বেড়ে ওঠেনি, অথচ থিয়েটরের ব্যয়বাহুল্য, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি সবব্যাপারে বহুগুণ হয়ে পড়েছে—তাতেই থিয়েটরের প্রধান বিপদ? তিনটি থিয়েটরের সম্প্রতিকার বৈষয়িক সাফল্য দেখে মনে হয়—এও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। শিল্পগুণ ও প্রত্যাশিত অন্যান্য কৌশল লাভ করলে শুল্ক দেবার মতো দর্শক সাধারণ কলকাতায়ও পাওয়া যায়—এক এক নাটক একাদিক্রমে পাঁচ শত রাত্রিও চলে। তথাপি আমরা দেখছি অনেক দেশেই 'সাধারণ থিয়েটর' শুধু দর্শকের দক্ষিণায় আর চলতে পারছে না—সোভিয়েত বা সমাজতন্ত্রী দেশের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে নাট্যমন্দির সাধারণভাবে দেবমন্দিরের বিকল্প। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশেও শুনেছি থিয়েটর বা এ জাতীয় কলাকেন্দ্র হয় রাষ্ট্র নয় পৌর-প্রতিষ্ঠান, নয় কোনো সাধরণ অর্থপুষ্ট সঙ্ঘের সহায়তা ব্যতী॰ প্রায় অচল হয়ে পড়ছে। এ সপ্তাহেই নিউ স্টেট্‌সম্যান এ (২০শে জুন ১৯৫১) পড়ছি স্যাড্‌লারস ওয়েল্‌স্ এর মতো লণ্ডনের প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাবার জন্য লণ্ডনের পৌর-প্রতিষ্ঠান (এল সি-সি) ১লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড (কম পক্ষে ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা) সহায়তা দিচ্ছে, এবং বরাবর প্রয়োজনানুরূপ সহায়তা দেবার কথাও বিবেচনা করছে আর গুলবেঙ্কিয়ান ট্রাস্ট এর দানে মারমেড থিয়েটর নতুন করে জেঁকে বসছে একটি নতুন প্রেক্ষাগৃহে। ক্রিটিক নামের আড়ালে পত্র সম্পাদক জানিয়েছেন 'মারমেড-এর অভিনীত বস্তুটিতে নাচ-গান-যৌন-অবদান সম্বলিত হুল্লোড়ের যে ব্যবস্থা তাতে এই সেকসাগ্রহী যুগের দাবি মিটবে; অন্যদিকে

নাট্যশালা অপেক্ষাও থিয়েটার অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে একাধিক পানশালার যে সব ব্যবস্থা এ গৃহে হয়েছে সেজন্য। এ সংবাদ দুটিতে আমরা বনেদি বুর্জোয়া দেশে নাটকের ও থিয়েটরের পরিণামেরও আভাস পাই। অবশ্য জার্মানিতে প্রায় প্রতি শহরেই পৌর রঙ্গমঞ্চ আছে তা জানি।

ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের ব্যবসা হিসাবে থিয়েটর পরিচালনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে—কলকাতা শহরেও এ কথা সত্য—সার্বিকভাবে এক একটি থিয়েটর যতই বৈষয়িক সাফল্য অর্জন করে তা অপ্রমাণিত করতে চেষ্টা করুক। বাঙালী দর্শক যে সাধ্যমত দর্শনী দেয়, এ শুধু তারই প্রমাণ। এ অবস্থায় কলিকাতার চতুর্থ রঙ্গমঞ্চের পুনরুজ্জীবন একটি সাহসের কাজ—লিটল থিয়েটর সেই সাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন।

রঙ্গ-জীবনের নব-সংগঠন

সমস্ত জেনেশুনেও লিটল্ থিয়েটর গ্রুপ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে দ্বার উদঘাটনে অগ্রসর হয়েছেন একেবারে দুরন্ত স্বপ্নের বশে ও দুমর আশা নিয়ে। তাঁদের নাট্য-নীতি ও সংগঠন পদ্ধতি দুই ই একেবারে নূতন। এ নাট্যনীতির সঙ্গে অবশ্য আমরা অপরিচিত নই—কিন্তু তা সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে এ নীতির সম্পর্ক এতদিন ছিল না। লিটল্ থিয়েটর গ্রুপ বিদেশীয় চিরায়ত নাটক বাঙলায় ভাষান্তরিত করে মঞ্চস্থ করতেন, দেশীয় চিরায়ত নাটকও অভিনয় করতেন। তাঁদের ম্যাকবেথ, ওথেলো দেখেছি তাদের ইবসন গোর্কি নিয়ে পরীক্ষাও দেখেছি—বিশেষ করে জানি নাট্যকলা তাদের কাছে জীবন বিমুখী প্রমোদ, আত্মবিস্মরণের উপাদান, অহিফেনের বিকল্পমাত্র নয়। আমরা এই সৎসাহসী দলের সৎ ও সাহসীকতার প্রশংসা করছি। এই দৃষ্টির বশেই তাঁরা নিঃশঙ্কে সভায়, সমিতিতে, শ্রমিক পাড়ায় ও গ্রামের কৃষক মহলে—খোলা মাঠে, খোলা মঞ্চে, নানা সামাজিক ও চিরায়ত নাটকের অভিনয় করেছেন, 'মঞ্চের' অভাবে নিশ্চেষ্ট থাকেন নি। আধুনিক নাট্য শিল্প যে মঞ্চসজ্জার আতিশয্যে প্রায় কারুশিল্পে পরিণত হতে চলেছে, মনে হয়েছে তাঁরা অভিনয়কে সে দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করতেই চেয়েছেন। কিন্তু 'সাধারণ মঞ্চে' এখন সেই অসাধারণ দৃষ্টি, অভিনয়ের অসাধারণ প্রকরণ-পদ্ধতি নিয়ে এসব অসাধারণ নাটককে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব লিটল্ থিয়েটর গ্রহণ করলেন। নিশ্চয়ই তাদের সাফল্য সকলে কামনা করবেন।

কিন্তু শুধু তাই নয়—ব্যক্তিগত মালিকানার নীতিকে নাট্যক্ষেত্রে উড়িয়ে দিয়ে 'লিট্‌ল্‌ থিয়েটর গ্রুপ' সমবায় পদ্ধতিতে এই থিয়েটরদলকে সংগঠিত করবেন—শুধু অভিনেতারা নন, টিকিট-ঘর ও মঞ্চের সামান্য কর্মচারীটিও হবে এই সমবায়ের সভ্য। এমন আজগুবি প্রস্তাব কেউ হয়তো এর পূর্বে কল্পনাও করেন নি। কিন্তু বাঙলা রঙ্গমঞ্চের গভীর দুর্ভাগ্য তো এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয়—ব্যক্তিগত মালিকানার দিন গিয়েছে, অথচ রাষ্ট্রীয় বা পৌর মালিকানা এখন পর্যন্ত এদেশে নিছক দলের দৌরাত্ম্য। এ অবস্থায় হয়তো এই সমবায়ী সংগঠনই সত্যকারের সুস্থ ও বিচক্ষণ প্রয়াস—বিশেষতঃ যখন তাতে শিল্পী কারুকর্মী ও কর্মী প্রভৃতির মধ্যে জাতিভেদ উড়িয়ে দেওয়াও হচ্ছে। এ স্বপ্নকে বিপ্লবী স্বপ্ন বলে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাবেন প্রত্যেকটি মানুষ। রঙ্গজীবন নবজীবনের যথার্থ বাণী অধিগত করতে পেরেছে। লিট্‌ল্ থিয়েটর-গ্রুপ অবশ্য মিনার্ভাকে নব-নাট্য আন্দোলনের ও নব-জীবন-সৃষ্টির কেন্দ্র করে তুলবার জন্য বাঙলা দেশের সকল নাট্য-দলকেই আহ্বান করেছেন। এটিও তাঁদের সুস্থ দৃষ্টিরই পরিচয়।

'ওথেলো', 'ছায়ানট' দিয়ে লিট্‌ল্ থিয়েটরের দল আপাতত বাঙালী দর্শকের সামনে মিনার্ভাতে আবির্ভূত হল। দেশী-বিদেশী প্রায় পঁচিশখানা নাটকের অভিনয় করবার মতো প্রস্তুতি তাঁদের আছে। প্রয়োজন মতো মঞ্চস্থ করতে পারবেন। কাজেই, সাধারণের রুচি ও চাহিদা নিয়ে পরীক্ষার সুযোগ থাকবে।

দ্বারোদ্‌ঘাটন দিবসে আমরা সে-দিন লিটল থিয়েটার দলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।' অভিনয় দেখে চকৎকৃত হয়েছি। অভিনয়ের সার্থকতা প্রায় প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তা ছাড়াও তাদের প্রয়োগ-পদ্ধতিও বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রতি দৃশ্যারম্ভে সূত্রধার এসে গ্রীক-কোরাসের মতো নাট্যবিষয়টি বিচার বিশ্লেষণ করে দেন—একশত বৎসর আগেকার নাট্যবস্তু যে আধুনিক কালেও সত্য, এ তত্ত্ব তীক্ষ্ণবাক্যে পরিস্ফুট করে তোলেন। প্রযোজনায় অন্যান্য যে কৌশল উদ্ভাবনা করা হয়েছে তার পরিচয় ও আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। কিন্তু প্রায় সবই কৃতিত্বের পরিচায়ক, সার্থক অভিনয়ের সহায়ক।

বাঙলা দেশে ফিল্‌ম ও নাটক আজ একটা নূতন গৌরবের অধিকারী হতে চলেছে—লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ-এর পরীক্ষায় ও প্রচেষ্টায় তার গৌরব বর্ধিত হোক এই আমাদের কামনা।

'গণঅভ্যুত্থান'

'জাতীয় অভ্যুত্থান' কাকে বলে, তিব্বতের লামাসেরির বিদ্রোহ না ঘটলে আমরা তা বুঝতেই পারতাম না। কিন্তু 'গণ অভ্যুত্থান' কাকে বলে, কেরলের কংগ্রেস-ক্যাথলিক-মোসলেম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের 'বিমোচন সমর' আরম্ভ না হলে তা-ই কি আমরা জানতে পারতাম? আমরা জানতাম ঐ 'বিমোচন সমরটা' জিন্না সাহেবেরই আবিষ্কার, মোসলেম লীগেরই নিজস্ব সম্পত্তি, বিশেষ করে কলকাতার মানুষ হয়ে সেই লড়কে লেঙ্গে' পব আমরা বিস্মৃত হই কি করে? তারপরে কি করে বিশ্বাস করব—জিন্নার সেই বিমোচনের টুপিটি পণ্ডিত জওহরলালের মাথাও উঠতে পারে? আর মোসলেম লীগের ঝাণ্ডার সঙ্গে কংগ্রেসের ঝাণ্ডা গাঁটছড়া বেঁধে ক্যাথলিক চার্চের ক্রুসেডের ধ্বজায়ও পরিণত হতে পারে? যদি না কেরলে তৎপূর্বে সমস্ত দলের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কমিউনিস্টরা সাধারণ নির্বাচনে জিতত, সমস্ত বাধা সত্ত্বেও উপনির্বাচনেও পুনরায় বিজয়ী হত এবং রাজ্যশাসনে অন্তত দুর্নীতিহীন চরিত্রবলের ও লোক হিতৈষণারও প্রমাণ দিত? আর ভারতীয় কনষ্টিটিউশনের কনটেন্ট, ডিমোক্র্যাসির 'সাবস্টেন্স', কংগ্রেসী অহিংসার অপার মহিমা, এসবেরই অর্থ কি আমাদের বোঝা সম্ভব হত—যদি না জানতাম কেরলের তিন হাজার স্কুলের মধ্যে আড়াই হাজার স্কুলকে বন্ধ করবার আর কোনো উপায় নেই 'ইনটেন্সিফাইড' লোষ্ট্র সংগ্রাম ও স্কুলগৃহে অগ্নিসংযোগ করা ছাড়া? সরকারী লঞ্চ ও বাসের যাত্রীদের ডাণ্ডায় ঢিলে ভ্রমণেচ্ছা বিমোচন না করলে এবং অহিংস আগুণে যানবাহন সমূহকে অগ্নিশুদ্ধ না করলে কেমন করে আর এই অশোক-চক্র মার্কা ভারতীয় ইউনিয়নের ধর্ম বিজয় অব্যাহত থাকে—যখন কেরলের কমিউনিস্ট সরকার এতই কাপুরুষ যে 'বিমোচন'-বাগ্মী ও বিমোচন-পত্রিকাবাজদের হুহুঙ্কার স্পেশাল-কোডের থাবাকে তুচ্ছ করে অব্যাহত চলে, 'প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্‌টে'র প্রয়োগে একটি 'বিমোচন' বীরেরও কেশাগ্র স্পর্শ করতে সাহস করে না, এমন কি (মশালচীদের মিছিলের বিরুদ্ধে পনের দিনের জন্য ব্যতীত) সমগ্র কেরলের শহরে গ্রামে কোথাও ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করে কোনো মিছিল, সভা, শোভাযাত্রা, শোকযাত্রা জনসমাবেশ কিছুই বন্ধ করবার চেষ্টা করে না। পুলিশকে মারতে গিয়ে বারতিনেক পুলিশকে গুলি চালাতে তবু বাধ্য করা গিয়েছে। না হলে এই 'নাস্তিক', 'বিজাতীয়', 'ডিমোক্র্যাসির শত্রু', 'নন্ ভায়োলেন্স-অবিশ্বাসী' কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট সরকারের সঙ্গে এই কংগ্রেস-

ক্যাথলিক লীগ মার্কা 'লড়কে লেঙ্গে' 'খেইলটা' প্রায় খেলাই অসম্ভব। কারণ 'গণ অভ্যুত্থান' সত্ত্বেও স্কুল বন্ধ হল না। কয়েকটি শহরের বাইরে ও ক্যাথলিক মহল্লায় ছাড়া সংগ্রামের অস্তিত্ব নেই, বাঘা বাঘা সংগ্রামী পৃষ্ঠরক্ষা করছেন আর শেয়াল শেয়াল সংগ্রামীরা হপ্তাখানেকের বেশি কারাবরণের শাহিদী গৌরব লাভ করতে পারছেন না। কৃষক 'জাঠার' তো কথাই ওঠে না, এমন কি, মালিক সহযোগে ধর্মঘটের ডাক দিয়ে ৩ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ১০ হাজার শ্রমিককেও কারখানার বাইরে রাখা যায়নি। বরং অন্যদিকে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য কৃষক সমাবেশে ভূমিসংস্কার আইনের জন্য অফুরন্ত উৎসব চলেছে। ত্রিবান্দ্রমের বুকের উপরে ২৮শে জুনই লক্ষ লক্ষ লোকের যে জনসমাবেশ হল কেরলার ইতিহাসে তা কখনো কেউ আর দেখেনি—দেখতে হলে আবার কেরলার কমিউনিস্ট পার্টির কৃপাতেই দেখতে হবে।

অতএব, 'গণ অভ্যুত্থানের' অর্থ হল অগণিত কৃষকের বিরুদ্ধে, অজস্র শ্রমিকের বিরুদ্ধে, স্বশ্রমজীবী শিক্ষকের বিরুদ্ধে, ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে—ক্যাথলিক পাদ্রি ও তাদের ধর্মান্ধ অনুচরদের, মোসলেম লীগের ধর্মপ্রাণ বীরদের, স্কুল ব্যবসায়ী নায়ার প্রভুদের, ক্ষমতাহারা কংগ্রেস নেতাদের, অশোক মেহতা, কৃপালনী, থানু পিল্লাইর প্রজা সোশ্যালিস্টদের এবং বিস্মৃত হবে না বিপ্লবী সোশ্যালিস্টদেরও—এক কথায় নির্বাচনে পুনঃপুনঃ পরাজিত, জনতার ধিকৃত কায়েমিস্বার্থের তল্পীদারদের শতকরা নব্বই জনের বিরুদ্ধে শতকরা দশজনের "বিদ্রোহ"। "বিদ্রোহটা" অবশ্য ভরাতীয কনষ্টিটিউশনের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেও, এবং আরও যা এরপরে দিনের আলোর মতই সুস্পষ্ট, গণতান্ত্রিক নিবাচন প্রথার বিরুদ্ধেও। কিন্তু তা নতুন কিছু নয় স্পেনে ঘটেছে, ফ্রান্সে এভাবেই কমিউনিস্টদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পার্লামেণ্টে সংখ্যালঘিষ্ঠ করা গিয়েছে। কেরলে আবার নিবাচনের অর্থই হল কেরলা জুড়ে (সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নির্বাচনের ভোটার লিস্টের সততা) ভুয়া ভোটার ও ভুয়া নির্বাচনের ব্যবস্থা ঢেবর ইন্দিরার পার্টি করতে পারবেন—এজন্যই তো সাধারণ নির্বাচনের পরামর্শ। একথা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট—ভারত রাষ্ট্রে—অন্তত কেরলা, অন্ধ্র, পশ্চিম বাঙলায়—যেখানেই কম্যুনিস্টরা যখন শক্তিশালী সেখানে—নিরপেক্ষ নির্বাচনকে চিরবিদায় দেওয়া এখন কংগ্রেস সংকল্প। কারণ, পণ্ডিত জওহরলাল কেরলা গিয়ে ঠিকই করেছেন—দুই জগতে আজ কেরলা বিভক্ত—'হ্যাভস্ এর' জগৎ ও 'হ্যাভ-

নট্স্'-এর জগৎ। এই ডেমোক্র্যাসির খেলা ততক্ষণই 'হ্যাভ্সের' শ্রেণী খেলেন যতক্ষণ তাঁদের 'হ্যাভিং'-এর খেলা অব্যাহত থাকে—কারণ, তা-ই 'সাবস্টেন্স অব ডিমোক্র্যাসি', অগ্রকার (৭।৭।৫৯-এর) 'পণ্ডিত' বাচনে তা পরিষ্কার। সেই 'হ্যাভিং' যদি না থাকে, তাহলে—ফ্রাঙ্কো, দ্য গল্, সিংম্যান্ রী, আইয়ুব খান এবং—? 'গণ অভ্যুত্থান' !!

কেরলায় কমিউনিস্টরা ক্ষমতালাভ না করলে হয়তো পণ্ডিতজীকে এই 'ম্যাস্-আপসার্জ' ও 'সাব্স্টেন্স অব্ ডিমোক্র্যাসির' তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে হত না, আমরাও 'গণ-অভ্যুত্থান' চিনতে পারতাম না।

লাটের গাড়ি

বৎসর পাঁচ পূর্বে একটা সংবাদ পড়েছিলাম—ইংলণ্ডে প্রবল বন্যা হয়। বন্যার্ত নর-নারীদের অবস্থা বুঝবার জন্য রানী যাচ্ছিলেন সে অঞ্চলে। কিন্তু বন্যাস্থলে কাউকে যেতে না দেওয়াই ছিল পুলিশের উপর নির্দেশ। রানীর মোটরও তারা ফিরিয়ে দেয়, পরে জানা যায়, রানীকে তারা চিনতে পারেনি। শুনেছি ওদেশের লোক তাদের রাজারানী নিয়ে পাগল। কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম না—এ হেন রানী-পাগল দেশের তরুণী রানীকে তার গাড়ির পিছনে দু'দশখানা গাড়ি দু-চারজন রিশালাদার হাবিলদার না নিয়েই চলতে ফিরতে তারা দেয় কি করে—যে রানী ও তার গাড়ি না চিনে পুলিশ দিল রানীকে পথের মধ্যে ফিরিয়ে? —এ ভুল অবশ্য ভারতবর্ষে ইংরেজ কর্তাদের কোনোকালে ঘটত না—রানীর ভৃত্যরা (হার্ মেজিস্টিস সার্ভিস) পর্যন্ত এদেশে বেড়াতেন আগে-পিছে হাতি-ঘোড়া, আমীর-ওম্রাহ্, পাইক-বরকন্দাজ-ইয়ারবকসীর পল্টন নিয়ে। তারপর এখন স্বাধীন আমলে 'লাটের' সুখ বেড়েছে—ভ্রমণও অনেকেরই বেড়েছে—স্বদেশে, বিদেশে—ভূচর, খেচর পরিবৃত এই উভচর ভি-আই-পি মহোদয়রা লাটের গাড়ি না পেলেও লাটের চালেই চলেন এ আমরা জানি। তবে লাটের গাড়ির যে খরচ তা সম্প্রতি যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছে· একবার দিল্লী থেকে কলকাতা যেতেই লাটের গাড়ির খরচ হয় ২০,০০০৲ (বিশ হাজার) টাকা। মাইল পিছু ১৪ টাকার মত। এই 'সাবস্টেন্স অব্ ডিমোক্র্যাসির' সম্মানে কত ঘণ্টার মত প্রতি স্টেশন, অন্য প্রতিটি গাড়ি ও প্রতিটি যাত্রীর সমস্ত গতায়াত 'নিষিদ্ধ' হয়ে থাকে, টাকা-পয়সায় তা হিসাব করা সাধারণের কাজ নয়—হয়তো

স্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটেরই একটা বিশেষ বিভাগে গবেষণা চলতে পারে। তবে এইটুকু জানি—ভারতবর্ষের প্রতি মানুষের মাথাপিছু আয় যদি স্ট্যাটিষ্টিকসের দৌলতে বার্ষিক ২৬৫৲ টাকা বেড়ে থাকে, তা হলেও দুটি পরিকল্পনায় তা বার্ষিক ২৯০৲ টাকার বেশি হয়নি। 'সদাগত আশ্রমের' বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিয়তি !!

অধ্যাপক হলডেনের আর এক কাণ্ড

অধ্যাপক হলডেন পরিচয় পাঠকের প্রিয় বলেই এ সংবাদটুকু আমরা সবিস্তারে উদ্ধৃত করছি—বলাবাহুল্য এ ধরনের উক্তি করলে যে চীনের বক্তব্যটা সমর্থিত হয়, এবং 'চন্দ্রশেখরদের' মার্কিনে বিক্রীত গবেষণার দাম না কমুক, ভারতীয় গবনমেণ্ট অপদস্থ হন, তা হলডেন কী করে বুঝবেন ?

"বোম্বাই এর উপকণ্ঠে চেম্বুরে জন্মমৃত্যু হার পরিসংখ্যান শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রে প্রথম সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দান প্রসঙ্গে অধ্যাপক হলডেন অভিমত প্রকাশ করেন—ভারতে খাদ্যসমস্যা জনাধিক্য সমস্যা অপেক্ষা বেশি জরুরী। তিনি বলেন যে, কৃষিতে যদি বৈজ্ঞানিক রীতি পদ্ধতি প্রচলন করার জন্য সত্যকারের চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে এখন হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতের খাদ্য সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে।

'ভারত আজ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন তাহাদের মধ্যে জনাধিক্য সমস্যা বোধহয় অত্যন্ত জরুরী ও কঠিন'—বলিয়া সমাবর্তনের সভাপতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীকারমারকার যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার সহিত মতানৈক্য ঘোষণা করিয়া অধ্যাপক হলডেন উক্ত অভিমত প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক হলডেন বলেন, জীবতত্ত্ববিদ হিসাবে আমি ঐ মন্তব্যের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। খাদ্যসমস্যা অধিকতর জরুরী সমস্যা এবং এখন হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে যদি এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক রীতি-পদ্ধতি প্রচলনের জন্য সত্যকারের চেষ্টা করা হয়।

অধ্যাপক হলডেন বলেন যে, অনেক কায়েমী স্বার্থ আছে যাহারা জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইতে পারে যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট গবেষণা করা হইতেছে। তবে তিনি এ-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি মনে করেন যে, খাদ্য-উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক রীতি-

পদ্ধতি প্রবর্তন করিলে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হয়। বর্তমানে ভারতে প্রয়োজনীয় খাদ্য-উৎপাদনের যথেষ্ট উপায় রহিয়াছে।

খাদ্য-উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে পশুপক্ষী ও কীট-পতঙ্গাদির জন্ম-মৃত্যু হারের গুরুত্বের উপর জোর দিয়া অধ্যাপক হলডেন বলেন যে, পশুপক্ষী ও কীট-পতঙ্গাদির জন্ম, বৃদ্ধি ও গতিবিধির জ্ঞান শুধুমাত্র কেতাবী সমস্যা নহে, বাস্তবে ইহার প্রয়োগ অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি বলেন যে, পশ্চিম সীমান্ত হইতে একদল মানুষের আগমন অপেক্ষা এক ঝাঁক পঙ্গপালের আগমন ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে অধিক ক্ষতিকর। ভূমির উপর প্রাণী-জীবনের নির্ভরতা সম্পর্কে জ্ঞান এখনও অতি স্বল্প, কারণ প্রাণীজগতের অসংখ্য গোত্র ও বর্ণ ঠিক করা সহজ ব্যাপার নহে।

তিনি বলেন যে, মানবের জন্ম-মৃত্যু হার পরিসংখ্যান যাঁহারা করেন তাঁহাদের প্রাণী-জগতের জন্ম-মৃত্যু হার সংক্রান্ত বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।"

দিল্লী দূরন্ অশ্‌ত্‌

কেউ কি জানেন—মস্কোতে সোভিয়েত সাহিত্যিক সম্মেলনে 'ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিনিধি' কে কে উপস্থিত ছিলেন—কবে তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছিলেন, কে তাঁদের বাছাই করেছিলেন, কি পদ্ধতিতেই বা সে বাছাই হয়েছিল? তারাশঙ্করবাবু জানেন? বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ জানেন? হুমায়ুন কবীর সাহেব জানেন? কে জানেন? সংবপত্রে দেখলাম ভারতীয় 'সাহিত্যিকদের' নেতৃত্ব করেছিলেন আমাদের প্রবীণ সুহৃৎ পণ্ডিত বনারসীদাস চতুর্বেদী জী। সর্বরকমেই তিনি যোগ্য লোক। নিশ্চয়ই তিনি ভারতের মান রক্ষা করেছেন। কিন্তু এই পূর্ব-দিকপ্রান্ত হতে এখন পর্যন্ত আর কোনো 'সাহিত্যিকের' কথা, কিংবা তাঁদের যাত্রার কথা কি পূর্বে কেউ শুনেছেন? কোন্ কোন্ ভাষার কোন্ কোন্ 'সাহিত্যিক' কার বাছাইতে মস্কোতে ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করলেন, স্বভাবতই তা না জেনে কোনোরূপ মন্তব্য করা অন্যায়। কিন্তু 'নয়াদিল্লী' যে কলকাতার থেকেও অধিতর দূর তা বুঝতে পারছি।